বিভাগোত্তর পূর্ব-পশ্চিম বাংলা সাহিত্য
১৩৫৪ – ১৩৫৯

লোকসাহিত্য ॥ শিশুসাহিত্য ॥ কাব্য ও নাট্যসাহিত্য
কথাসাহিত্য ॥ প্রবন্ধসাহিত্য

শান্তিনিকেতনে অনুষ্ঠিত

সাহিত্যমেলার

(১৫-১৭ ফাল্গুন ১৩৫৯)

বিভিন্ন অধিবেশনের প্রতিবেদন।

সম্পাদনা

ক্ষিতীশ রায়

সম্পাদকমণ্ডলী

অন্নদাশঙ্কর রায়, লীলা মজুমদার, ক্ষিতীশ রায়, লীলা রায়,

নিমাই চট্টোপাধ্যায়, গৌরী দত্ত

প্রথম প্রকাশ—আষাঢ়, ১৮৭৯ শকাব্দ

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—অজিতমোহন গুপ্ত
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

৭২।১, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদপট ও বর্ণলিপি
খালেদ চৌধুরী

বাঁধাই—ওরিয়েন্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস

পাঁচ টাকা

সূচনা

...লেপুলে গোরুবাছুর হাঁড়িকুড়ি শিলনোড়া সব একে একে ভাগ হয়ে ...ছিল। বাকী ছিল উঠোনের মাঝখানে পাঁচিল তোলা। সেটুকুও যখন ...রা হল তখন আশঙ্কা জাগল, এর পরে বোধ হয় আলো হাওয়া বন্ধ ...বে। ছাড়পত্র প্রথা প্রবর্তনের পরের ধাপ সাহিত্য সংগীত প্রভৃতির ভাগ বাঁটোয়ারা। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের হৃদয়মনের উপর অস্ত্রোপচার। ...লঙ্ঘ্য ব্যবধান। চিরস্থায়ী ব্যবধান।

আমরা কি তা হলে চিরকালের মতো পর হয়ে যাব? আত্মীয়তার ...কোনো একটাও সূত্র থাকবে না? সেতুবন্ধনের জন্যে কেউ কোনো চেষ্টা করবে না?

শান্তিনিকেতনের সাহিত্যমেলার সূত্রপাত হল এই প্রশ্নের উত্তর দিতে ... গৌরী দত্ত, ফরিদা মালিক, নিমাই চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ তরুণ-... আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রস্তাব তুলল সাহিত্যসম্মেলনের। পূর্ব ... সাহিত্যসম্মেলন। আমি চিন্তা করে বললুম, সাহিত্যসম্মেলন নয়, ...মেলা। পূর্ব পশ্চিম নয়, গত পাঁচ বছরের বাংলা সাহিত্য। তারা ...য় যায়। তার পরে উদ্যোগপর্ব। অতি সামান্য তাদের ধনবল। ...খা গেল জনবল আরো সামান্য। যাদের উপর তারা নির্ভর ... তারা ধরাছোঁয়া দিল না। এমন অবস্থা হল যে শুভার্থীরা বলতে ...লেন, এ বছর মেলা বন্ধ থাক।

... মুহূর্তে চাঁদাও উঠল, মানুষও জুটল, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আমন্ত্রিতেরা

ও উপত্র সাহি যাকে উপসং আলো এ দে এক

এসে পড়লেন, কলকাতা থেকে এলেন অপ্রত্যাশিত সুধীজন। সে এক ভোজবাজি। আমরা কেউ ভাবতেও পারিনি যে মেলা সত্যি সত্যি জমবে। বরং আমাদের বরাবর ভয় ছিল স্থানীয় অধিবাসীরা অভিমানে অসহযোগ করবেন। দেখা গেল তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে চাঁদা দিয়ে গেলেন, নানাভাবে সাহায্য করলেন। বলা বাহুল্য বিশ্বভারতীর সাহায্য সব চেয়ে বেশি। শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত সেন ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচ প্রথমাবধি উৎসাহ দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ রায় সাধারণ সম্পাদক হ সবকিছু সহজ করে দিয়েছেন। অন্যান্য কর্মীরা অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছে কাকে ছেড়ে কার নাম করি! বাইরের যাঁরা সহায় হয়েছেন তাঁদে দু'জনের নাম না করলে নয়। বিচারপতি শ্রীযুক্ত ব্রজকান্ত গুহ ও ধনকুবে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী।

হবে কি হবে না করতে করতে হল। সেইজন্যে ব্যবস্থায় অসংখ্য ত্রুটি সেসব কথা বললে মর্মাহতদের মন ভিজবে না। সহকর্মীদের মন ভে যাবে। পরের বারের জন্যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হল। যদি পরের বা মেলা বসে।

এখন একটু ভিতরের কথা বলা যাক। সাহিত্য সম্মেলন কেন নয় কেন সাহিত্যমেলা। পূর্ব পশ্চিম কেন নয়। কেন গত পাঁচ বছরের বা সাহিত্য।

সাহিত্য সম্মেলনের গতানুগতিক ধারা হচ্ছে একজন থাকে সভাপতি, আর কয়েকজন শাখা সভাপতি। প্রত্যেক শাখায় এব রচনা পাঠ হয়। সভাপতিরা প্রত্যেকে এক একটি ভাষণ দেন মিলে আলাপ আলোচনার অবসর থাকে না। আমরা স্থির করি বদলে দিতে হবে। সাহিত্যের মধ্যে বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস স্থান দেওয়া হবে না। সাহিত্যের বিভাগগুলি হবে কথাসাহিত সাহিত্য, প্রবন্ধসাহিত্য, লোকসাহিত্য ও সাধারণ সম্পাদকের

অনুরোধে শিশুসাহিত্য। প্রত্যেক বিভাগের একজন করে আহ্বায়ক থাকবেন, তিনিই সেই বিভাগের সূত্রধার। যে বিষয়ের ভার তাঁর উপরে সে বিষয়ে গত পাঁচ বছরে কী কী কাজ হয়েছে তিনি তার একটা আভাস দেবেন। তাঁর আহ্বানে এক এক করে পাঁচজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক সিম্পোজিয়মে যোগ দেবেন। এক এক জনের উপর এক এক অঙ্গের ভার। ধরুন, কথাসাহিত্যের সিম্পোজিয়মে একজন বলবেন ছোটগল্প সম্বন্ধে, আরেকজন ছোটগল্পের আঙ্গিক সম্বন্ধে, একজন বলবেন উপন্যাস সম্বন্ধে, একজন উপন্যাসের আঙ্গিক সম্বন্ধে, শেষের জন বলবেন পূর্ববঙ্গের কথাসাহিত্য সম্বন্ধে সমগ্রভাবে। এখানে বলে রাখি আমরা পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রত্যেক বিভাগে একজন করে বিশিষ্ট সাহিত্যিক আনিয়েছিলুম, তার বেশি আমাদের অর্থসামর্থ্যে কুলোয়নি। শিশুসাহিত্য বিভাগে পূর্ব পাকিস্তানের স্থান শূন্য থেকে যায়।

সিম্পোজিয়মের পরে আলোচনার জন্যে সময় বরাদ্দ করা হয়েছিল। এর জন্যেও কয়েকজনকে বিশেষভাবে বলে রাখা হয়েছিল, যাতে তাঁরা প্রস্তুত হয়ে আসেন। হঠাৎ উঠে কেউ কিছু বলতে চাইবেন তার জন্যে আমরা ফাঁক রাখিনি। দু'ঘণ্টা আড়াই ঘণ্টায় পাঁচজনের সিম্পোজিয়ম ও ও পাঁচ ছয়জনের আলোচনা অতি কষ্টে আঁটে। তার উপর আহ্বায়কের উপক্রমণিকা তো আছেই। সভার কাজ চালাবার জন্যে স্থানীয় এক একজন সাহিত্যিককে এক একটি বিভাগের সভাপতি করা হয়েছিল। ইংরেজীতে যাকে চেয়ারম্যান বলে সেই অর্থে। সভার শেষে তিনি দু'চার কথা বলে উপসংহার করেন। এ ঠিক সভাপতির অভিভাষণ নয়। এ হল আলোচনার উপর যবনিকাপাত।

এবার বলি কেন গত পাঁচ বছরের বাংলা সাহিত্য।

গোড়া থেকেই আমাদের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পশ্চিমের সাহিত্যিকদের এক জায়গায় মেলানো। কিন্তু ঠিক এই জিনিসটিকে পূর্ব পাকিস্তানের

অনেকে সন্দেহের চোখে দেখেন। সংশয়ীদের এত দূর থেকে সমঝানো শক্ত যে আমরা তাঁদের ঘরোয়া ব্যাপারে হাত দিতে চাইনে। আমরা শুধু চাই পূর্ব পশ্চিমের সেতুবন্ধন। ছাড়পত্র প্রবর্তনের দরুন যে যোগাযোগ ছিন্ন হতে বসেছে আমরা চাই তাকে অন্য উপায়ে জোড়া দিতে। এখান থেকে চেঁচিয়ে বললে কেউ ওখানে শুনতে পাবে না। সন্দেহ না মিটলে আমাদের আমন্ত্রণে যাঁরা সাড়া দেবেন তাঁরা ছাড়পত্র পাবেন না। আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে।

সেইজন্যে আমরা আমাদের আলাপ-আলোচনাকে এমন ভাবে সীমাবদ্ধ করে দিলুম যে কারো কোনো সংশয়ের হেতু থাকবে না। এটা একটা ইণ্টার-ন্যাশনাল কনফারেন্স ও এর কর্মসূচী উভয় প্রান্তের পঞ্চবার্ষিক সাহিত্য প্রগতি। এখানে কী হয়েছে তার হিসাবনিকাশ তাঁরা শুনে যাবেন। ওখানে কী হয়েছে তার হিসাবনিকাশ আমরা শুনব। এই ভাবে বাংলা সাহিত্যের দুই বিচ্ছিন্ন ধারা সংযুক্ত হবে। দক্ষিণ পদের সঙ্গে বাম পদ সংগতি রক্ষা করবে। প্রগতি হবে উভয়ের ছন্দোবদ্ধ প্রগতি। বাংলা সাহিত্য বহু শতাব্দী কাল একই সাহিত্য বলে পরিচিত। তার একটাই ইতিহাস। আমাদের প্রচেষ্টা যদি সফল হয় তবে গত পাঁচ বছরের রাজনৈতিক ইতিহাস দুই হলেও সাহিত্যিক ইতিহাস একটাই থাকবে। বাংলা দেশ অবিভাজ্য না হলেও বাংলা সাহিত্য অবিভাজ্য হবে।

কাজ করতে করতে দেখা গেল শান্তিনিকেতনের জলহাওয়া জয়ী হয়েছে। বাংলার দুই প্রান্তের সাহিত্যিক যেই একত্র হলেন অমনি তাঁদের মধ্যে ভালোবাসার ঝড় বয়ে গেল। 'ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে।' শান্তিনিকেতনের লোক ভিড় করে এল পাঁচটি পূর্ব পাকিস্তানীকে স্বাগত জানাতে, আদর আপ্যায়ন করতে। তাঁদের কথা শুনতে। তাঁরাও অবাক! আমরাও অবাক। এতটা আমরা প্রত্যাশা করিনি। তখন বসন্ত উৎসব চলছে। তাঁরা উৎসবে যোগ দিলেন।

হৃদয়ের ঐক্যটাই আসল ঐক্য। হৃদয়ের ঐক্য নানা ছন্দে ব্যক্ত হল। মেলার বাইরে সামাজিকতার আয়োজন ছিল। কফি পার্টি চলল অনেক রাত তক। গুমানী দেওয়ান ও লম্বোদর চক্রবর্তীর কবিগান এবং নবনী দাসের বাউল সংগীতের দ্বারা অনুষ্ঠান সর্বাঙ্গীণ হয়।

বৈশাখ, ১৩৬০
শান্তিনিকেতন

অন্নদাশঙ্কর রায়

সাহিত্যসম্মেলনের রেওয়াজ এদেশে নতুন নয়, তার উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সাধারণক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিকতার ছকে বাঁধা। শান্তিনিকেতন সাহিত্য-মেলায় সে-গতানুগতিকতার নিছক জের টানা হয় নি; এ-অনুষ্ঠানের পরিকল্পনায় বৈশিষ্ট্য ছিল। সম্মেলনের লৌকিকতা নয়, মেলার আন্তরিকতাই ছিল তার লক্ষ্য। উদ্যোক্তারা রবীন্দ্রনাথের এ-উক্তির তাৎপর্য বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন: "সাহিত্য শব্দের মধ্যে একটি মিলনের ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যে-দেশে সাহিত্যের অভাব, সে-দেশের লোক পরস্পর সজীব বন্ধনে সংযুক্ত নহে—তাহারা বিচ্ছিন্ন।" বস্তুত এই উক্তিটিই ছিল সাহিত্যমেলার উদ্দেশ্যলিপি। সাহিত্যই ছিল একমাত্র আলোচনার বিষয়, সাহিত্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতি নয়। চেষ্টা করা হয়েছিল আলোচনা যেন নির্বিশেষ উক্তির অস্পষ্টতা এড়িয়ে তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। মেলা-সমিতির তরফ থেকে বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিককেই দলমতনির্বিশেষে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাঁদের সকলের পক্ষে যোগদান করা সম্ভব না হলেও পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার প্রায় পঞ্চাশজন স্বনামখ্যাত লেখক এই মেলায় যোগদান করেন। আলোচ্য সাহিত্যের কালসীমা নির্ধারিত ক'রে দেওয়া হয় স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সময় থেকে এখন পর্যন্ত পাঁচ বছর। এই সময়ে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলায় যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে তাকে বিষয় হিসাবে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়, যথা: লোকসাহিত্য (এই বিশেষ শাখার আলোচনা

অবশ্য পাঁচ বছরের কালসীমায় আবদ্ধ রাখা সম্ভব হয় নি), শিশুসাহিত্য, কাব্য ও নাট্য-সাহিত্য, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধসাহিত্য। প্রতিটি বিষয়ে পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গে প্রকাশিত সাহিত্যের বিবরণ উপস্থিত করা হয় এবং বিভিন্ন দিক থেকে তার আলোচনা ও মূল্য বিচার করা হয়। বলা বাহুল্য, উদ্দেশ্যের দিক থেকে অনুষ্ঠানটি ছিল একান্তই পরীক্ষামূলক।

১৫ই থেকে ১৭ই ফাল্গুন, ১৩৫৯, এই তিনদিন ধরে মেলার অনুষ্ঠান চলে। শান্তিনিকেতনের কর্মী, ছাত্রছাত্রী ও অধিবাসীদের নিয়ে গঠিত একটি কার্যনির্বাহক সমিতি এই মেলার আয়োজন করেন। আনুষঙ্গিক ব্যয়-নির্বাহের জন্যে অর্থসংগ্রহ করা হয়েছিল সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিদের (প্রধানতঃ স্থানীয় অধিবাসীদের) কাছে চাঁদা তুলে। বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সর্বাঙ্গীণ আনুকূল্য-লাভের ফলেই মেলা-সমিতির পক্ষে তাঁদের এই গুরুদায়িত্ব বহন করা সম্ভব হয়। অধিবেশন হয়েছিল সর্বসমেত পাঁচটি, উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ে। উদ্যোক্তারা এতদতিরিক্ত একটি ঘরোয়া আলোচনা বৈঠকের—যাকে বলে কন্‌ভার্সাংসিয়োনে—আয়োজন করতে চেয়েছিলেন, সময়াভাবে তা সম্ভব হয়নি।

মেলার উদ্‌বোধন হয় ১৫ই ফাল্গুন সন্ধ্যায়। অনুষ্ঠান শুরু করা হয় 'সবারে করি আহ্বান' গানটি দিয়ে। মেলা-সমিতির সাধারণ সভাপতি শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর প্রারম্ভ-ভাষণে মেলার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন: "আমাদের উদ্দেশ্য প্রথমতঃ লেখকদের পরস্পরের মধ্যে মিলন ও সম্প্রীতি সাধন; দ্বিতীয়তঃ গত পাঁচ বছর বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-সব পরিবর্তন বা পরিণতি দৃষ্টিগোচর হয়েছে তার আলোচনা ও হিসাবনিকাশ, যাকে বলা চলে stock-taking। বঙ্গবিভাগের ফলে বাংলাসাহিত্য দু'টি স্বতন্ত্র ধারায় বিভক্ত হয়ে গেছে। তার এক ধারা প্রবাহিত হচ্ছে পূর্ববঙ্গে, আর-এক ধারা পশ্চিমবঙ্গে। এই দুই ধারারই দিক্ নির্ণয় করবার জন্যে আজ এই রকম একটি মেলা আহ্বানের প্রয়োজন হয়েছে।" বিশেষভাবে

তিনি স্বাগত অভিবাদন জানান পূর্ববঙ্গ থেকে অভ্যাগত অতিথিবৃন্দকে। মেলার উদ্বোধন করেন উপদেশকমণ্ডলীর প্রধান শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। উদ্বোধনপ্রসঙ্গে তিনি বলেন: "স্থানীয় ছাত্রছাত্রী ও আশ্রমবাসীদের এই শুভ প্রচেষ্টার মূলে প্রেরণা জুগিয়েছে শান্তিনিকেতনেরই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এ ঐতিহ্য মিলন ও প্রীতির ঐতিহ্য। বিরোধের নয়। এই কারণে এঁরা প্রচলিত রীতির অনুবর্তনে সাহিত্যসভা না ডেকে ডেকেছেন এই সাহিত্য-মেলা। এখানে সকলেরই সাদর আহ্বান, বিভেদের কোনো স্থান নেই। উদ্যোক্তাদের তাই আমি আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত না ক'রে পারিনি।"

রথীন্দ্রনাথের ভাষণের শেষাংশ ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ: "গত পাঁচ বছরে বাংলা দেশের রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে অনেক পরিবর্তন এসেছে। নানা বিষয়ে আমরা স্বাতন্ত্র্যলাভ করেছি। সামাজিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে অনেক ভাঙাগড়ার সম্মুখীন হয়েছি। সাহিত্যেও এই হাওয়া-বদলের সুর অনেকখানি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। উদ্যোক্তারা অনুভব করেছেন, এই সন্ধিক্ষণের সাহিত্যপ্রচেষ্টার একটা হিসাবনিকাশ নেওয়া দরকার। এই পাঁচ বছরে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় উল্লেখযোগ্য কাজ কতটুকু হয়েছে, আমাদের কবি-কথাসাহিত্যিক-নাট্যকার-প্রবন্ধকারেরা কি ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন ও কতখানি এগিয়েছেন, এ সম্বন্ধে তাঁরাই এই সাহিত্যমেলায় তাঁদের মতামত পেশ করবেন, আলোচনা ও ভাষণের মধ্য দিয়ে। লোকসাহিত্যকেও এই মেলায় সসম্মানে স্থান দেওয়া হয়েছে। সাহিত্যিকেরা যেমন এই মেলামেশার মধ্য দিয়ে তাঁদের পারস্পরিক ঐক্য ও প্রীতির সম্পর্ক নিবিড়তর ক'রে তোলার সুযোগ পাবেন, সাহিত্য-পাঠকেরাও তেমনি সাহিত্য-স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভ করে আনন্দিত হবেন। এই মেলার ভিতর দিয়ে সাহিত্য-প্রেমিকদের হৃদয়ে-হৃদয়ে যে সেতুবন্ধন সম্ভব হবে, অন্য কোনো উপায়ে তা দুঃসাধ্য। এই মিলনের ভাবটিই তো সাহিত্যের মূলকথা।...

কাব্যে

"সাহিত্যিক সমাজ-নিরপেক্ষ নন। সামাজিক বন্ধনই তাঁর সৃষ্টির উপজীব্য ও প্রেরণাস্থল। যে কোনো মেলাই এই সমাজ-জীবনের স্বীকৃতি। সাহিত্যমেলাও তেমনি। সাহিত্যিকের ধর্ম হল জীবনে জীবন যোগ করা। সাহিত্যমেলা সেই মহৎ সামাজিক আদর্শেরই অঙ্গীকার। এখানে এসে সাহিত্যশিল্পী আর নিঃসঙ্গ নন, একক নন,—এখানে তিনি আমাদের আপনজন। আপনজনের অভ্যর্থনায় হয়তো উদ্যোক্তাদের দৈন্য প্রকাশ পেয়েছে, আশা করি এ দৈন্য আপনারা ক্ষমার চোখে দেখবেন।···

"এখানে আমরা যারা উপস্থিত আছি সকলেই ভালোবাসি বাংলা ভাষাকে। এই বাংলাভাষা ও সাহিত্য আমাদের অন্তরের সামগ্রী। আমরা সকলেই তার নিরন্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। এই সাহিত্যমেলায় সেই শুভেচ্ছাই আমরা প্রকাশ করতে এসেছি। সেই সঙ্গে স্মরণ করছি পূজনীয় পিতৃদেবকে, যিনি অনুভব করেছিলেন এই বাংলা ভাষার অমিত শক্তি, প্রাণ দিয়ে তাকে ভালোবেসেছিলেন। বহুদিন আগে এই কথাই তিনি লিখেছিলেন :

> বাঙালির ঐক্যের মূলসূত্রটি কী? আমরা এক ভাষায় কথা কই। আমরা দেশের এক প্রান্তে যে-বেদনা অনুভব করি, ভাষার দ্বারা দেশের অপর সীমান্তে তাহা সঞ্চার করিয়া দিতে পারি। রাজা তাঁহার সমস্ত সৈন্যদল খাড়া করিয়া তাঁহার রাজদণ্ডের সমস্ত বিভীষিকা উদ্যত করিয়াও ইহা পারেন না। শত বৎসর পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষ যে গান গাহিয়া গিয়াছেন, শত বৎসর পরেও সেই গান বাঙালির কণ্ঠ হইতে উৎপাটিত করিতে পারে, এত বড়ো তরবারি কোনো রাজাস্ত্রশালায় আজো শানিত হয় নাই। এ শক্তি ভিক্ষালব্ধ নহে। এই চিরন্তন শক্তিযোগে সমস্ত দূরত্ব লঙ্ঘন করিয়া অপরিচয়ের সমস্ত বাধা ভেদ করিয়া আজ এই

সভাতলে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের, আগত ও অনাগতের, সমস্ত বাঙালিকে আপন উদ্বেল হৃদয়ের সম্ভাষণ জানাইবার অধিকারী হইয়াছি ॥

রবীন্দ্রনাথেরই ভাষায় স্বাগত সম্ভাষণ জানাই সাহিত্য-মেলায় সমাগত মাননীয় অতিথিবৃন্দকে। তাঁদের শুভাগমন সার্থক হোক।"

উদ্বোধনের অব্যবহিত পরেই আরম্ভ হয় লোকসাহিত্যের অধিবেশনটি। প্রত্যেকটি অধিবেশনেই বিভাগীয় আহ্বায়ক তাঁর প্রারম্ভভাষণের মধ্য দিয়ে আলোচনার সূত্রটি ধরিয়ে দেন। এই অধিবেশনের পর সভামণ্ডপে রাত দশটা থেকে মধ্য রাত্রি পর্যন্ত জনাব শুমানী দেওয়ান ও শ্রীলম্বোদর চক্রবর্তীর কবিগান বিশেষ উপভোগ্য হয়েছিল।

পরদিন ১৬ই ফাল্গুন ছিল দোলপূর্ণিমা, এ উপলক্ষ্যে সকালে আশ্রমের বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্যমেলার শিশুসাহিত্য শাখার বৈঠকটি বসে অপরাহ্ণ দুটোয়। আশ্রমবাসী শিশুদের একটি গান দিয়ে এই অধিবেশন শুরু হয়। শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার প্রেরিত দীর্ঘ আশীর্ভাষণও পঠিত হয়। এদিন অনুষ্ঠান শেষে শ্রীযুক্তা লীলা রায়ের বাড়িতে অভ্যাগত সাহিত্যিকদের চা-পার্টিতে আপ্যায়িত করা হয়; সেখানে শ্রীনবনী দাসের বাউল গানেরও আয়োজন ছিল। সন্ধ্যায় বসন্তোৎসব উপলক্ষ্যে আশ্রম-বাসীরা গৌরপ্রাঙ্গণে 'চিত্রাঙ্গদা' অভিনয় করেন। পূর্ণিমা রাত্রে 'প্রাক্তনী'র ছাদে সাহিত্যিকদের একটি কফি-পার্টিতে নিমন্ত্রণ করা হয়, সেখানে অনেক রাত পর্যন্ত আলাপ, গান ও কবিতাপাঠ হয়। উপস্থিত কবিদের অনেকেই —শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়, শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র, শ্রীদিনেশ দাস, শ্রীনরেশ গুহ, শ্রীশামসুর রাহ্‌মান, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় প্রভৃতি—সেখানে স্বরচিত কবিতা পাঠ ক'রে শোনান। সেদিনকার গানের মধ্যে নজরুলবন্ধু ডাঃ কাজী মোতাহার হোসেনের গাওয়া নজরুলগীতি মনে রাখবার মতো।

১৭ই ফাল্গুন তিনটি অধিবেশন বসে। সাহিত্য-মেলা উপলক্ষ্যে বিশ্ব-

ভারতীর কর্তৃপক্ষ সেদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটির ব্যবস্থা করেন। সকালে ছিল কাব্য ও নাট্যসাহিত্যের বৈঠক। আহ্বায়কের ভাষণের পরই প্রবীণ কবি শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত স্বরচিত একটি কবিতা পাঠ ক'রে শোনান। তাঁর পড়বার বিশিষ্ট ভঙ্গীটি উপস্থিত সকলকেই মুগ্ধ করেছিল :

…আমরা যাহারা কাব্য লিখি
তোমাদের ক্ষমা যেন পাই।
আমরা চালের দর জানি ;
উদর হৃদয়াধিক মানি ;
আমরাও চেষ্টা করি ভাই
অন্য পথে মীমাংসিতে
এ বিশ্বের অন্ন সমস্যাই ;—
ক্ষমা মাগি ভাই ॥

অপরাহ্ণে কথাসাহিত্যের অধিবেশন হয়।

সন্ধ্যার অধিবেশনে আলোচনার বিষয় ছিল প্রবন্ধ-সাহিত্য। এটি ছিল মেলার সর্বশেষ অধিবেশন। শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর শেষ ভাষণে বলেন : "সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙালী বিভেদ ভুলে এক হয়ে মিলতে পারবে এ আশ্বাস এই সাহিত্য-মেলা থেকে পাওয়া গেল। এই মেলাটির মধ্য দিয়ে সেই মেলামেশার পথই প্রশস্ত হল।"

যে মিলন ও সম্প্রীতির সুরে মেলা আরম্ভ হয়েছিল, সেই সুরেই তা শেষ হয়।

সাহিত্যমেলার সব অধিবেশনগুলিই অনুষ্ঠিত হয়েছিল সংগীতভবনের নবনির্মিত মঞ্চে। অতিথিরা ছিলেন প্রাক্তন ছাত্রদের আবাস 'প্রাক্তনী'তে, বিচারপতি শ্রীব্রজকান্ত গুহর ভবনে ও আশ্রমের বিভিন্ন গৃহস্থের বাড়িতে। তিনদিনের জন্যে একত্র অবস্থান ও আহারবিহারের ফলে তাঁদের পরস্পরের মধ্যে চেনাশোনার যথেষ্ট সুযোগ ঘটে, যা অন্যত্র দুর্লভ। অভ্যাগত

সাহিত্যিকবৃন্দ ও আশ্রমবাসীদের মধ্যেও একটি মধুর প্রীতিসম্পর্ক স্থাপিত হয়। শান্তিনিকেতনের পরিবেশ এবং কর্মিবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীদের আতিথেয়তার বারংবার প্রশংসা ক'রে অতিথিরা বিদায়-গ্রহণ করেন। বিদায়ের পুর্বে কবি শ্রীযতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তাঁর শেক্‌স্পিয়র-অনুবাদের খসড়া একটি ঘরোয়া বৈঠকে পড়ে শোনান।

নিমন্ত্রিতদের মধ্যে যাঁরা শেষ পর্যন্ত নানা কারণে আসতে না পেরে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন তাঁদের মধ্যে এঁরাও ছিলেন: ডাঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, জসীম উদ্দীন, আবুল ফজল, মোতাহের হোসেন চৌধুরী (ঢাকার নন, চট্টগ্রামের), শাহেদ আলী, বেগম শামসুন নাহার, আশরাফ সিদ্দিকি, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, মন্মথ রায়, ডাঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, "বনফুল", শিবরাম চক্রবর্তী, শিবনারায়ণ রায়, শম্ভু মিত্র, তপনমোহন চটোপাধ্যায়, কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, মণীন্দ্রলাল বসু, মৈত্রেয়ী দেবী, চপলাকান্ত ভট্টাচার্য, মনোজ বসু, কানাই সামন্ত, গোপাল ভৌমিক, নারায়ণ চৌধুরী। এ ছাড়া শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন ঢাকার পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, ঢাকা ও শ্রীহট্টের "নও বেলাল", কলকাতার প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ এবং শিশু-সাহিত্য পরিষদ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানও। এঁদের মধ্যে অনেকে অনুপস্থিত থেকেও সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন। উদ্‌যোগ পর্বে মেলাসমিতিকে বিশেষভাবে উপকৃত করেন পুর্ববঙ্গের বিশিষ্ট সংবাদপত্রগুলি।

বলা বাহুল্য আশ্রমবাসীদের অর্থানুকূল্য ও অকৃপণ সহায়তা ব্যতীত এ অনুষ্ঠান সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারত না। বিশ্বভারতীর উপাচার্য শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কর্মসচিব শ্রীনিশিকান্ত সেন, শ্রীব্রজকান্ত গুহ, শ্রীনরেন্দ্রনাথ চৌধুরী ও শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘের আনুকূল্য বিশেভাবে স্মরণীয়। পরিকল্পনার সূচনা থেকেই উদ্যোক্তাদের বিশেষভাবে উৎসাহ দান করেন

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু, আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন ও শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী। মণ্ডপসজ্জা, যানবাহন-ব্যবস্থা, স্বেচ্ছাসেবক-ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যাপারে যাঁরা সাহায্য করেছেন তাঁদের কাছেও মেলা-সমিতি কৃতজ্ঞ।

শ্রাবণ, ১৩৬০

কলিকাতা

নিমাই চট্টোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন সাহিত্যমেলা

আলাপ আলোচনার বিষয় বিভাগোত্তর বাংলাসাহিত্য
আলাপী ও আলোচক পূর্ববঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের সাহিত্যিকগণ
স্থান শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতীর সংগীতভবন মঞ্চ
কাল ১৫ই, ১৬ই ও ১৭ই ফাল্গুন ১৩৫৯
উদ্বোধন ১৫ই ফাল্গুন সন্ধ্যা
উদ্বোধক রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

লোকসাহিত্য অধিবেশন : ১৫ই ফাল্গুন সন্ধ্যা

সভাপতি : প্রবোধচন্দ্র বাগচী
আহ্বায়ক : অমিয়কুমার সেন
যোগদাতা : মুহম্মদ মনস্থরউদ্দীন, আশুতোষ ভট্টাচার্য, শান্তিদেব ঘোষ, গুমানী দেওয়ান, বীণা দে, পঞ্চানন মণ্ডল, কুঞ্জবিহারী দাশ
কবিগান : ১৫ই ফাল্গুন রাত্রি : গুমানী দেওয়ান ও লম্বোদর চক্রবর্তী

শিশুসাহিত্য অধিবেশন : ১৬ই ফাল্গুন অপরাহ্ণ

সভানেত্রী : ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
আহ্বায়ক : প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

যোগদাতা : লীলা মজুমদার, নরেন্দ্র দেব, চিত্তরঞ্জন দেব

চা পার্টি : ১৬ই ফাল্গুন অপরাহ্ণ : অন্নদাশঙ্কর ও লীলা রায়ের গৃহে

বাউল সংগীত : নবনী বাউল ও পূর্ণ বাউল : ঐ সময় ঐ গৃহে

কফি পার্টি : ঐ রাত্রি একটা পর্যন্ত প্রান্তনী গৃহে

কাব্যনাটক অধিবেশন : ১৭ই ফাল্গুন সকাল

সভাপতি : প্রবোধচন্দ্র সেন

আহ্বায়ক : অশোকবিজয় রাহা

প্রধান অতিথি : যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

যোগদাতা : রাধারানী দেবী, অজিত দত্ত, শামসুর রাহ্‌মান, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, নরেশ গুহ, দিনেশ দাস, তুলসী লাহিড়ী, শচীন সেনগুপ্ত

উপন্যাস ও ছোটগল্প অধিবেশন : ১৭ই ফাল্গুন বিকাল

সভাপতি : অন্নদাশঙ্কর রায়

আহ্বায়ক : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

যোগদাতা : প্রতিভা বসু, হরপ্রসাদ মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, বাণী রায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, কাজী মোতাহার হোসেন, জগদীশ ভট্টাচার্য

প্রবন্ধ ও রম্যরচনা অধিবেশন : ১৭ই ফাল্গুন সন্ধ্যা

সভাপতি : কাজী আবদুল ওদুদ

আহ্বায়ক : সুনীলচন্দ্র সরকার

যোগদাতা : বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার,
কাজী মোতাহার হোসেন, প্রবোধচন্দ্র সেন,
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অম্লান দত্ত

সমাপন : অন্নদাশঙ্কর রায়

কর্মকর্তা সমিতি

সভাপতি : অন্নদাশঙ্কর রায়
সাধারণ সম্পাদক : ক্ষিতীশ রায়
কোষাধ্যক্ষ : ক্ষিতীশ রায় : তাঁর স্থলে সুকুমার বসু
যুক্ত সম্পাদক : গৌরী দত্ত ও নিমাই চট্টোপাধ্যায়
অপর সদস্য : লীলা রায় ও লীলা মজুমদার

ঠিকানা

ক্ষিতীশ রায়, সাধারণ সম্পাদক, সাহিত্যমেলা, শান্তিনিকেতন

লোকসাহিত্য

শিশুসাহিত্য

* অনুলিখিত

কাব্য ও নাট্যসাহিত্য

কথাসাহিত্য

প্রবন্ধসাহিত্য

লোকসাহিত্য

লোকসাহিত্য

অমিয়কুমার সেন

আজকের দিনে আমরা যাকে লোকসাহিত্য আখ্যা দিই, প্রত্যেক দেশেই সেটাই প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যসৃষ্টির আদিতম নিদর্শন। সর্বদেশে সাহিত্য লোকসাহিত্যরূপেই ভূমিষ্ঠ হয়, প্রাকৃতজনের ধাত্রীত্বেই তার শৈশব কাটে। পরে কোনো শক্তিশালী কবি লোকসাহিত্যের খণ্ড ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত অংশগুলিকে আপনার প্রতিভার জাদুস্পর্শে একটি পরিমার্জিত যোগসূত্রের বন্ধনে বেঁধে দেন, সেটাই সাধুসাহিত্যের অনুকরণ-যোগ্য আদর্শ বলে স্বীকৃত হয়। দেশে দেশে ব্যাস হোমার বাল্মীকিরা এই কাজ করেই আদিকবি বলে খ্যাত হয়েছেন। সুতরাং লোকসাহিত্যের আলোচনা দিয়ে সাহিত্যমেলার উদ্বোধন উপযুক্তই হয়েছে।

তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ে লোকসাহিত্যের আলোচনার বিশেষ একটি মূল্য আছে। আধুনিক কালে লোকসংস্কৃতির নানা শাখার প্রতি শিল্পস্রষ্টা ও শিল্পরসিকদের দৃষ্টি তিনিই আকর্ষণ করেছিলেন। তাঁর প্রবর্তনায় শুধু যে বাংলাদেশেই লোকসাহিত্য, লোকসংগীত এবং লোকশিল্পের পুনরভ্যুত্থান ঘটেছিল তা নয়, বাংলার বাইরে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ প্রচেষ্টার সূচনা হয়েছিল। লোকসাহিত্যের সৃষ্টি দেশের মাটিতে; দেশের জনসাধারণের ছোটখাট সুখদুঃখ, তাদের দৈনন্দিন জীবনের আনন্দবেদনার আলেখ্য এরই মধ্যে ধরা পড়ে। সাধুসাহিত্যের

মধ্যে এক ধরনের কৃত্রিমতা আছে, দেশের মাটির সঙ্গে তার নাড়ির সম্পর্ক বহু ক্ষেত্রে সেই কৃত্রিমতার আবরণে ঢাকা পড়ে যায়। লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার সে-কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত। ইংরেজ-অধিকারের প্রথম যুগে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ভিত্তি যখন নড়ে উঠেছিল, তখন আমাদের স্বরূপটিকে একবার যাচাই করে নেবার প্রয়োজন হয়েছিল। সেই স্বরূপ-সন্ধানের প্রচেষ্টাতেই আবার নূতন করে আমাদের লোকসাহিত্য এবং লোকশিল্পগুলির প্রতি দৃষ্টি পড়ে; কারণ আমাদের পরিচয় সেখানে পূর্ণতর, আমাদের খাঁটি স্বরূপটি প্রকাশের অপেক্ষায় তার মধ্যে আত্মগোপন করেছিল। এই চেষ্টায় যাঁরা ব্রতী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের পুরোভাগে। আধুনিক কালে রবীন্দ্রনাথের পূর্বেও লোকসাহিত্য সংগ্রহের প্রচেষ্টা হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র সংগ্রাহক ছিলেন না। প্রাচীন কালে ব্যাস হোমার বাল্মীকিরা যে কাজ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ অন্য উপায়ে সে-কাজই করে গিয়েছেন। লোকসাহিত্যের সৌন্দর্যের প্রতি তিনি শুধু দৃষ্টি আকর্ষণ করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। লৌকিক ছন্দকে তিনি সাধু-সাহিত্যের আসরে উন্নীত করেছেন, লোকসংগীতের সুরকে মার্গসংগীতের সুরের সঙ্গে একাসনে এনে বসিয়েছেন, লোকদর্শনের সহজ তত্ত্বটির সঙ্গে উপনিষদের ঋষিদের সূক্ষ্ম তত্ত্বের একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে সাধুসাহিত্যকে এরকম করে সমৃদ্ধ করার উদাহরণ আর কোথাও আছে কিনা জানি না। আজকাল গণ-অভ্যুত্থান গণ-সচেতনতা ইত্যাদির অভিমান সত্ত্বেও আমরা তাঁর প্রদর্শিত পথে তাঁর থেকে বেশি অগ্রসর হতে পারি নি। শান্তিনিকেতনে লোক-সাহিত্যের আলোচনা যদি আমাদের এ-বিষয়ে সাহায্য করে তবে এই সাহিত্যমেলার উদ্দেশ্য সফল হবে। সাহিত্যমেলা নামটিরও এই বিশেষ উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি রয়েছে।

লোকসাহিত্য সাহিত্যসৃষ্টির আদিতম নিদর্শন। তবু লোকসাহিত্যের প্রগতি এবং সরসতার ইতিহাস সাধুসাহিত্যের চেয়ে অনেক বেশি ঘটনাবহুল; দেশের নাড়ির সঙ্গে তার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ বলেই লোক-মানসের পরিবর্তন এবং দেশের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সে তাল রেখে চলে। সাধুসাহিত্য বহু ক্ষেত্রেই সেখানে পশ্চাৎপদ হয়ে পড়ে। লোক-সাহিত্যের কোন বিশেষ ধারাকে নিয়মানুগ পদ্ধতির মধ্যে বেঁধেই তাকে সাধুসাহিত্যের আসরে উন্নীত করা হয়। কিন্তু কিছুকাল পরে সে পদ্ধতির বন্ধনে তার সরসতা যায় হারিয়ে, অনুষ্টুপ্ ত্রিষ্টুভ ছন্দের অপ্রসর গণ্ডীর মধ্যে হ্রস্ব-দীর্ঘ বর্ণের বিন্যাস মেনে তাকে সাবধানে পা ফেলে চলতে হয়। অলংকার এবং ভাষাপ্রয়োগের কাটা খালের খাত থেকে তার উচ্ছ্বাস উপচে পড়লে বৈয়াকরণরা হা হা করে ছুটে আসেন। তার ফলে দৈনন্দিন ভাষার থেকে সাহিত্যের ভাষা যায় আলাদা হয়ে, বাল্মীকির দণ্ডকারণ্য বর্ণনার উপাদানগুলি বহু পরবর্তী সাহিত্যিকের রচনায় ভৌতিক ছায়া ফেলতে থাকে, কাব্যের সরসতা কাব্যরচনার বিধি-নিষেধের কাছে পদে পদে হার মানতে থাকে। কিন্তু লোকসাহিত্য এই সব সংস্কার থেকে মুক্ত। কৃত্রিম পদ্ধতির জটিলতার মধ্যে তার সরসতার অপমৃত্যু ঘটে না। ভারতচন্দ্রের রচনার সঙ্গে প্রায় সমকালীন ময়মনসিংহ-গীতিকার তুলনা করলে এ-কথার সত্যতা বোঝা যাবে। ভারতচন্দ্রের সময় সুন্দরীর রূপবর্ণনার প্রাচীন উপাদান-গুলির জৌলুস প্রায় লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই বিদ্যার সুন্দর চোখগুলির সাদৃশ্য রাখতে গিয়ে পদ্মকে অনেক বিশেষণে ভূষিত হতে হয়েছে, তার খঞ্জন গমনের সঙ্গে একটি খঞ্জন আর তাল রাখতে পারে নি, শত শত খঞ্জন এসে জুটেছে। একটি কোকিলের কণ্ঠস্বরে বিদ্যার কণ্ঠের উপমা খুঁজে পাওয়া যায় নি, ঝাঁকে ঝাঁকে কোকিলের আমদানি করতে হয়েছে। অথচ মহুয়া মলুয়ার রূপবর্ণনায় যে-সরসতা তার তুলনা নেই—

চইক্ষেতে অপরাজিতা গায়ে চাম্পা ফুল।

কিংবা—

ভাদ্র মাসের চাঁদনি যেমন দেখায় গাঙের তলা
বৃক্ষতলে গেলে কন্যা বৃক্ষতল আলা।

অন্ত্যজ অপরাজিতা যেমন সহজে অভিজাত পদ্মকে স্থানচ্যুত করেছে তেমনি সহজেই লোকসাহিত্য আপনার সরসতা রক্ষা করেছে। লোক-সাহিত্যের সংস্কারহীনতার একটিমাত্র পরিচয় দেব। বীরভূম থেকেই সংগৃহীত একটি বাউল গানে আছে—

মন পড়গা ইস্কুলে
নইলে কষ্ট পাবি শেষ কালে
আমার গোরাচাঁদ হেডমাস্টার প্রেমের নদীয়ায়
আবার দয়াল গুরু নিত্যানন্দ ডেকে প্রেম বিলায়।

ইস্কুল এবং হেডমাস্টাররূপ anachronism-এর পীড়ন সাধুসাহিত্যের পক্ষে এত সহজে সহ্য করা সম্ভব ছিল না। লোকসাহিত্যের সংস্কারমুক্ত মন একে সম্ভব করেছে। আধুনিক কালে আমরা যখন সাহিত্য এবং শিল্পে সংস্কারমুক্তির বিশেষ চেষ্টা করছি তখন এই লোকসাহিত্যের কবিরা আমাদের কাছে আদর্শস্থানীয় হতে পারেন। আজকের আলোচনায় যদি সে পথ কিছুমাত্রও সুগম হয় তবে আমাদের লোকসাহিত্যালোচনা সার্থক মনে করব।

লোকসাহিত্য ও পারস্পরিক সমঝোতা

মুহম্মদ মনস্সুরউদ্দীন

জাতীয় আত্মোপলব্ধির প্রথম সোপান হল পারস্পরিক সহানুভূতি। একথা রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন ; আমাকে একবার বলেছিলেন, হিন্দুমুসলমানের যথার্থ সমঝোতার জন্যে রাজনৈতিক মিলনভূমির চেয়ে অর্থনৈতিক ভিত্তিভূমির প্রয়োজনীয়তা বেশি এবং শ্রীনিকেতনে সে আদর্শ তিনি স্থাপন করেছেন যেখানে উভয় সমাজের লোক সহজ ও স্বাভাবিক ভাবে মিলতে পারে।

আজকের মানুষের জন্যে সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন সর্বজাতীয় সমঝোতার। মানুষে-মানুষে বোঝাপড়া যেমন প্রয়োজন, তার চেয়ে বহু গুণ বেশী প্রয়োজন তেমনি জাতিতে-জাতিতে বোঝাপড়া। এই আন্তর্জাতিক ঐক্যের সমস্যা থেকেই ইউরোপ-আমেরিকার নানা দেশে নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। একথা সকলেই স্বীকার করছেন যে মানুষ আজ বিপন্ন, অসহায়। বিশ্বকে একনীড় করার জন্য রবীন্দ্রনাথ গড়েছিলেন এই শান্তিনিকেতন এবং লোকশিল্প ও সংস্কৃতির কেন্দ্র শ্রীনিকেতন। অনুরূপ প্রতিষ্ঠান আজ দুনিয়ার সর্বত্র প্রয়োজন। যেন দুর্যোগের দিনে—সে-দুর্যোগ অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা আদর্শগত যাই হোক না কেন—মানুষ শুধু মানুষ এই পরিচয়ের দাবিতেই নির্ভয়ে সে-বন্দরে আশ্রয় নিতে পারে।

এই ঐক্যবোধই বিশ্বকুটুম্বিতার একমাত্র পথ। পৃথিবীর সকল দেশের লোকসাহিত্যের মধ্যেই এমন একটি বিশ্বব্যাপকতা আছে যা এই কুটুম্বিতার

বিশেষ সহায়ক। স্বাভাবিক ভাবে বসুধাকে কুটুম্বকরূপে অনুভব করা বিদগ্ধ ও নাগরিক মেজাজ-সম্পন্ন এলিয়টপন্থীদের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য একদেশদর্শী। জীবন আজ জটিল বটে, তবু অন্যদিকে জীবন সরলও নিশ্চয়ই। লোকসাহিত্যে সেই সরলতারই অভিব্যক্তি লক্ষ্য করি।

রবীন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন, লোকসাহিত্যে আমাদের দেশের যেমন অপূর্বতা তা আর কোথাও পাওয়া যায় না, সে কথা যথার্থ।

লোকসাহিত্যের নানা বিভাগ রয়েছে। প্রধানত দুই ভাগ করা যায় —গদ্য ও পদ্য। গদ্যের মধ্যে রূপকথা বা গ্রাম্য গল্প পড়ে। দক্ষিণারঞ্জনের সংগৃহীত মধুমালা কিংবা দীনেশচন্দ্রের সংগৃহীত কাজলরেখা। অন্য দেশের মধ্যে জার্মানির গ্রীম-ভ্রাতৃদ্বয়ের Fairy Tales সুবিখ্যাত উদাহরণ। পদ্যের মধ্যে গান, গাথা, ছড়া, প্রবাদ, সমস্যা ইত্যাদি। লোকসাহিত্যের নানা বিভাগ মিলিয়ে যে বিজ্ঞান গড়ে ওঠে তাকে লোকবিজ্ঞান বলে—ইংরাজিতে Folklore।

যদিও বাংলাদেশের লোকসাহিত্য অতি উচ্চাঙ্গের এবং তার ভিতর দিয়ে বাঙালী জীবন অকপটভাবে ফুটে উঠেছে, তবু আজও তা আমাদের কাছে যোগ্য সমাদর পায় নি। এই সাহিত্যের পুনরুদ্ধার ও যথোচিত মূল্য নির্ধারণ করার জন্য পাকিস্তান ও ভারত উভয় রাষ্ট্রেই উৎসাহী তরুণ-তরুণীর যথেষ্ট অভাব। প্রাচ্যের কোনো দেশেই লোকবিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষ কোনো কাজ হয় নি। ইংলণ্ডের Folklore Society কিংবা Folk Song Society যে-বস্তুভার সংগ্রহ করেছেন, সমগ্র এশিয়ার কিংবা আফ্রিকার লোকসাহিত্যের মিলিত সংগ্রহ আজও তার পাশে দাঁড়াতেই পারে না। আমাদের মন এমন অকৌতূহলী ও অলস যে আমাদের ঘরের আশেপাশে যে লোকবিজ্ঞানের কত অসংখ্য মণি-মুক্তা ছড়ানো আছে তার কোনো সংবাদই রাখে না। অথচ পাক-ভারতের লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার ভরে তুলতে হলে প্রয়োজন বিরাট সংগ্রহের। সেকালের বৃদ্ধবৃদ্ধাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে কত মহৎ লোকসাহিত্য

চিরতরে লোপ পাচ্ছে। এই হারামণিগুলি সংগ্রহ করলে বর্তমান মানুষের গভীর আত্মোপলব্ধির কাজে লাগতে পারে।

একেবারে কিশোর বয়সে আকস্মিকভাবে রবীন্দ্রনাথের সংগৃহীত লালন ফকিরের গান প্রবাসীতে প্রকাশিত হতে দেখে আমি এই বাউল গান সংগ্রহের কাজে প্রেরণা পেয়েছিলাম। সে আজ ৩০।৩২ বছর পূর্বের কথা। কিছু কিছু কাজ করেছি, রবীন্দ্রনাথেরই উৎসাহে "হারামণি" প্রকাশ করেছি, কিন্তু এখনও তো অনেক কাজ করার রয়েছে। আমার দুঃখ, আমার কোনো সঙ্গী জুটল না। বয়স তো আমার পঞ্চাশ হয়ে গেল। পাক-ভারতে এক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া এমন ব্যাপকভাবে আর কোন প্রতিষ্ঠান লোক-সাহিত্যের দিকে সুনজর দেন নি। আজ স্বাধীনতা লাভের পরও কেন এই বিরাট সংগ্রহের কাজে আমাদের শিক্ষিত তরুণ-তরুণীরা এগিয়ে আসছে না, আমি বুঝতেই পারি না। অথচ জগতের সামনে সগর্বে তুলে ধরবার মতো ধনরত্ন আমাদের আছে। শুনেছি চীনের বিশ্বকোষ সংকলনের বিপুল মাল-মসলা দূর-দূরান্ত অঞ্চল হতে সংগ্রহ করে এনেছিল চীন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা।

কাজ তো যা কিছু সাহেবসুবোরাই করেছেন। গ্রিয়ারসন্ থেকে আরম্ভ করে বাকে পর্যন্ত আমাদের মানসিক আহার্য জুগিয়ে চলেছেন নিরন্তর। কিন্তু মোটকথা, লোকসাহিত্যের বিরাট সংগ্রহ আজ চাইই চাই। কারণ এইখানেই হিন্দুমুসলমানের সাংস্কৃতিক মিলন প্রতিফলিত হয়েছে! মুসলমানী ঢঙের সুর ও ভারতীয় ঢঙের সুরে এক গভীর যোগাযোগ ঘটেছে আমাদের লোকসংগীতে। এই পল্লীসাহিত্যেই অতি সহজে ধরা পড়বে ভারতীয় যোগ-সাধনা ও মুসলমানী সুফীবাদের মৌল ঐক্য। ভারতীয় সাধনার বৈষ্ণবীয় ভাবধারা কী ওতঃপ্রোতভাবে মুসলমানী লোকসাহিত্যে মিশে গেছে এবং আবার মুসলমানী ভাবধারা কি ভাবে ভারতীয় লোকসাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করেছে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে লোকসাহিত্যে। সাহিত্যের ইতিহাসে

আপনারা দেখেছেন যে রাধাকৃষ্ণের কথা হিন্দুমুসলমান উভয়েই প্রাণের জিনিস বলে গ্রহণ করেছে। শ্রীহট্টের মুসলমান কবির মুখেই শুনেছি এ-গান : 'আকুল করিল চিত্ত শ্যাম চিকন কালো।' অপরপক্ষে, আইন-ই-আকবরী বা আকবরনামায় পাওয়া যায়, এমন অনেক কথা এদেশি মেয়েদের মুখে মুখে ফেরে। এই হিন্দুমুসলমানী যুক্তসাধনা কি জাতির সম্পদ পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণের কাজে যথেষ্ট উৎসাহ সঞ্চার করতে পারে না? লোকসাহিত্যের প্রচলিত মৌখিক নানা পাঠসংগ্রহ ও সংরক্ষণের আশু প্রয়োজন রয়েছে। পূর্ববঙ্গে কিছু কাজ হচ্ছে, তবে পশ্চিমবঙ্গে ইদানীং কিছু হয়েছে কিনা তার কোনো বিশেষ খবর আমি পাই নি। অবশ্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল কিছু কাজ করছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা নগণ্য।

বাংলার বাইরে অবশ্য কিছু কাজ হচ্ছে। অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ সত্যার্থী অনেক কাজ করেছেন। বোম্বাই ইউনিভার্সিটিতেও অনেক গবেষণা হয়েছে। গুজরাটে ঝাবেরী একজন কৃতী গবেষক। কবিতা-কৌমুদীর সংকলয়িতা অনেক হিন্দী লোকসংগীত সংকলন করেছেন। কিছুকাল ধরে ডাঃ ভেরিঅর এলউইন যে-অখণ্ড মনোযোগ ও অধ্যবসায় সহকারে লোকসাহিত্য সম্পর্কে জীবনব্যাপী সাধনা করে চলেছেন এবং এই বিজ্ঞানের নানা বিভাগে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যে অনুশীলনকার্য করে যাচ্ছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। এলউইন-এর বন্ধু আর্চার সাহেবও অনেক কাজ করেছেন, তেমনি আরো অনেকে। সিন্ধি মরমিয়া লোকসাহিত্যের সম্বন্ধেও পরম উপাদেয় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু কী হয়েছে বাংলাদেশে? ডাঃ বাকে বলেছিলেন যে আমাদের এই পাক-ভারত উপমহাদেশেও লোকসংগীতের যথার্থ অনুশীলন ও Survey হওয়া দরকার। আমি বলি, সেই সঙ্গে লোকবিজ্ঞানেরও। যেমন Linguistic Survey of India-র সুষ্ঠু পত্তন করে গেছেন গ্রীয়ারসন। ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে লণ্ডনে আন্তর্জাতিক লোকসংগীত সম্মেলনে পূর্ববাংলার প্রতিনিধি-রূপে

যোগ দেবার সৌভাগ্য বর্তমান লেখকের হয়েছিল। এই সভায় ইউরোপ এশিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকার লোকসংগীত-বিশেষজ্ঞগণ যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে যোগ দিয়ে আমার ধারণা হয়েছে এশিয়ার লোক-আত্মার মূর্তি ইউরোপের কাছে উঁচু করে ধরতে হলে ইউরোপীয় স্বরলিপি প্রথায় আমাদের পাকভারত উপমহাদেশের লোকসংগীত প্রকাশ করতে হবে। অবশ্য তার আগে আমাদের স্বদেশীয় রীতিতে স্বরলিপি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা চাই। মনে হয় এই লোকসংগীতের সুর সংগ্রহের কাজে বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় অগ্রসর হলে আমাদের ক্লাসিক্যাল সুরের অনেক জটিল রহস্য ধরা পড়বে।

ভুললে চলবে না আমাদের লোকসাহিত্যের উচ্চ মরমিয়াবাদ ও অধ্যাত্মবাদ আমাদের জাতীয় জীবনের কী অমূল্য সম্পদ। রবীন্দ্রনাথকে লোকসংগীতের এই অমূল্য অধ্যাত্মতত্ত্ব জুগিয়েছিলেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন। এ তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। শান্তিনিকেতনে এসে এই প্রশ্নই করতে ইচ্ছা হয়ঃ ক্ষিতিমোহনের অমূল্য সঞ্চয় লুট করে নেবার মতো দুর্দান্ত দস্যু কেউ কি আমাদের দেশে নেই?

বাংলার লোকসাহিত্যে উপজাতির প্রভাব

আশুতোষ ভট্টাচার্য

বাংলার মেয়েলী ব্রতে কুক্কুটী-ব্রত নামে একটি ব্রত আছে; কুক্কুটীর মহিমা কীর্তন করিয়া তাহাতে একটি 'কথা'ও বর্ণিত হয়। আপাতদৃষ্টিতে কুক্কুটীর সঙ্গে বাংলার হিন্দু মেয়েদের সম্পর্কের রহস্য উদ্ধার করা যায় না; কিন্তু একটু গভীর ভাবে বিষয়টি বিবেচনা করলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে হিন্দুসমাজের বহির্ভূত কোন অঞ্চল হইতে আসিয়া এই আচারটি হিন্দু-সমাজের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। কুক্কুটীর বিরুদ্ধে হিন্দুর সংস্কার যত প্রবল ছিল, একদিন উক্ত হিন্দুসমাজের বহির্ভূত অঞ্চলের শক্তি তাহা অপেক্ষা অধিক প্রবল ছিল, নতুবা একটি বিরুদ্ধ সংস্কারকে জয় করিয়া হিন্দুর ধর্মকর্মে ইহার আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হইত না। বহুকাল পূর্বে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ তাঁহার 'বাংলার ব্রত' নামক গ্রন্থে এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বাংলার লোকসংস্কৃতিতে প্রতিবেশী উপজাতিসমূহের প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও এই পর্যন্ত এই দিকে কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই—বাংলার সংস্কৃতিবিষয়ক কোন আলোচনায় উপজাতিসমূহের দানের কথা চিরদিনই উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে এই বিষয়ে আরও যে সকল তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে তাহাদের গুরুত্ব এত অধিক যে এই বিষয়ে আর উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে সত্যের মর্যাদা রক্ষা পাইবে না।

স্বর্গীয় অবনীন্দ্রনাথ উল্লেখ করিয়াছেন যে ছোটনাগপুরের উপজাতি-সমূহ কুক্কুটীর পূজা করিয়া থাকে, একদিন তাহা হইতেই বাংলার মেয়েলী-ব্রতে এই আচারটি গৃহীত হইয়াছিল। ছোটনাগপুরের উপজাতি ব্যতীতও উড়িষ্যার উপকূল হইতে আরম্ভ করিয়া মাদ্রাজ প্রদেশের প্রায় সমগ্র সমুদ্রোপকূল ব্যাপিয়া যে সামুদ্রিক মৎস্যজীবিগণ বাস করিয়া থাকে কুক্কুট-কুক্কুটী তাহাদেরও আরাধ্য। এই বিস্তৃত অঞ্চলে মৎস্যজীবীদের পল্লীতে যে সকল 'মন্দির' আছে, তাহাদের প্রবেশ-পথের ঊর্ধ্বে বাহিরের দিক দিয়া শঙ্খ, ঝিনুক ও অন্যান্য আরাধ্য বস্তুর সঙ্গে কুক্কুটের মূর্তিও খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়। সামুদ্রিক মৎস্যজীবিগণ মূলত একই সমুদ্রোপকূলচারী উপজাতি-সম্ভূত বলিয়া অনুমিত হয়, বাংলার দক্ষিণ উপকূল বিশেষত মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণ হইতে এই মৎস্যজীবিগণ কন্যাকুমারী ঘুরিয়া মালাবার পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে, দক্ষিণ ভারতে ইহারা অধিকাংশই খ্রীস্টানধর্মাবলম্বী, কিছু কিছু মুসলমানধর্মাবলম্বীও আছে—কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তাহাদের মৌলিক ধর্মের বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখিতে পাওয়া যায় না—ইহাদের প্রায় সকলের মধ্যেই কুক্কুট বিশেষ আরাধনার বস্তু। ছোটনাগপুরের উপজাতি ব্যতীতও বাংলার দক্ষিণ উপকূল অধিবাসী এই সামুদ্রিক মৎস্যজীবিদিগের প্রভাবও বাংলার সমাজে বিস্তার লাভ করা সম্ভব। কুক্কুটীর পূজার কারণ অনুসন্ধান করিতেও বহুদূর অগ্রসর হইতে হয় না—কুক্কুটী বহুপ্রসবিনী—সেইজন্য সন্তান কামনা করিয়াই প্রধানত কুক্কুটীর পূজা করা হইয়া থাকে।

বাংলার লোকসাহিত্য ও লোকসংস্কৃতির উপকরণসমূহ বাংলার প্রান্তবর্তী অঞ্চলসমূহ আশ্রয় করিয়া এখনও কোনো প্রকারে আত্মরক্ষা করিয়া আছে। ইহার প্রধান কারণ, বাংলার মধ্যভাগ বিশেষত ভাগীরথীর দুই তীর হিন্দু সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি ছিল, এমনকি পদ্মার দুই তীরও, যাহা বর্তমানে উত্তর বিক্রমপুর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর নামে পরিচিত তাহাও এক সময়ে বৌদ্ধ ও হিন্দু সংস্কৃতির পীঠস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। একটি প্রচলিত কথা আছে যে,

ভাগীরথী উভ কূল
বারাণসী সমতুল।

ভাগীরথীর দুই তীর বাংলার বারাণসীস্বরূপ, সেইজন্য এই অঞ্চলেই সর্বাধিক উচ্চবর্ণের হিন্দুর বসতি স্থাপিত হইয়াছে। ইহাদের প্রভাববশতই এই অঞ্চলে বাংলার লোকসংস্কৃতি প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে এবং তাহার উপরই বাংলার ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। কিন্তু বাংলার প্রান্তিক অঞ্চলসমূহে উচ্চতর হিন্দুর বসতি বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্ন ভাবে স্থাপিত হইয়াছিল—ইহার ফলে তাহাদের মধ্যে কোনো সুনিবিড় সামাজিক সংহতি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। এই জন্যই তাহাদের প্রভাবও সেই অঞ্চলের সমাজের উপর ব্যাপক ও কার্যকরী হইয়া উঠে নাই। অতএব সেই সকল অঞ্চলেই বাংলার লোকসংস্কৃতির উপকরণসমূহ তাহাদের মৌলিক পরিচয় অনেকটা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছে।

বাংলার দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তস্থিত মেদিনীপুর জিলায় পটুয়ার গান ও পট-চিত্রশিল্প আজ পর্যন্ত প্রচলিত আছে, এই অঞ্চল হইতে ইহা বাংলার পশ্চিম সীমারেখা ধরিয়া বীরভূম জিলা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। যদিও একথা সত্য যে বর্তমানে পৌরাণিক বিষয়সমূহই প্রধানত এই সকল সংগীত ও চিত্রের উপজীব্য তথাপি এখন পর্যন্ত বহু লৌকিক বিষয়বস্তুও ইহাদের উপজীব্য হইয়া থাকে। এ কথা অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে হিন্দুধর্মের মধ্যস্থতায় পৌরাণিক বিষয়সমূহ এই অঞ্চলের সমাজে জনপ্রিয়তা লাভ করিবার পূর্বে একমাত্র লৌকিক বিষয়বস্তুই ইহাদের উপজীব্য ছিল। বাংলাদেশের বিশেষ একটি অঞ্চলে ওই রীতি কি ভাবে প্রচার লাভ করিল? পটুয়ারা মূলত কোন্ জাতি? এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তবে একটি বিষয় সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে উড়িষ্যার সঙ্গে এই পটুয়া শিল্প ও সংগীতের নিবিড় যোগ আছে। উড়িষ্যার রেখাচিত্রের সঙ্গে বাংলার এই পটচিত্রের তুলনা করিলেই ইহা বুঝিতে পারা যাইবে। মেদিনীপুর অঞ্চলে

প্রচলিত প্রত্যেক পটেই যমপুরীর চিত্রের মত পুরীর জগন্নাথদেবের চিত্রও অঙ্কিত হইয়া থাকে। ইহা উড়িয়া সংস্কৃতিরই প্রভাবের ফল বলিতে হয়। বিশেষত মেদিনীপুর অঞ্চল একদিন উড়িষ্যার স্বাধীন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। উড়িষ্যার রেখাচিত্রশিল্পের উপর যে উড়িষ্যার বিভিন্ন উপজাতির আদিম শিল্পের (primitive art) প্রভাব বর্তমান রহিয়াছে তাহা ডক্টর ভেরিয়র এলউইন্ সম্পাদিত Tribal Art of Middle India নামক গ্রন্থে প্রকাশিত কতকগুলি চিত্র হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বাংলার মেয়েদের সেঁজুতি ও মাঘমণ্ডল ব্রতের আলপনার সঙ্গে উড়িষ্যার আদিবাসী শবরজাতির দেয়াল-চিত্রের অপূর্ব সাদৃশ্য রহিয়াছে। একটি উপজাতীয় সংস্কৃতিকে স্বাঙ্গীকৃত করিয়া উড়িয়ার লোকশিল্প গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাই দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার পট-শিল্প ও পটুয়া সংগীতের প্রেরণা দান করিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে।

ভাদুগান পশ্চিম বাংলার লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঞ্চল। ইহাও বাংলার পশ্চিম প্রান্তবর্তী জিলাসমূহ যেমন, মানভূম, বাঁকুড়া ও বীরভূমের প্রধানতঃ কুমারী মেয়েদিগের মধ্যে ব্যাপক প্রচলিত আছে। সমস্ত ভাদ্র মাস ব্যাপিয়া এই লোকসংগীত গীত হয় বলিয়াই ইহার নাম ভাদু, কিন্তু কালক্রমে ভদ্রেশ্বরী নাম্নী একটি রাজকন্যার কাহিনী ইহার সঙ্গে আসিয়া যুক্ত হইয়াছে। অবশ্য রাজকন্যার কাহিনীটি ইহার লক্ষ্য নয়, এই অঞ্চলের প্রকৃতিজীবনে ভরা বর্ষায় যে-চঞ্চলতা দেখা দেয় তাহাই কুমারীহৃদয়ে এই গানের তালে দোল দিয়া থাকে। এই অঞ্চলের যে সকল নদনদী সারা বৎসর বালুকা-শয্যায় বিলীন হইয়া থাকে ভাদ্রের পরিপূর্ণ বর্ষায় তাহারা এক উদ্দাম আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠে। ভরা বর্ষার এই উন্মাদনাই কুমারীহৃদয়ে সংগীতের উৎসমুখ খুলিয়া দেয়। ভাদুপূজা এই অঞ্চলের পল্লীবালার বর্ষা-উৎসব। বাংলার পশ্চিম প্রান্ত হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যভারতের সমস্ত উপজাতির মধ্যে এই সময় নৃত্য-গীতের সমারোহ পড়িয়া যায়। ভাদ্রমাসেই ছোটনাগপুরের ওরাওঁ মুণ্ডা-

দিগের নৃত্যগীতোৎসব 'করম' অনুষ্ঠিত হয়, এই সময়ই মধ্যভারতের আদিবাসী কুমারীগণ 'কাজরী' ও 'ঝোলা' সংগীতে মাতিয়া উঠে। অতএব অতি সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে ভাদুগানও ইহাদেরই একটি রূপ মাত্র। ইহার মধ্যে কল্পজগতের কোনো রাজপুত্রও নাই, কোনো রাজকন্যাও নাই—প্রকৃতির প্রত্যক্ষ রূপ চিরদিনই মানব-মনে যে-অনুভূতি জাগাইয়া আসিতেছে ইহার মধ্য দিয়া তাহারই সহজ বিকাশ হইয়াছে মাত্র।

বর্ধমান ও বীরভূম মধ্যযুগে মঙ্গলগান রচনার পীঠস্থান হইয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য মঙ্গলগান লোকসাহিত্যের স্তর হইতে উন্নীত হইয়া ক্রমে উচ্চতর সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, তথাপি লোকসাহিত্যের যে-সকল বিচ্ছিন্ন উপকরণ লইয়া মঙ্গলগান একটি পরিণত রূপ লাভ করিয়াছিল তাহা স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে তাহাদিগের উপরও উপজাতীয় সাহিত্যের প্রভাব বর্তমান রহিয়াছে। মঙ্গলগানের একটি প্রধান অঙ্গ বারমাসী বা ছয়মাসী। পাটনা জিলার ভূমিহার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও রাজপুত পরিবারের মেয়েদের মধ্যেও 'ছৌমাসা' নামক এই প্রকার লোকসংগীতের প্রচলন আছে। অথচ পূর্ব বিহার অঞ্চলের পশ্চিমে ইহা প্রচলিত নাই। অতএব মনে হয় পশ্চিম বাংলা ও পূর্ব বিহারে এই বারমাসী বা ছয়মাসীর বর্ণনায় পশ্চিম বাংলার প্রান্তবর্তী কোন উপজাতীয় অঞ্চলের লোকসংগীতের প্রভাব কার্যকরী হইয়াছে।*

বাঙলার উত্তর-পশ্চিম সীমান্তবর্তী মালদহ জিলায় যদি আমরা গিয়া প্রবেশ করি তাহা হইলে সেখানে এক সম্পূর্ণ অভিনব প্রকৃতির লোকসংগীতের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হইবে—তাহার নাম গম্ভীরা। চৈত্র সংক্রান্তির তিনদিন পূর্ব হইতে ইহা আরম্ভ হয়, বৈশাখ মাসেরও কিছুদিন পর্যন্ত ইহা চলিতে থাকে। 'গম্ভীরা' নামটির সংগত কোনো অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার

* এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার জন্য W. G. Archer. 'Seasonal Songs of Patna District' Man in India XXIII (1942) pp. 255-7 দ্রষ্টব্য।

সঙ্গে সংস্কৃতশব্দ গাম্ভীর্যের কোনো সম্পর্ক নাই—এই সংগীতও মোটেই গম্ভীর প্রকৃতির নহে। ওড়িয়া ভাষায় ক্ষুদ্র কক্ষকে গম্ভীরা বলে। চৈতন্যদেব পুরীতে বাসকালীন কাশীমিশ্রের গৃহে যে কক্ষটিতে বাস করিতেন তাহাকে গম্ভীরা বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু এই অর্থ এখানে প্রযোজ্য নহে। বাংলাতে গামার কাঠকে সংস্কৃত করিয়া গম্ভীরা কাষ্ঠ বলা হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই অর্থও এখানে প্রয়োগ করা যাইতে পারে না। অতএব মনে হয়, ইহা মূলত একটি উপজাতীয় শব্দ। বর্তমানে ইহার সঙ্গে শিবের নামটি আসিয়া যুক্ত হইয়াছে, সেইজন্য ইহা আদ্যের গম্ভীরা নামে পরিচিত। কিন্তু মূলত শিবের সঙ্গে ইহার কোনো সম্পর্ক ছিল না, এবং এখনও নাই। ইহা প্রকৃতপক্ষে বাৎসরিক ঘটনাবলীর পর্যালোচনা মাত্র। এক সময়ে বোড়ো বলিয়া পরিচিত ইন্দোমোঙ্গলীয় বা কিরাত জাতির একটি শাখা সমস্ত উত্তর বঙ্গ অধিকার করিয়াছিল। তাহাদেরই বংশধরগণ গৌড়ে হিন্দু-বৌদ্ধ রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেই এই অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে বলিয়া অনুমিত হয়। ইন্দোমোঙ্গলীয় বা কিরাত জাতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে বিশেষ কোনো সামাজিক উৎসব উপলক্ষে ইহারা সৃষ্টিতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ববর্তী দিবসের ঘটনাবলী পর্যন্ত নৃত্যসংগীতের সহযোগে পর্যালোচনা করিয়া থাকে। আবরমিশমি-প্রমুখ আমাদের প্রান্তবর্তী অঞ্চলের উপজাতির মধ্যে এই রীতি এখনও প্রচলিত আছে। অতএব মনে হয়, এই সংস্কৃতিরই প্রভাব বশত মালদহ অঞ্চলে বহু প্রাচীনকালে এই গম্ভীরার উৎপত্তি হইয়াছিল। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইহার বিষয়বস্তুর পরিবর্তন হইলেও ইহার মধ্যে একটি অতি প্রাচীন উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ধারা প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে।

বাংলার উত্তর-পশ্চিমে ও উত্তর সীমান্ত অর্থাৎ দিনাজপুর, কুচবিহার ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে কোচ নামক উপজাতির বংশধরগণ বাস করিয়া থাকে। ইহারাও বোড়ো বলিয়া পরিচিত ইন্দোমোঙ্গলীয় উপজাতিরই একটি শাখা। বাংলার লৌকিক শৈব-সাহিত্যে এই কোচ বিশেষত কোচনী বা কোচরমণী

একটি বিশেষ স্থান লাভ করিয়াছে। শিবের এই কোচনী-সম্পর্কের কথা কেবলমাত্র যে এই অঞ্চলেরই লোকসাহিত্যে সীমাবদ্ধ আছে তাহা নহে—ইহার কথা সমস্ত বাংলাদেশের লোকসাহিত্যেই বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে, যেমন পূর্ব ময়মনসিংহের শিবের ছড়াতে শিব-বন্দনা শুনিতে পাওয়া যায়,

নম মহেশ্বর দিগম্বর ঈশান শঙ্করে।
শিব শম্ভু শূলপাণি হর দিগম্বরে॥
গিয়া কোচনী পাড়া ভাঙ্‌ ধুতুরা শিব শম্ভু খায়।
তান্‌পুরা বাজাইয়া শিবে কোচ্‌নী ভুলায়॥

বরিশালের একটি শিবের ছড়াতে পার্বতীকেও কোচ দেশের অধিবাসিনী বলা হইয়াছে, যেমন, শিব পার্বতীকে বলিতেছেন,

কুচনী নগরে আছে তোমার বাপ ভাই।
সেইখানে যাইয়া পর শঙ্খ আমার কিছু নাই॥

নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাকবি ভারতচন্দ্রও তাঁহার অন্নদামঙ্গল কাব্যে শিবের সঙ্গে কোচনীর সম্পর্কের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হরপার্বতীর মিলন বর্ণনায় পার্বতী শিবকে বলিতেছেন,

তব অঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবা।
কোচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবা॥

এই ভাবে বাংলার সর্বত্র যে শিব-গাতিকা প্রচলিত আছে তাহাতে শিবকে কোচ-নারীর প্রতি আসক্ত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার একটি প্রধান কারণ এই মনে হয় যে উত্তর বঙ্গের কোচ সমাজের মধ্য দিয়াই লৌকিক শৈব সাহিত্য বাংলা দেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কোচ জাতি শিবকে নিজের ঘরের দেবতা করিয়া লইয়া যখন নিজেদের নারী জাতির সঙ্গে তাহার একটি সম্পর্ক স্থাপন করিয়া লইয়াছে তাহার পর তাহাদের নিকট হইতেই বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের সাধারণ সমাজও শিব-সম্পর্কিত ছড়া ও গাতিকাসমূহ লাভ করিয়াছে। এই জন্যই শিবের সঙ্গে কোচ-

সম্পর্কের কথা সর্বত্র এতখানি বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। ইন্দোমোঙ্গলীয় সমাজ সর্বত্র মাতৃতান্ত্রিক (matriarchal) না হইলেও স্ত্রী-প্রধান। মূলতঃ কোচ নারীদিগের মধ্যেও হয়ত এই স্বাধীনতা ছিল এবং অন্য কোনো কোনো বিষয়ে সম্ভবতঃ তাহাদের আকর্ষণী গুণও ছিল। উত্তরবঙ্গের সংলগ্ন কামরূপের নারীদিগের সম্পর্কে একটি সুপরিচিত কিংবদন্তী এই যে তাহারা পুরুষকে ভেড়া বানাইয়া রাখে। সম্ভবত তাহাদেরই প্রতিবেশিনী নারীদিগেরও এই প্রকার কোনও গুণ ছিল, তাহা দ্বারাই তাহারা শিবকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল বলিয়া মনে করা হইত।

এইবার বাংলার পূর্ব সীমান্ত ধরিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলে প্রথমেই আমরা রংপুর জেলায় প্রবেশ করিব। রংপুরের বিশিষ্ট লোকসাহিত্য জাগ গান, ভাওয়াইয়া গান, যুগীযাত্রা ইত্যাদি। বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের লোক-সংগীতের সঙ্গে ইহাদের কিছু পার্থক্য আছে। আধ্যাত্মিক ভাব ইহাদের মধ্যে বিশেষ নাই বলিলেই চলে, ব্যক্তি-অনুভূতি ও মানবচরিত্রের মহিমা-কীর্তনই ইহাদের প্রধান উদ্দেশ্য। রংপুরে যে-শ্রেণীর সমাজে এই প্রকার গান প্রচলিত তাহা রাজবংশী বলিয়া পরিচিত— ইহাদেরই এক অংশ বর্তমানে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে। রাজবংশিগণ মূলতঃ কোন্ জাতি হইতে সম্ভূত এই বিষয়ে সকলে একমত নহেন। কেহ কেহ মনে করেন, ইহারা কোচ জাতিরই একটি শাখা, আবার কাহারও বিশ্বাস ইহারা কোলমুণ্ডা-শ্রেণিভুক্ত— দক্ষিণ দিক হইতে গিয়া উত্তরবঙ্গে বসতি স্থাপন করিয়াছে, তবে কোচ জাতির সঙ্গে তাহাদের কিছু কিছু মিশ্রণ হইয়াছে। একথা সত্য যে কোচ ও রাজবংশীর সামাজিক আচার এক নহে, রাজবংশিগণ অধিকতর হিন্দু-ভাবাপন্ন। অতএব ইহারা দুইটি স্বতন্ত্র উপজাতি হইতে উদ্ভূত হওয়া কিছুই আশ্চর্য নহে। তবে এই বিষয়ে নিশ্চিত করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই। রংপুর জেলার সাধারণ অধিবাসীদিগের মধ্যে যে লোকসংগীত প্রচলিত আছে তাহার সঙ্গে আসামের কোনো কোনো উপজাতির লোক-

সংগীতের ভাবগত সাদৃশ্য আছে। উৎসব উপলক্ষ্যে রাত্রি জাগিয়া যীর পূর্ব-পুরুষের মহিমা কীর্তন উত্তর ও উত্তর-পূর্ব আসামের উপজাতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। রাজবংশী বর্ণহিন্দু-অভিমানবশত এক দিক দিয়া যেমন বাংলার উচ্চতর সংস্কৃতি দ্বারা কতকটা প্রভাবিত হইয়াছে, আবার অন্য দিক দিয়া প্রতিবেশী উপজাতিগুলির প্রভাব স্বীকার করিয়া লইয়া এক অতি মিশ্র ও জটিল সংস্কৃতি গঠন করিয়াছে। তথাপি ইহার মধ্য হইতেও উপজাতীয় উপকরণগুলি সন্ধান করিয়া লওয়া কঠিন নহে।

লোকসাহিত্যের দিক দিয়া বাংলার উত্তর-পূর্ব সীমান্তবর্তী ময়মনসিংহ জিলা বিশেষ সমৃদ্ধ। ইহার কারণ, বাংলার কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি হইতে ইহার বিচ্ছিন্নতা ও ইহার বিচিত্র ভৌগোলিক পরিবেশ। ইহার উত্তর দিকে গারো পাহাড়। এইখানে গারো নামক এক প্রবল মাতৃতান্ত্রিক জাতির বাস। হাজং বলিয়া পরিচিত গারোজাতিরই একটি শাখা, জিলার উত্তর ভাগে কিছুদূর পর্যন্ত সমতল ভূমি অধিকার করিয়া ইহার অন্যান্য অধিবাসীর সঙ্গে অবাধ মিশ্রণ করিতেছে। তাহারা বাংলা ভাষা গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার মধ্যস্থতায় স্থানীয় অধিবাসীর সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করিতেছে। মধ্যযুগ পর্যন্ত পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলে দুইজন কোচ রাজা রাজত্ব করিতেন। একজনের রাজধানী ছিল নেত্রকোনা মহকুমায় বোকাইনগর, আর একজনের রাজধানী কিশোরগঞ্জ মহকুমার জঙ্গলবারি; সুতরাং এই জিলার উত্তর এবং পূর্বভাগ কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত উপজাতীয় শাসকের রাজ্যভুক্ত ছিল। অতএব ইহার মধ্যে যে-লোকসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা প্রধানতঃ এই উপজাতীয় সংস্কৃতি দ্বারাই প্রভাবিত হইবে ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক।

এই অঞ্চলের লোকসাহিত্যের মধ্যে গীতিকা (ballads), জারীগান-সারিগান, ঘাটুগান ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চলই প্রসিদ্ধ ময়মনসিংহগীতিকা বা পূর্ববঙ্গগীতিকার জন্মভূমি। এই গীতিগুলির মধ্যে যে সমাজ-চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা বাংলার উচ্চতর সমাজ নহে—

উচ্চতর সমাজে সেই যুগে বাল্যবিবাহই প্রথা ছিল, কিন্তু ইহাদের মধ্যে স্বাধীন প্রেমের অবকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মহুয়া-নামক গীতিকাটির নায়ক-নায়িকার মধ্যে যে সর্বত্যাগী প্রেমের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাহা পারিপার্শ্বিক সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যে অভিনব। এই অভিনবত্ব কোনো স্ত্রী-প্রধান কিংবা মাতৃতান্ত্রিক সমাজ হইতেই যে আসিয়াছে সে বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করিবার কোনো কারণ নাই। এমনই প্রায় প্রত্যেক গীতিকার মধ্যেই স্বাধীন প্রেমের মহিমাকীর্তন করা হইয়াছে—এই প্রেম-বিনিময়ের ব্যাপারে নারী সর্বত্র একটি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছে, কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া সে তাহার স্বকীয় অনুভূতিকে বিসর্জন দেয় নাই। এই ভাবটি হিন্দু কিংবা মুসলমান সমাজ নিরপেক্ষ। সেই জন্যই মনে হইতে পারে ইহা প্রতিবেশী কোনো উপজাতীয় মাতৃতান্ত্রিক কিংবা স্ত্রী-প্রধান সমাজেরই প্রভাবের ফল।

ইহার পরই জারীগানের কথা উল্লেখ করিব। জারীগান পূর্ব ময়মনসিংহের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই অঞ্চলে মুসলমান ধর্ম বিস্তার লাভ করিবার পর হইতেই মুসলমানী বিষয়বস্তু ইহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে ইতিপূর্বে ইহার বিষয়বস্তু স্বতন্ত্র ছিল। ইহাতে বর্তমানে বৃত্তাকারে সমবেত নৃত্য-সহযোগে হাসান-হোসেনের কারবালার করুণ যুদ্ধ-বৃত্তান্ত বর্ণিত হয়। মুসলমান ধর্মে নৃত্য এবং গীত দুইই নিষিদ্ধ। অতএব ইহাতে মুসলমানী বিষয় বর্ণিত হইলেও ইহা যে মুসলমান ধর্মের দান নহে তাহা বুঝিতে বেগ পাইতে হয় না। উপজাতীয় সমাজে উৎসবাদিতে বৃত্তাকারে সমবেত নৃত্যের প্রথা আসাম হইতে আরম্ভ করিয়া গুজরাট পর্যন্ত বিস্তৃত। এই নৃত্যে নারীই অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে এবং পুরুষ বাদক ও গায়কের কাজ করে। সম্ভ্রান্ত বাঙালী নারীদিগের মধ্যে এখনও কোনো কোনো অঞ্চলে এই বৃত্তাকারে সমবেত নৃত্যের প্রচলন আছে, যেমন কাছাড়ের বাঙালী নারীদিগের ধামালী নৃত্য, যশোহরের শীতলানৃত্য ও বীরভূমের ভাঁজো

নৃত্য। ইহাদের প্রত্যেকটিই যে প্রতিবেশী উপজাতীয় সংস্কৃতির প্রভাবের ফল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। এমনকি গুজরাটের সম্ভ্রান্ত মহিলাদিগের মধ্যে যে গর্বা নৃত্য প্রচলিত আছে তাহাও প্রতিবেশী ভীল সমাজের প্রভাবের ফল বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। নারীদিগের নৃত্য-বিষয়ে একমাত্র মণিপুরী ব্যতীত আসামের অন্যান্য উপজাতি অপেক্ষা উড়িষ্যা ও মধ্যভারতের কয়েকটি উপজাতি অধিকতর দক্ষ। মণিপুরের উপর একদিক দিয়া ব্রহ্মদেশ ও অপর দিক দিয়া বাংলার বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাববশতঃ তাহার সংস্কৃতি একটু স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে যে পূর্ব ময়মনসিংহের জারীনৃত্য ও তাহার সংশ্লিষ্ট সংগীত একটি বৃহত্তর উপজাতীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। নারীর পরিবর্তে ইহাতে পুরুষের অংশগ্রহণ করিবার কারণ অতি সহজেই অনুমেয়। মুসলমান সমাজে নারীর অধিকার সংকীর্ণ বলিয়া নারীর পরিবর্তে মুসলমান পুরুষই এই নৃত্যের ভার লইয়াছে, তথাপি নৃত্যকালে ব্যবহৃত তাহাদের পায়ের নূপুর ও আঁচলের মত করিয়া দোলানো কাঁধের গামছাটি হইতে বুঝিতে পারা যায় যে নৃত্যকারীরা স্ত্রীলোকেরই অভিনয় করিতেছে। আসামের আবর, মিশমী-প্রমুখ জাতি উৎসব উপলক্ষে সমবেত নৃত্যানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে পূর্বপুরুষের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কাহিনীসমূহ স্মরণ করিয়া থাকে। জারীগানে যেমন একজন গায়েন কাহিনী বর্ণনা করিয়া যায় ও অন্য সকলে চক্রাকারে নৃত্য করিয়া তাহার ধুয়া ধরে, আবর জাতির মধ্যেও গ্রামপতি হাতে একটি তরবারি লইয়া, গানের মত সুর করিয়া, পূর্বপুরুষের বীরত্ব ও আত্মত্যাগের কাহিনীসমূহ বর্ণনা করে এবং নৃত্যকারীরা ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহাতে পায়ের শব্দে তাল দিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের নৃত্যে যাহা প্রাণহীন, জারীগানে তাহা জীবন্ত হইয়া উঠে। পূর্বেই বলিয়াছি, মণিপুরী ব্যতীত আসামের উপজাতীয় নৃত্যমাত্রই নিষ্প্রাণ। আসামের ইন্দোমোঙ্গলীয় জাতি তাহাদের নৃত্যের সংস্কার আদি-অস্ত্রালজাতি হইতে অনুকরণ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। সেই জন্য আদি-অস্ত্রাল জাতির মধ্যে ইহা এখনও জীবন্ত। এককালে

আসামে আদি-অস্ত্রাল জাতির ব্যাপক প্রভাব হইয়াছিল। সেই আদি-অস্ত্রাল জাতির সূত্রেই পূর্ব বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে এই নৃত্যের প্রথা প্রবর্তিত হইয়া থাকিবে।

নৌকা বাইচের গানকে সারিগান বলে। বর্ষাকালে পূর্ব ময়মনসিংহ অঞ্চল জলে জলময় হইয়া যায়। আসামের পার্বত্য অঞ্চলের জলরাশি এইখানে আসে, তাহার পর তাহা ধীরে ধীরে মেঘনা বাহিয়া পদ্মার সঙ্গে গিয়া মেশে। বর্ষার প্রায় ৩।৪ মাস কাল এই অঞ্চলে জল প্রায় স্থির হইয়া থাকে। এই জলাভূমিকে স্থানীয় ভাষায় হাওর বলে। হাওর শব্দটি সাগরেরই অপভ্রংশ। এই হাওরের বুকে নৌকা বাইচ এই অঞ্চলের একটি বিশিষ্ট উৎসব। বাইচের সময় বৈঠার তালে তালে যে-গীত গাওয়া হয় তাহারই নাম সারিগান। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান লেখক যখন মালাক্কা দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত নিকোবরদ্বীপ ভ্রমণ করিতে যান তখন সেখানে অনুরূপ আকৃতির সুদীর্ঘ বাইচের নৌকা দেখিতে পান। উৎসবাদি উপলক্ষে সেই সমস্ত নৌকা লইয়া সমুদ্রে বাইচ খেলা হয়। বাইচের সঙ্গে সঙ্গে সংগীতও হয়। কে বলিবে, কোনো বিস্মৃত যুগে সমুদ্রোপকূলচারী এমনই এক জাতি পদ্মা-মেঘনার মোহনা বাহিয়া হয়ত এই অঞ্চলে আসিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিল। ইহার বর্তমান অধিবাসিগণ হয়ত পুরুষানুক্রমে এই সংস্কারের উত্তরাধিকারী হইয়াছে।

ঘাটুগানও বর্ষাকালের লোকসংগীত। নৃত্য ও সংগীত উভয়ই ইহার অঙ্গ। বর্তমানে একটি দীর্ঘকেশ বালক স্ত্রীলোক-বেশ পরিধান করিয়া নৃত্য করে, পুরুষ গায়কেরা গীত গাহিয়া যায়। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় পূর্বে এই নৃত্য নারীই করিত, বর্তমানে নারীর স্থান বালকে গ্রহণ করিয়াছে। এই সংগীত বাংলাদেশের এই অঞ্চল ব্যতীত আর কোথাও প্রচলিত নাই, অতএব ইহার মধ্যেও পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের অধিবাসী কোনো উপজাতির প্রভাব আছে কিনা তাহা অনুসন্ধানের যোগ্য। ইহার সংগীত অপেক্ষা নৃত্যটি আকর্ষণীয়। নৃত্যের মধ্যে কোনো যৌন-আবেদন নাই, বরং সংযম ও সৌন্দর্যই ইহার

লক্ষ্য। ঘাটু সংগীত বাংলার অন্যান্য লোকসংগীতের মতই এখন রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিষয়ক। কিন্তু পূর্বে যে তাহা একান্তই মানবিক প্রেমবিষয়ক ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

ত্রিপুরা জিলার পূর্বাঞ্চলের সঙ্গে তিপরাই নামক ইন্দোমোঙ্গলীয় জাতির এক শাখার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। তিপরাই জাতি উৎসব ও নৃত্যগীত-প্রিয়। স্বাধীন ত্রিপুরারাজ্যের মধ্যস্থতায় ইহাদের সাংস্কৃতিক প্রভাব এই অঞ্চলের বাঙালী অধিবাসীদিগের মধ্যেও বহুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। উদয়পুর বাঙালী ও তিপরাই উভয় সম্প্রদায়েরই তীর্থস্থল। ত্রিপুরারাজ ও তিপরাই সৈন্যের বীরত্বের কাহিনী লইয়া এই অঞ্চলে বাঙালী কবি কর্তৃক গাথা রচিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের শমশের গাজীর গান, লীলাবতীর পালা প্রভৃতির মধ্যে ত্রিপুরারাজ ও তাঁহার তিপরাই সৈন্যদের বীরত্বের কথা আছে। তিপরাইদিগের ব্যবহৃত বাঁশের বাঁশি সর্বত্র সুপরিচিত। এই অঞ্চলের ভাটিয়ালী গানের সুরে ইহার প্রভাব অনুমান করা যাইতে পারে।

চট্টগ্রাম জিলার লোকসাহিত্যে আরাকানবাসী মগ জাতির প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। এই মগ জাতি অধিকাংশই বর্তমানে মুসলমান ধর্মাবলম্বী। মধ্যযুগে আরাকানে বাংলাভাষার চর্চা যে অত্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। আরাকানী লোকসংগীত সেই যুগে বাংলা ভাষাতেই রচিত হইত। উপকূল-পথে ইহার সঙ্গে চট্টগ্রামের যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল বলিয়া আরাকানে রচিত বাংলা গাথা ও গীতি যেমন চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রচার লাভ করিয়াছিল তেমনই চট্টগ্রাম অঞ্চলে রচিত লোক-সাহিত্যও আরাকানে গীত হইত। চট্টগ্রামের বহু গ্রাম্য সংগীতের মধ্যেই আরাকান ও ব্রহ্মদেশের উল্লেখ পাওয়া যায়। বহু বিরহসংগীতে নায়িকা, ব্রহ্মপ্রবাসী নায়ক ব্রহ্মবাসিনী কোনো কুহকিনীর মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে ভুলিয়া আছে আশঙ্কা করিয়া করুণ সংগীত গাহিয়া থাকে।

স্বাঙ্গীকরণের মধ্যেই সংস্কৃতির সমৃদ্ধি। ইহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য

দৃষ্টান্ত মণিপুর। মণিপুর নিজস্ব সংস্কৃতির কোনো উপকরণই পরিত্যাগ করে নাই, তাহার উপর এক হাত পাতিয়া ব্রহ্মদেশের সাংস্কৃতিক উপকরণ ও আর অন্য হাত পাতিয়া বাঙালী বৈষ্ণবের সাংস্কৃতিক উপকরণ নিজের মধ্যে স্বাঙ্গীকৃত করিয়া লইয়াছে। সেই জন্য মণিপুরের অধিবাসীরা মাথা-শিকারী (head hunting) নাগা জাতির স্বজাতি হইয়াও একটি নিজস্ব উচ্চতর সংস্কৃতির অধিকারী হইয়াছে। অপর পক্ষে নাগাগণ অন্যের সব কিছুই পরিত্যাগ করিয়াছে বলিয়া নিজেদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধতর করিতে পারে নাই —এখনও তাহারা তাহাদের আদিম সংস্কৃতিকেই অনুসরণ করিতেছে।

বাঙালীর সাধনাও স্বাঙ্গীকরণেরই সাধনা। সে তাহার প্রতিবেশী উপজাতির সাংস্কৃতিক উপকরণকে পরিত্যাগ না করিয়া তাহা নিজের মধ্যে নিজের মত করিয়া গ্রহণ করিয়াছে। সেইজন্যই তাহার লোকসংস্কৃতি এত বিচিত্র ও সমৃদ্ধ।

শান্তিদেব ঘোষ

লোকসংগীত-প্রসঙ্গ

আজকের এই লোকসাহিত্যের অধিবেশনে, আমার আলোচনার বিষয় হল—লোকসংগীত। একথা আপনারা সকলেই জানেন যে, ইংরেজ-পূর্ব যুগে আজকালের মতো বইয়ের সুবিধা ছিল না। গায়ক ও কথকেরা গ্রামে ও নগরে সব রকমের কাব্য গেয়ে গেয়ে প্রচার করতেন। সুর ও কথা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে থাকত এই সব কাব্যে। তাকেই আলোচনার বিষয় করে আপনাদের সামনে উপস্থিত করছি।

লোকসংগীত কথাটি আজ অতি প্রচলিত হলেও শব্দটির ব্যবহার ইংরেজ শাসনের পূর্বে ভারতে ছিল বলে জানা যায় না। একে আমরা পেয়েছি ইংরেজদের কাছ থেকে তাদের Folk Music বা Folk Song কথাটির অনুবাদ হিসেবে। এই শব্দটির পিছনে একটি ইতিহাস আছে।

যখন থেকে ইয়োরোপে বিজ্ঞান বা যন্ত্র-যুগের প্রবল প্রভাবে মানুষের মন, চিন্তা ও সমাজ-জীবনে পরিবর্তন দেখা দিল, তখন থেকেই শুরু হল প্রাক্ যন্ত্রযুগের সভ্যতার সঙ্গে যন্ত্রযুগের সভ্যতার পার্থক্য। আগেকার সভ্যতা বা সংস্কৃতি ছিল গ্রামনির্ভর আর যন্ত্রযুগের সভ্যতা নির্ভর করল সম্পূর্ণ রূপে নগরের উপরে। ক্রমে ইয়োরোপের এতদিনকার গ্রামনির্ভর সভ্যতাকে নতুন নগর-সভ্যতা সম্পূর্ণ গ্রাস করল। নগরগুলি হয়ে উঠল এই যুগের সংস্কৃতির একমাত্র কেন্দ্র। এই পরিবর্তনের ছাপ সংগীতেও প্রকাশ পায়।

সংগীতেও যুগান্তরকারী পরিবর্তন দেখা দেয়। নগরজাত সংগীত ইয়োরোপের গ্রাম ও নগরে একই সঙ্গে ব্যাপকভাবে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করায়, গ্রামের প্রাচীনধারার সব উৎসব বন্ধ হয়ে গেল। এই রকমের এক অবস্থার মধ্যে হঠাৎ গ্রামের সংগীতের প্রতি ইয়োরোপের নগরবাসীদের প্রথম নজর পড়ে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে। তখনই প্রথম তারা বুঝতে শিখল যে সংগীতে একটা নতুন পথকে তারা অনুসরণ করে চলেছে, পুরনো পথ ত্যাগ করে। সেই চেতনাতেই দেখা দিল প্রাচীনধারার গ্রামনির্ভর সভ্যতা বা সংস্কৃতির অঙ্গ সংগীতের সংগ্রহ ও আলোচনার প্রতি ঝোঁক। কিন্তু ব্যাপকভাবে একাজে উৎসাহ দেখা দেয় উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে। এরও কারণ হল ইয়োরোপের তখনকার রোমাণ্টিক আন্দোলনে নতুন স্বাদেশিকতা বোধের আবির্ভাব। সাহিত্য ও শিল্পের মত সংগীতেও নিজের জাতির বৈশিষ্ট্যকে জানবার ও তাকে প্রকাশ করবার একটা আন্দোলন সে-দেশে তখন দেখা দেয়। সেই আন্দোলনের অংশস্বরূপ নিজদেশের প্রাচীন সংগীতের বিষয় প্রত্যেক দেশই সতর্ক হয়ে ওঠে। বড় বড় সংগীতস্রষ্টারা নিজের দেশের প্রাচীন পদ্ধতির সংগীতের কাছ-থেকে নানাভাবে উপকরণ সংগ্রহ করতে থাকেন এবং নতুন সাজে তাকে সাজাতে চেষ্টা করেন। তখন থেকে শুরু করে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ বৎসরের মধ্যেই ইয়োরোপের বহু দেশ প্রাচীন পদ্ধতির গান সংগ্রহের কাজ সম্পূর্ণ করে ফেলল।

আজ সেখানকার কোনো কোনো দেশে সংগ্রহের উপযোগী প্রাচীন পদ্ধতির সংগীত আর একটিও পাওয়া যাবে না। এইরূপ সংগ্রহের দ্বারা প্রাচীন পদ্ধতির সংগীতকে নতুন করে সমাজে স্থান করে দেওয়া তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তারা জানত, তা কোনদিনই সম্ভব নয়। তারা চেয়েছিল তাদের দেশের প্রাচীন সংগীতের পরিচয়টিকে জানতে ও তার সাহায্যে সেই কালের মানুষের প্রকৃতি ও তার সমাজকে বুঝতে। আর সৃষ্টির পথে তার কাছ থেকে প্রেরণা পেতে। ইয়োরোপে এইভাবে সংগীতে দুইটি ধারার সৃষ্টি হওয়ায় উনবিংশ

শতকের মধ্যভাগে তাদের আলাদা নামকরণ করতে হল। গ্রামের প্রাচীন গানকে বলা হল Folk Music, আর নগরসভ্যতায় যার জন্ম সেই সংগীতকে তারা বললে Art Music।

এই দুই সংগীত-পদ্ধতির পার্থক্যে ধরা পড়ল যে, গ্রামসভ্যতাজাত সংগীত কথা ও সুরকে একই সঙ্গে সমান প্রাধান্য দিয়েছে। এমন সব সুর বা রাগিণী এই পথে আবিষ্কৃত হয়েছে যার বাইরের রূপ সহজ ও সরল হলেও, সেগুলির মধ্যে আছে শ্রোতার মন আকর্ষণ করার এক অসীম ক্ষমতা। আর নগরজাত সংগীত আনল 'কর্ড', 'কাউণ্টার পয়েণ্ট' ইত্যাদির যোগে হার্মনী নামে সম্পূর্ণ নতুন এক সংগীতপদ্ধতি। এ ছাড়া এমন সব বহু বিচিত্র শব্দকে এই সংগীতে স্থান দেওয়া হল, যাকে পূর্ব যুগের সংগীতে স্থান পাবার অযোগ্য বলে মনে করা হত। আগের যুগের সংগীত ছিল প্রধানতঃ একক সংগীত। নগরজাত সংগীত হয়ে দাঁড়াল বহুজন ও বহুযন্ত্রের বিচিত্র সুর সম্মিলনের সংগীত। এযুগের ইয়োরোপীয় সংগীতের যে-কোনো আসরে গেলেই তার পরিচয় মিলবে। এই হার্মনি-সংগীতপদ্ধতিতে ইয়োরোপ আজ এতখানি অভ্যস্ত যে, প্রাচীন আদর্শের Folk Music গাইতে গিয়েও তারা আজকাল তার সংগে 'কর্ড' ব্যবহার না করে পারে না। হার্মনির আদর্শে না সাজিয়ে কোনো গানই আজ তারা শুনতে চাইবে না।

আমাদের দেশে ইংরেজপূর্ব যুগ পর্যন্ত সংস্কৃতির যাবতীয় ধারা যুক্ত ছিল গ্রামের সঙ্গে। ইংরেজযুগে গ্রামকেন্দ্রিক এই সংস্কৃতি যখন গ্রামকে ত্যাগ করে শহরমুখী হল, তখন প্রাণবান্ গ্রাম-নির্ভর সংস্কৃতির সব উৎসগুলি শুকিয়ে আসতে লাগল। ইংরেজযুগের এইসব শহরগুলি বিদেশীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হলেও বিলেতের নগরকেন্দ্রিক যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে একেবারেই সমানভাবে তাল রেখে চলতে পারেনি। তাই সেদেশের মত শহরকেন্দ্রিক কোনো প্রাণবান্ সভ্যতা এদেশে গড়ে উঠল না। এদেশের নগরগুলি বিদেশের ব্যর্থ অনুকরণের দ্বারা এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করল যার

ফলে নগরবাসী আমরা গ্রামকে অবহেলা করতে শিখলাম। গ্রামের সঙ্গে শহরের বড় রকমের একটা ব্যবধান গড়ে উঠল। এরই একটি বড় নমুনা হল এযুগের শিক্ষাব্যবস্থা। শহরে ইয়োরোপের অনুকরণে যে শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে উঠল তার সঙ্গে পূর্ব যুগের গ্রামকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থার কোনো যোগ রইল না। অথচ ভারতের প্রত্যেক চিন্তাশীল মনীষী একবাক্যে স্বীকার করেছেন যে, ইংরেজযুগের এই শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের দেশের পক্ষে ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষা ইত্যাদি আরো কতকগুলি ক্ষেত্রে ভারতীয় নগরবাসীরা অনুকরণের দ্বারা পরিবর্তনের চেষ্টা করে থাকলেও, সংগীতের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে, কেন জানি না, সে রকমের একটা চেষ্টা কোনোদিনই দেখা দেয়নি। একমাত্র সংগীতেই নগরবাসী আমরা প্রাচীন প্রথাকেই হুবহু বজায় রাখলাম। সেই প্রাচীন প্রথা নিয়েও একটু আলোচনা করা দরকার।

আমাদের দেশে প্রাচীনকালে সংগীতকে মূল দুটো ভাগে ভাগ করে তার একটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'মার্গ' যার নমুনা আজকাল আমরা কিছুটা পাই উচ্চাঙ্গের হিন্দী গান ও কর্ণাটী সংগীতের মাধ্যমে। অন্যটির নাম 'দেশী,' যার অর্থ ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, অনুরাগের সঙ্গে ও স্বেচ্ছায় স্ত্রীলোক, বালক, রাখাল ও রাজা সকলে যে-গান নিজ নিজ দেশে ও ভাষায় গায়, তাই।

রাগিণী, কথা ও ছন্দে মেলা যে কণ্ঠসংগীত আমরা শুনি, তাকে বলি গান। এভাবে দেখলে দেখা যাবে যে, উচ্চাঙ্গের হিন্দী গান থেকে শুরু করে, যাকে আমরা বলছি 'লোকসংগীত', তার সবই এক আদর্শে রচিত। কিন্তু এদের মধ্যে আসল পার্থক্য দেখা দেয় তাদের গায়কী নিয়ে। যে-গান সুর বা রাগিণী, তাল বা ছন্দকে প্রাধান্য দিয়ে কথাকে তার নীচে স্থান দেয়, সেই দলের গানের মধ্যে পড়ে উচ্চাঙ্গের হিন্দী গান যা আমাদের দেশের ওস্তাদের মুখে আমরা সব সময়েই শুনতে পাই। এইসব গান রাগিণী ও তালের ঐশ্বর্যে ও বৈচিত্র্যে ভরপুর। আলাপ তান বিস্তার ইত্যাদির

নানাপ্রকার অলংকারপ্রাচুর্যই এর বৈশিষ্ট্য। এই গানের মূল উদ্দেশ্য হল সুর বা রাগিণীর সাহায্যে অহেতুক আনন্দের সাধনা।

'দেশী' পদ্ধতির সংগীত হল কথা সুর ও ছন্দ বা তালের জৈব মিলনের যে পূর্ণরূপ আমরা দেখি, তাই। উচ্চাঙ্গ হিন্দী গানের গীত-কীর্তিটিকে বাদ দিলে যা দাঁড়ায় এ হল গানের সেই আদিরূপ। আসলে এ গানের কথাই হল মূল, রাগিণী ও ছন্দ কথার সংগে মিশে কথার ভাবকে আরো প্রাণবান করে তোলে মাত্র। এর গীতপদ্ধতি প্রথম দলের চেয়ে অনেক সহজ ও সরল। মার্গ সংগীত বলল পাঁচ সুরের কমে গাইবার যোগ্য কোনো রাগিণী হতে পারে না। এদিকে দেশী সংগীতে দু-সুর, তিন-সুর ও চার-সুরের গানও আমরা পাই। ভাবের দিক থেকে মার্গ সংগীত ভক্তি ও প্রেমকেই প্রাধান্য দিল বিশেষ করে. কিন্তু দেশী সংগীতে ভক্তি ও প্রেম ছাড়া আরো নানা প্রকার ভাবের আমদানি হয়েছে। বাংলার দেশী সংগীতে বিষয়বৈচিত্র্য আরো বেড়েছে গত ইংরেজযুগে।

এই দুই পদ্ধতির গানই আমাদের দেশে প্রাচীন কালে গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতা থেকে উদ্ভূত, এবং এখনো একই আদর্শে, নগরে ও গ্রামে সমান প্রাধান্যে বিরাজমান। এখনো আমাদের সংগীত প্রকৃতপক্ষে এই মার্গ ও দেশী সংগীতের আদর্শেই পরিচালিত। সুতরাং ইয়োরোপে যে কারণে Folk Music ও Art Music কথার উদ্ভব হয়েছে, আমাদের দেশের সংগীতে সেরকমের জোরালো কারণ আজও ঘটেনি। আজ আমরা 'লোক-সংগীত' বলতে বুঝি যে, যারা ইংরেজি শিক্ষায় অশিক্ষিত এবং শহরবাসী নয়, এমনসব গ্রামবাসীদের রচিত গান। অথচ গঠনপদ্ধতিতে উভয়ে আজ এক হলেও শহরবাসীদের গানকে লোকসংগীত বলতে সাহস করব না। তাকে বলতে হবে 'আধুনিক গান' 'রাগপ্রধান সংগীত,' 'ভাবপ্রধান সংগীত' বা 'প্রগতিবাদী সংগীত' ইত্যাদি। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে 'লোকসংগীত' কথাটা ইয়োরোপের কাছ থেকে পেয়েও আমরা তাদের নির্দেশিত অর্থে তাকে

ব্যবহার করিনি। ইয়োরোপের লোকসংগীত ছিল একলার বা একই গান সকলে মিলে একভাবে গাইবার-গান। আমাদের দেশের সব সংগীত একলা গাইবার আদর্শ ধরেই চলেছে। ইয়োরোপের মত বিচিত্র স্বরজালে সাজানো এ গান নয়। আমাদের দেশে ইয়োরোপের Folk Music কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ যদি কিছু রচনা করতেই হয় তবে 'দেশী' কথাটাই হল তার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত; আর Art Music শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ হল 'মার্গসংগীত'।

মোটকথা আমার বলবার বিষয় হল এই যে, সংগীতে আমরা এখনো গ্রাম-কেন্দ্রিক প্রাচীন সংস্কৃতির বাহক। 'লোকসংগীত' কথাটির পরিবর্তে 'দেশী সংগীত' কথাটাই আমাদের যাবতীয় প্রাদেশিক ভাষার সংগীতের পক্ষে উপযুক্ত বলে মনে করি, দু-একটি পদ্ধতি ছাড়া। উচ্চাঙ্গের কীর্তনসংগীত ছাড়া বাঙলা গানমাত্রই এই দেশী সংগীতের আদর্শে আজও রচিত হচ্ছে। তবে ইংরেজযুগের নগরশিক্ষায় শিক্ষিত কবি ও রচয়িতাদের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার হয়েছে বলে তাদের রচিত গানে ভাষা ও ভাবের প্রসার দেখা গেছে অনেক সময়। কিন্তু গানরচনার পদ্ধতিতে সকলেই এক পথের পথিক।

সব শেষে আমি গ্রামের শিক্ষায় শিক্ষিত একভাবের কবিদের রচিত কয়েকটি গান শোনাব যার প্রত্যেকটিরই সুর বা রাগিণী স্বতন্ত্র। ভাবের দিক থেকে গানক'টি এক ধরনের হলেও এর মূল্য আছে। এই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি গানও গেয়ে শোনাচ্ছি। তাতে বোঝা যাবে উভয়ের মধ্যে একতা কোথায়। সব ক'টিই সাত সুরের গান। উচ্চাঙ্গ সংগীতের রাগরাগিণীর মত সুরগুলির নিজস্ব একটি রস আছে। তবে এক আদর্শে রচিত হলেও ক্ষমতার তারতম্যে রবীন্দ্রনাথের রচনা একটি বিশেষ স্থান গ্রহণ করেছে।

গুমানী দেওয়ান

কবিগান

লোকসাহিত্যে কবিগানের বিশিষ্ট স্থান অবিসংবাদিত। আমার বিশ্বাস উচ্চাঙ্গের কবিত্ব ও কবিগান একই-জাতীয় সম্পদ। অবশ্য এক দুগ্ধ হতেই সৃষ্ট মাখন ও ঘোল। আবার একই আকাশ থেকে ঝরে গঙ্গা ও ডোবার জল। কোনো কোনো ডোবা অবশ্য সুযোগসুবিধা পেয়ে যে গঙ্গার জলেও পরিণত হতে পারে তারও দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। দুধের সারাংশ মাখন নাম পায়,—পড়ে থাকে ঘোল। তেমনি দেশের শীর্ষস্থানীয় কবিকুল মহৎ ভাষা ভাব ও মিল কুড়িয়ে নিয়ে উচ্চাঙ্গের কাব্য দান করেন; আর অবশিষ্ট অসার পদার্থ থাকে কবিয়ালদের জন্য। এই পরিত্যক্ত অনাদরের বস্তুগুলিই তাঁরা খুঁজে নিয়ে বিলিয়ে দেন অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীতে পল্লীতে।

পৃথিবীর আদিকাল থেকেই কবি-জাতির সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির ধারা অব্যাহত রাখার জন্যই যুগ যুগ ধরে তাঁর বাণীর বাহক নবী বা অবতারেরা এসেছেন বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করতে। এই অবতারেরা সমাজকে দিয়েছেন নূতন বিধান, নূতন প্রেরণা। এই সব তত্ত্ববস্তু সৌন্দর্যের রসে অভিষিক্ত করে যাঁরা দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রকে নিঃস্বার্থভাবে দান করেছেন তাঁরাই কবি, লেখক বা সাহিত্যিক। পৃথিবীর সব দেশেই কবিজাতি চিরকালই ছিল। ক্রমে এদের পরস্পরের মধ্যে মানব-মুক্তির বিভিন্ন মত গড়ে উঠতে লাগল। মতের পার্থক্যের ফলে কবিদের মধ্যে সহযোগিতার

পরিবর্তে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হল। প্রতিযোগিতার ভাব প্রাচীন ভারতবর্ষে যথেষ্টই দেখা যায়। চার্বাক, কপিল, মনু প্রভৃতি দার্শনিক কবিরা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কালে কবিরা রাজা-রাজড়ার দরবারে অবতীর্ণ হলেন মুক্তির পথে সমাজ, রাষ্ট্র ও মানবকে এগিয়ে নিয়ে যেতে। কিন্তু এঁদের মধ্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা তীব্রভাবেই দেখা যেত, তাই প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হল কবিতার ক্ষেত্রেও। তখন এই সব কবিতা রচিত হত সংস্কৃত ভাষায়। সেকালে রাজা বিক্রমাদিত্যের সভায় ও একালে বর্ধমানের রাজবাড়িতে সে-সব সংস্কৃত কাব্য-প্রতিযোগিতা বিশেষ সমাদর লাভ করে। এর মধ্যে যে আনন্দ দেবার শক্তি ছিল সেটির বিস্তার হতে লাগল। ক্রমে সাধারণ লোকের মধ্যেও কথায় কথায় যে কোনো ভাষায় এই প্রতিযোগিতা চলল। এমন কি মেয়ে-মহলেও এই ধরনের কবিতা বলার চল হল, যেমন—'মেয়ের মা কাঁদে, আর টাকার পুঁটুলি বাঁধে'।

ইসলামী সংস্কৃতির প্রথম আবির্ভাবের তীব্র আঘাতে প্রথমতঃ সনাতন হিন্দু সংস্কৃতি মুহ্যমান হয়ে পড়ল এবং দুর্বল স্বাভিমান-বোধকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য হিন্দুসমাজ প্রগতিবিরোধী হয়ে ক্রমে কচ্ছপাকৃতি ধারণ করল। কিন্তু এর ফলে সমাজের যে ক্ষয়ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী, তাকে রোধ করার জন্য ও সনাতন সংস্কৃতিকে উজ্জীবিত রাখার উদ্দেশ্যে দেখা দিলেন একদল প্রচারক। এঁরা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, ধর্মতত্ত্ব ঘেঁটে নানা উৎসাহোদ্দীপক তত্ত্বের সন্ধান করলেন। সেই সব তত্ত্ব তাঁরা প্রচার করতে লাগলেন ভাগবত-পাঠ, কথকতা, রামলীলার গান ইত্যাদির মাধ্যমে। গ্রাম্য কবিরা রামচরিত, কৃষ্ণচরিত, কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ ও তার উদ্দেশ্য, বৃন্দাবন-লীলামৃত ইত্যাদি বাংলার হিন্দু সমাজের দ্বারে দ্বারে গেয়ে ফিরতে লাগলেন। বাংলা ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে এঁরাই কবিগান গায়ক বা কবিয়াল আখ্যা পেয়ে আসছেন। তখনও এঁদের কাব্যে স্বাধীন মনের স্ফূর্তি দেখেছি। এবং দেশে তার সমাদর করবার মতো জনমতেরও অভাব হয় নি। সেকালেরই সৃষ্টি

প্রণম্য মহাজন দাশরথি রায়ের পাঁচালি। কিন্তু মানসিক পরাধীনতা স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার এই নিজস্ব অমূল্য সম্পদ ক্রমে অনাদৃত হয়ে লোপ পেতে লাগল কিংবা অপভ্রষ্ট ও বিকৃত হতে লাগল। কবিগানের মধ্যে অশ্লীলতা প্রকাশ পেল। এণ্টনী ফিরিঙ্গী ও ভোলা ময়রা পর্যন্ত কবিগান যে আকর্ষণ ক্ষমতা রক্ষা করেছিল তাদের অব্যবহিত পরেই তা লোপ পায়।

আমি যখন ১৩২৯ সালে এই কবিগান আরম্ভ করি তখন কবিগানের মান অত্যন্ত নীচে নেমে গেছে। তখন কতকগুলি নিরক্ষর হাড়ী মুচি প্রভৃতির হাতে পড়ে মাদকদ্রব্যের সংমিশ্রণে, গ্রামের বাহিরে শিমুলতলার মাঠে এর আশ্রয়স্থান নিরূপিত হয়েছে। আমি বাল্যকাল থেকেই গানের খুব ভক্ত ছিলাম। পরিবেশে উচ্চতর রুচির সংগীত থাকলে হয়তো আমি তাই গ্রহণ করতাম। কিন্তু তখন আমাদের পাড়ায় পাড়ায় ছিল কবি-গানের দল। আমি সেখানেই ভিড়ে গেলাম। এই সব গানের বিষয়বস্তু অধিকাংশই হিন্দুধর্মগ্রন্থ থেকে আহরণ করা তাই আমি রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ ইত্যাদি মূল্যবান গ্রন্থ পাঠ করতে লাগলাম। তারপর সেগুলিই নিজের রচনায় এনে নিজেই কবিগান গাওয়া আরম্ভ করলাম। সেই অবধি কবিগানকে পরিচ্ছন্নতর করবার এবং তাতে নূতনত্ব আমদানি করবার আমার তীব্র সাধ ছিল। সমাজের বর্তমান প্রয়োজনের দ্বারা কবিগানের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করার ইচ্ছা হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই এই অঞ্চলের কবিগানের দলগুলি একে একে ভেঙে পড়তে লাগল। কয়েকটা নামেমাত্র দাঁড়িয়ে রইল।

তখন ধর্মতত্ত্ব আলোচনার গণ্ডী থেকে কবিগানকে আমি বৃহত্তর জীবনের মাঝখানে এনে দাঁড় করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। ফলে ইংরাজ শাসনের সর্বব্যাপী দমনক্রিয়া ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের উদ্দীপনা আমার কবিগানকেও উৎসাহ দিল। আমি জীবনের সঙ্গে সংগতি স্থাপনের চেষ্টা করলাম যথাসাধ্য। পল্লীসাহিত্যের এই অমূল্য সম্পদটিকে রক্ষা করার

জন্য ১৩৫৭ সালে আমি একটি 'পশ্চিমবঙ্গ চারণ-কবি সমিতি' গঠন করেছি। নানা অভাব অসুবিধার দরুন এটি এখনও যথেষ্ট প্রসারলাভ করেনি। এই সমিতির উদ্দেশ্য হল যাতে দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের কাজে গ্রাম্য কবিরা লাগতে পারেন এবং গ্রামসমাজে উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর সঞ্চার করতে পারেন।

আমার শেষ প্রার্থনা এই যে এখানে সমাগত সাহিত্যরথীগণ যেন বাউল গান, জারীগান, মনসা গান, সত্যপীরের পালা প্রভৃতির পুনরুজ্জীবনকল্পে আমার নবসৃষ্ট পশ্চিমবঙ্গ চারণ-কবি সমিতিকে সুদৃষ্টিতে দেখেন।

ভাদু ও পটের গান

বীণা দে

বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, সিংভূম, এবং বিশেষ করে বীরভূম জেলায় ভাদুর গান ও পটের গান লোকসাহিত্যে একটি বিশেষ ধারা বজায় রেখেছে।

ভাদুর মূর্তি ও গানে পাই আমরা সমসাময়িক সমাজের, দেশের ও পরিবেশের একটা ছবি। পটের চিত্র ও গান রচিত হয় মানুষের মনকে পাপের ভয় ও ধর্মের জয় দেখিয়ে অসৎ কাজ থেকে বিরত করে সৎ কাজে নিরত করার জন্য।

ভাদু পুজো হয় ভাদ্রমাসে। পয়লা ভাদ্র থেকে শুরু, তিরিশে ভাদ্র শেষ। মাটির কুমারীমূর্তি। গ্রামের ডোম, বাউরী, অন্ত্যজজাতীয় যারা—তারাই গড়ে। সারাদিনের কাজের শেষে কলাই মুড়ীর শীতল সাজিয়ে পুজো করে—নৃত্য সহযোগে কাঁসি বাজিয়ে গান গায়।

তারপর ভাদু মাথায় করে দল বেঁধে বাড়ী বাড়ী যায় ও নাচ গান করে পুজো তুলতে। ভাদুর জন্যে প্রতিবছর নতুন গান বাঁধা হয়। গানের রচয়িতা ঐ নিরক্ষর হরিজনরাই। যা দেখে, যা শোনে, সুখ দুঃখ যা ভোগ করে, মনের যা কামনা, তাই ভাদুর গানের বিষয়বস্তু। তাই দিয়েই তাদের ভাদুর পুজো হয়।

আগে ভাদুর গান রচনা করত মেয়েরা। মেয়েরাই নেচে গেয়ে পুজো করত। এখন দেখছি পুরুষে গান রচনা করে, একটি ছেলে মেয়ের মত সাজপোশাক করে নাচে, আর পুরুষেই গান করে।

বছরের পর বছর, ঘটনাধারার সঙ্গে সঙ্গে ভাদুর গানের ধরনও কেমন

বদল হয়েছে, দু'চারটি তারই নমুনা দিচ্ছি। বেশী দূরের নয়। এই শান্তি-নিকেতনের পাশের গ্রাম ভুবনডাঙ্গার ভাদুগানেরই পরিচয়।

প্রায় কুড়িবছর আগের গান হচ্ছে—

ভাদু লো কল্‌কলানি মাটির লো সরা
ভাদুর গলায় দেব আমরা
পঞ্চফুলের মালা।
বন্নচাঁপার ফুলে
মালা গেঁথে দাও গো ভাদুর গলে।
কাশীপুরের মহারাজা
ও ভাই সন্‌জেবেলা
শীতল দিত ফেণীবাতাসা

...

কাশীপুরের রাজার বিটী গো
তুমি বাগদীঘরে কী করো ?
কলাই মুড়ী ত্যাল সাঁপুরে
ওগো, তাই দিয়ে ভাদু শীতল করে
ও ভাদু কুঁড়োজালি কাঁখে লয়ে
সুখ-সায়রে মাছ ধরো ?

আমার ভাদুর বিয়ে দেব গো
ইষ্টিশানের বাবুকে
যেতে আসতে ভাল হবে
চাপ্‌ব কলের গাড়ীতে
আমার ভাদু শিশুছেল্যে গো
লালবাজারে শ্বশুরঘর

হাতে দিব ত্যালের বাটী
মুখে দিব দুধের সর।
...
আমার ভাদু দখিন্ যাবে গো
কয়লা পাথর কাটাতে
আরে অত ক্যানে দেরী হ'ল
অজয়ে বান পড়্যেছে।
আমার ভাদু দখিন যাবে গো
খুঁটে বাঁধা পানসিকে
আমার লেগে এনো ভাদু
নতুন চাদর নাল দেঁকে।
আমার ভাদু দখিন যাবে গো
খুঁটে বাঁধা তিন টাকা
আমার লেগে এনো ভাদু
নতুন কালো পিনকাঁটা।
আমার ভাদু দখিন যাবে গো
খুঁটে বাঁধা চারটাকা
আমার লেগে এনো ভাদু
নতুন চাঁদির কানপাশা।
...
আমার বাড়ীর নামোয় নারকেল গাছটি-গো
ঝারি ঝারি জল দিব
একটি নারকেল খুইলে পরে
চৌকিদারে ডাক দিব।

এর বারোবছর পরের গান, অর্থাৎ ১৯৪৫ সালের গান একেবারে আলাদা ধরনের। কাঁসর বাজনার সঙ্গে প্রথমেই কানে এল ধুয়ো ধরেছে—

চিনি আর কেরাচিনি
কণ্টোলে নুনের আমদানী! ...

বাড়ীর রোয়াকে মাথা ঠেকিয়ে ভাদুকে নামিয়ে রেখেই হাত নেড়ে গান ধরে দিল—

পোরো না পোরো না ভাদু কাপড় পোরো না—
কণ্টোলে ভাদু রে কাপড় মেলে না।
বড়নোকের হুকুম কড়া
ও ভাদু কাপড় দেয় জোড়া জোড়া
আমরা গরীবনোকে কেঁদে মলোম
কী করব বল আমরা।
বলি কংগেসে ঐ বাবুভেয়ে গো
চর্‌কাতে হাত দিয়েচে
আর ইংরেজের ঐ বুদ্ধি ভারী
রেশনকাডও করেছে।
ফাস্‌কেলাসের বাবু তিনি গো
আমরা বড় নাম শুনি
আরে ছাপে ছাপে ছুঁড়ে দিলে
ছিটের কাপড় আমদানী।
বলি ইংরেজে আর জাপানীতে গো
নেগেছে টানাটানি
আর উড়োন্‌জাহাজ উড়ে বেড়ায়
বোমা পড়ে আপুনি।

আহা কিছুদিন আগে ভাদু গো
শুন্যেছিলাম আসামে
আরে বোমা পড়ে নোক মর‍্যেছে
নোক মর‍্যেছে বর্মাতে।
ওগো হিটিং পিটিং কত মিটিং গো
দেখল্যাম ভাদুর চালাতে
রেঙ্গুনে নোক কেঁদ্যে বলে
মল্যাম গায়ের জ্বালাতে।
বলি ডাঙ্গার মাঝে পেভাত বাবুগো
ইলিফে চাল দিয়েছে
কাপড়ের নাম শুনে বাবু
চোরের উপর বসেছে।
বলি ভুবনডাঙ্গার ভুবন হাজরা গো
বেড়াইছে দ্বারে দ্বারে
আরে ভাদু যদি করে কৃপা
রাখব সোনার মন্দিরে।
বলি বাবুমাশায় বাবুমাশায় গো
আপনার বড় নাম শুনি
খুশীমনে করবেন বিদায় গো
দুধ খাবে ভাদুমনি।

এর পরের বছর, ১৯৪৬ সালের ৩১শে আগস্ট ভাদুর গান-
কংগেসের আইন এলো না
আমার ভাদু রয় দাঁড়িয়ে।

জয় মহাত্মা গান্ধী বলে
দুনিয়াকে দেয় কাঁপিয়ে।
দুনিয়াকে দেয় কাঁপিয়ে
কাঁপিয়ে দিয়ে খাটে জেল।
...
ভাদু ইতর ভদ্র যত ছিলো
ভোট দিতে সব চলে গেল
ভোট দিতে সব চলে গেল
হেরিকেনের ভিতরে।
দাস মুচীরামদাসে বলে
ভোট লেব গো দাঁড়িয়ে পাশে
মেটোকলসীর ভিতরে।
ইংরেজেরো আইন কড়া
জিনিষ দিচ্ছে নিক্তির ধরা
কন্‌টরোলের দোকানে।
ইংরেজে আর এমেরিকা
তাদেরই তো আছে একা
জোর করে ও ভাই জোর করে লোক চালান দিল আসামে।

কলকাতাতে বন্ধ হচ্ছে
শান্তিকেতন কেঁপ্যে যেছো
ধোয়া ধরে না প্রাণে।
ও ভাদু কারো গেল হাত পা কাটা
মায়ের গেল স্তনের বোঁটা
দুগ্ধ পেলাম না।

মায়ের ছেলে কাটা গেলে
মায়ের প্রাণ কী ধোষ্য ধরে
দু'নয়নে বয় বারি।
ভাদু কেউ কাটিছে লাঠি ছড়ি
কেউ ভাবিছে গর্ত খুঁড়ি
মাটীর ভিতর লুকাব।
শুনল্যাম পুব্বপল্লীর নোকের মুখে
আছি আমরা মনের দুখে
সুখেতে ঘুম হচ্যে না।
চেরো ভাদ্দর বুধবার রেত্যে
খিল কপাট সব দিল এঁটে।
ডাকলে সাড়া দিচ্ছে না।
পেভাত বাবু ভাবছে মনে
বলে শান্ত হওরে ভাই ক'জনে
লোক তো প্রাণে বাঁচে না।
সাধুরাম সদাই বলে
পড়ে ভাদুর পদতলে
আমরা ভেবে হই সারা
ভাদু কর করুণা॥

এর পরে ১৯৪৯ সালের ভাদুগানের নমুনা এইরকম—

ও ভাদু বোলপুর এক ছোটো সহর জানে সকলে
কুড়িটা ধানের মিল চল্‌ছে বাজারে।
বোলপুরের কাছাকাছি ভুবনডাঙ্গা গ্রাম আছে,
ঐ গাঁয়েতে পাওর হাউসে ইলেক্‌টিরী কল আছে।

ঐ কলেতে বিশ্বভারতী আলা দেবে বোলপুরে
বীরেনবাবুর টকীহাউস তাও চলিবে আলাতে
ভুবনডাঙা বিশ্বভারতী মধ্যিখানে বাঁধ আছে
ঐ বাঁধেতে কল বসিয়ে জল দেবে ভাদু বাজারে।
বিশ্বভারতীর চিনিকেতন ঐখানে তাঁতকল আছে
ছাত্র ছাত্রীকে কাপড়বোনা ঐখানেতে শিখাঁইছে।
বোলপুরেতে মিউসিপালিটির আইনজারী হয়েঁছে
রাস্তাঘাট সব তোয়ের হ'ল, টেরামগাড়ী চলবে রে।
বিশ্বভারতীর বিশ্বকবি গুরুদেব তাঁর নাম হে
উপাসনার ঘরখানি কাঁচ দিয়ে ভাদু তৈরী যে। ইত্যাদি—

এর পরেই গত বছরের (১৯৫২ সালের) গান শুনুন। মনে রাখা প্রয়োজন এই গান রচনার অব্যবহিত পূর্বেই বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়রূপে স্বীকৃত হয়।

ভাদু শান্তিনিকেতন
বেড়াতে যাবা তো চল শান্তিনিকেতন।
ইনিভারসিটি হল ভাদু মনের মতন।

ভাদু 	ইনিভারসিটি তারে ঘেরা
দরোয়ানেরা দেয় পোহরা
পুলিস যত আছে খাড়া
কে কোন ধারে পেরিং যায়।
বিশ্বভারতীর বিশ্বকবি
নানারঙের আঁকেন ছবি
গুরুদেবের মোহর ছবি
দেশে দেশে ছাপা রয়।

এই দেখ ভাই বিনয়ভবন
হঁয়েছে ভাই জীবের জীবন
আবার বন্ধ হ'ল কিসের কারণ
সন্দ ছিল মিটিংএ।
গবরমেণ্টে মিটিং করো
তিনশো সোল্ল দিলে ছেড়্যে
এই বারেতে লিল্যে ঘিরে
ঐ বিনয়ের ভবন।

ঐ দেখ ভাই জলের টেঙ্কে
মাটির তলায় পাইপ খানট্যে
আহা মাটির তলায় পাইপ খানট্যে
বাঙ্কেতে কল বসাঁইছে।
ভুবনডাঙ্গায় মিশিন বসে
শান্তিকেতন বেড়ায় হেসে
তারে তারে পাওয়ার এসে
ঘরে ঘরে হয় আলা।
রাজসুয়ো রাজার যজ্ঞ
দাদাবাবু তারই পক্ষ
ও ভাদু দাদাবাবু তারই পক্ষ
মেলায় যজ্ঞ করেছিলো।

ইত্যাদি।

সময়ের স্বল্পতা হেতু আর বাড়ালাম না।

লোকসাহিত্যের ত্রিধারা

পঞ্চানন মণ্ডল

পল্লীকবির সম্পূর্ণ স্বতঃস্ফূর্ত রচনাকেই আমরা লোকসাহিত্য বলিয়া বুঝি। তবে গ্রাম্য সব রচনাই যে খাঁটী সোনা একথা মনে করিবার কোনও হেতু নাই। ছাই উড়াইয়া যে সকল শাশ্বত অমূল্য রত্ন আমাদের হাতে আসিয়াছে তাহারই কয়েকটির কথা লইয়া আজিকার কথনের কলেবর। লোকসাহিত্যের পদ্যাংশকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম—ঐতিহাসিক গাথা, দ্বিতীয়—গান ও কবিতা, তৃতীয়—মেয়েলী ছড়া প্রবাদ প্রবচন হেঁয়ালী রূপকথা ও বাংলা মন্ত্রাদি।

ঐতিহাসিক গাথা॥ এই পর্যায়ে নাম করিতে হয় পৌরাণিক অনুকরণে গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র-পুরাণ', রাইকৃষ্ণ দাসের লেখা বীরভূমের সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া, অনুপচন্দ্র দত্তের লেখা বর্ধমানের জাল প্রতাপচাঁদের কাহিনী-মূলক 'প্রতাপচন্দ্র-লীলারস-সঙ্গীত', দিনাজপুর অঞ্চলের পুঁথি অবলম্বনে নলিনীকান্ত ভট্টশালী-সম্পাদিত দেওয়ান মাহুল্লা মণ্ডলের 'কান্তনামা', কোচবিহারের মহারাণী বৃন্দেশ্বরী-বিরচিত 'বেহারোদন্ত', ত্রিপুরার মহারাজ কৃষ্ণকিশোর মাণিক্যের কর্মচারী উজীর দুর্গামণি ঠাকুরের 'বাঙ্গলা রাজমালা', হরিমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত 'জীবনচরিত্র' ইত্যাদি।

বিবিধ ঐতিহাসিক ঘটনা পল্লীকবিদের হাতে ছোটখাট গাথা কবিতায় ও ছড়ায় রূপ পাইয়াছিল। যেমন, রঙ্গপুরের বর্ধনকুঠীর নয়আনির জমিদার-

সীতারাম রায়ের ব্যাপার লইয়া উত্তর বঙ্গের কবি কৃষ্ণহরি দাসের 'নয়-আনার কবির পাঁচালী'। বর্তমান গণতন্ত্রের যুগে কবিতাটির বিশেষ মূল্য আছে। উত্তর বঙ্গের কবি রামপ্রসাদ মৈত্রের রচিত ইংরাজলীলা-কাহিনীমূলক ঐতিহাসিক ছড়া মুদ্রিত হইয়াছে। নমুনা :

শুন সভে এক মজা বাঙ্গলার যতেক প্রজা
ছিল সুবেদারীতে প্রধান
ইতিমধ্যে কোন ধাতা সৃষ্টি কৈল কৈলকাতা
সাহেবরূপে দেবতা অধিষ্ঠান।
শিরে টুপি মুজা পায় হাতে বেত কুর্তি গায়
একবর্ণ দেখ সভাকার
বুঝিলাম অনুভবে অবতার দেবতা সভে
ভূতলে করিলা অধিকার।

মদনমোহন, রাধামোহনের নামাঙ্কিত 'রাস্তার কবিতা' পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে চৈতন্য সিংহের সঙ্গে হেষ্টিংসের যুদ্ধ এবং চণ্ডালগড় হইতে শালিখা পর্যন্ত রাস্তা তৈয়ারীর বিবরণ আছে।

উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত বিবিধ ছড়ার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বগুড়া জেলার দ্বিজ গৌরীকান্তের মহাস্থান স্নানের বা পৌষ নারায়ণী স্নানের ছড়া, অজ্ঞাতনামা লেখকের 'ব্রহ্মপুত্র মাহাত্ম্য কবিতা', ব্যাঘ্রদেবতা সোনা রায়ের গান।

পূর্ববঙ্গে পাওয়া গিয়াছে, শ্রীযুক্ত রাজমোহন নাথ-সম্পাদিত 'সোনাধনের গীত', ভূমিকম্পের ছড়া, বাত্যাবর্ত বিবরণ, চৌধুরীর লড়াই ইত্যাদি।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত প্রাচীনতম গাথা মৎসংগৃহীত সরূফের 'দামিনী চরিত্র'। ছোটখাট রচনার মধ্যে অধুনা আবিষ্কৃত দুই একটির উল্লেখ করিব। এইখানে বলিয়া রাখা ভালো, বিশ্বভারতী বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রায় ছয় হাজার বাংলা পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহার প্রথম পাঁচশত পুঁথির মধ্যে অজ্ঞাত অপ্রকাশিত ও সংকলিত পুঁথিসমূহের পরিচয় 'পুঁথি-পরিচয়

প্রথম খণ্ডে' সন ১৩৫৮ সালের আষাঢ় মাসে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমাদের উদ্ধৃত বেশীর ভাগ উদাহরণই 'পুঁথি-পরিচয়' হইতে সংগৃহীত। ইহাতে গঙ্গাস্নান-যাত্রার একটি ছড়া এইরূপ :

শোন সবে এক ভাবে করি নিবেদন পূর্ণিমাতে গঙ্গাস্নানে করিলাম গমন।
আদিত্যপুরেতে জলপান তিলুটেতে স্নান, বরাগ্রামে দুলাল মুখুজ্যা বড় ভাগ্যবান।
তার ঘরে সনলম মহাভারতের গান ... ...
গান শুনে দুই জনে থাকিল সেই রাতি প্রভাতে উঠিঞা মোরা করিলাম গমন।
সাওতাকে পিছু করি ভাবি মনে মনে কে দিবে কতে জলপান জাব কোন গণে। ইত্যাদি...।

এইরূপ ছোটখাট রচনার মধ্যে বিশেষ লোকপ্রিয় ছিল দামোদর বা অজয় ময়ূরাক্ষীর বানের কবিতা। বান লইয়া ছড়া অনেকেই লিখিয়াছিলেন। রাঢ়ী আমরা, বান কি হড়্‌কা, কাহাকে বলে, তাহা ভালোভাবেই জানি; কিন্তু এখন ধ্বংসপ্রায় গ্রামের উপর দিয়া বন্যার যে তাণ্ডব বহিয়া যায় তাহা আমাদের সহিয়া গিয়াছে। আমাদের জড় দেহ ও মনে তাহার বিশেষ কোনও ছাপ রাখে না। যখন আমাদের এইরূপ হন্যে দশা ছিল না তখনও অগভীর পাহাড়ী নদীতে বান হইত, কূল ছাপাইয়া সহসা হড়্‌কা পড়িত; দুই ভাই 'ডাক' 'ডেউর' প্রচণ্ড বিক্রমে মাতিয়া উঠিত প্রলয়লীলায়; অনেক ক্ষতি করিত। অভাবিত দুর্দৈবের আকারে তখন তাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অতর্কিতে বিপর্যস্ত করিয়া দিত। সাত-আট পুরুষ আগেকার কালের ময়ূরাক্ষী ও অজয়ের মর্মান্তিক একটি আশ্বিনে অকাল বানের কাহিনী, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রঙে রূপায়িত হইয়া একটি কবিতাতে পরিবেশিত হইয়াছে। কবির নাম দ্বিজ দ্বারকানাথ, নিবাস কুকুটাগ্রাম। লিপিকর শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহার নিবাস ছিল শান্তিনিকেতনের সন্নিহিত গোয়ালপাড়া গ্রামে। পুঁথির লিপিকাল ১২৩৮ বঙ্গাব্দ। দেশের সমস্ত জীবজন্তু, সমস্ত শস্য, হিন্দুমুসলমান আর গ্রামের সমস্ত

জাতি—কায়স্থ রাজপুত কলু মালি তাঁতি গোয়ালা বেনে কুম্ভকার কর্মকার শুঁড়ি,—তাহাদের কলমগুজা দপ্তর, ধড়া-ঢাল, হরপিনিশান, মাকু, চরকা, ঘানি পৈ, চক্র, জাড়, তাড়, মদের গোলা,— সমস্ত লইয়া ভাসিয়া গিয়াছিল সেই মহাপ্লাবনে। বান যখন নামিয়া গেল শ্মশানতুল্য উভয় তীরের যে বর্ণনা তাহা ভয়াবহ। জীবিতাবশেষদের জন্য শেষে কবির কথা :

রাজকর কিসে দিব রাজকর কিসে দিব কি খাইব অন্তরে ভাবিয়া
স্থানান্তরে কেহ গেল দুখিত হইয়া।
কহে দ্বিজ দ্বারকানাথে কহে দ্বিজ দ্বারকানাথে কুকুটাতে নিবাস থাকিয়া
জ্যেষ্ঠ ভাই কমলা তার আজ্ঞা পায়া।

গান ও কবিতা : পাঁচালী, ঢপকীর্তন, যাত্রা, আর্যা তর্জা, বোলান, শারি ও জারি গান, দেবীবন্দনা গান, কবিগান, খেউর, আখড়াই গান, যোগ-সংগীত, বাউল গান, কৌতুক রসের গান এবং নানা পেশা-সংক্রান্ত গান ইত্যাদি। পুঁথি-পরিচয়ে একটি জারি গান ছাপা হইয়াছে। কারবালার করুণ কাহিনী এই পালা গানের বিষয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত জারি গানের এটি একটি পুরাতন নমুনা। তবে দুঃখের বিষয় পুঁথিটি খণ্ডিত। আরম্ভ এইরূপ :

তারে নারে নারে নারে নারে নারে না
কারবালাতে যখন হোছেন খলখয়ে শহিদ হল
হোছেনের শির নিএ কাফের দমেশকাবাদে ইলো।
ছের নিঞে ত কাফের গেল নেজায় চড়েঞা
কারবালাতে হোছেনের ধড় থাকে···নো পড়িঞা।
ইত্যাদি···

বোলপুরের সন্নিহিত গোয়ালপাড়া গ্রামের দেবতা বক্রনাথের বন্দনা লিখিয়াছিলেন সন্ন্যাসী কৃষ্ণগিরি। অন্যান্য বন্দনা কবিতার মধ্যে বদন মিশ্রের 'গণেশবন্দনা', কানাইদাসের 'ব্রাহ্মণ বন্দনা'—এই সব পুঁথি বিশ্বভারতী-সংগ্রহে আছে।

কৌতুকরসের গান ও কবিতার সংগ্রহ আশানুরূপ হয় নাই। এই ধরনের রচনার অধিকাংশই নিতান্ত আদিরসাত্মক। ভালো ও পুরাতন নমুনা কিছু পাওয়া গিয়াছে। যেমন, গাঁজা ও তামাকুর গান। তামাকুর গান :

মা মৈল্যে যেন গুড়াকু তামাকু পাই ॥ ধুয়া ॥
উঠি অতি নিশিভোরে হুঁকাটি লয়িয়া করে
গোয়ালি দুয়ারে দুয়ারে উকুট্যা বেড়াই ছাই।
মা মৈল্যে ইত্যাদি।
কয়্যা জাব তনয়েরে মৈল্যে জখন শ্রাদ্ধ করে
কুশ পট্যো টেন্যা ফেল্যা
কোঁচাড় তামাকু গুড় দিয়া পিণ্ডি দেয় তাই।
দ্বিজ রামানন্দে ভনে স্থান দিয় শ্রীচরণে
জোড়া নলে তামাকু খাইয়া স্বর্গে চল্যা জাই ॥
মা মৈল্যে ইত্যাদি।

পুঁথি-পরিচয়ের ১৮৫ পৃষ্ঠায় আছে, 'ভণ্ডরামের পদ'। কবিতাটিতে মানব-সমাজের শাশ্বত 'ঠকচাচা'র চরিত্রচিত্র আছে। পুঁথির রচয়িতা দিগম্বর, লিপিকাল সন ১১৮৩ সাল। লিপিকর কমলাকান্তপুরের গদাই সাধু। আরম্ভ এইরূপ :

পৃথিবীতে ভাঁড় যত তাহা বা কহিব কত
সংসার ভাঁড়ের কথা শুন
দেখিঞা অজান জনে প্রণয় করে তার সনে
জানাইতে আপনার গুণ।
মিছামিছি করে ঠাট গোলমালে চণ্ডীপাঠ
ভেক ধড়্যা সাধুর কাছে যায়
উৎপন্ন বুদ্ধি লয় পাঁজে পাঁজ দিঞা কয়
ভরম কয়্যা থাকে দিবানিশি

পূর্ব সবভাব পাসরিল দেখ্যা শুনে রসিক হৈল
তারে বলি ভণ্ড তপসী।

পরিশেষে কবির উপদেশ :

সতর হইয় মনে না থাক ভাঁড়ের সনে
এই কথা দিগম্বরে কয় ॥

পুঁথি-পরিচয়ের ১৯০ পৃষ্ঠায় আইবড় হটুরাম চক্রবর্তীর খেদ আছে। চক্রবর্তী মহাশয় বোধ হয় ছিলেন অকুলীন। রচনাটি নিতান্ত হালকা। ভাষাও সর্বত্র শ্লীল নহে। তবে এই ধরনের রচনা দুর্লভ বলিয়া আমরা কবিতাটিকে অবহেলা করিতে পারি নাই। কবিতাটি মোটামুটি এইরূপ :

হটুরাম চক্রবর্তী গেঞেতে পলসাঞী,
সাটী বৎসর বএক্রম বিয়া হল্য নাঞী।

কানা খোড়া জদি একটা মিলিত দয়া করি,
আমার সেই হত্য সাত রাজার ধন ইন্দ্রের অপছরি।

কার বা বিশ পচিস বিয়া মলই গেল দুটো,
অতেব বলি সে বেটা বিধাতা অন্ধ আজ নেটো।

পাট পড়শী বৌরি হয় ভ্রাতৃবধূ জারা,
ছি ছি আইবড় বঠাকুর বল্যে নাম রেখেছে তারা।
ডেঙ্গ বলে কাছ ঘেসে না কেহ না চায় ফিরে,
মড়ার মত পড়ে থাকি অনাথ মন্দিরে।

আমি দফা দফা সত্তিাপিরে সিন্নি দিলাম মেনে
বাকী নাই তার জত কারদানী নিলাম জিনে।
তার পুজিমাত্র আছে কেবল মুখে চাপ দাড়ী
তার কুদরতি নাঞী সিন্নি খাবার দাড়ি।

রমানাথ রায়ের 'দশের মাহাত্ম্য', সুখদুঃখদাসের 'শাশুড়ী-বউয়ের কোন্দল', অজ্ঞাতনামা কবির 'টিচা-টিচিনী কাহিনী' ইত্যাদি এই প্রকরণের কবিতা। এইখানে প্রকাশ থাকে যে, বিশ্বভারতী যোগসংগীত ও বাউল গান সম্প্রতি তিন শতাধিক সংগ্রহ করিয়াছেন।

মেয়েলী ছড়া প্রবাদ-প্রবচন হেঁয়ালী রূপকথা বাংলা মন্ত্রাদি

গ্রামিক সংস্কৃতির এই মণিমুক্তারাজির মূল খুঁজিতে গেলে মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্য, প্রাচীন যুগের বাংলাসাহিত্য অপভ্রংশ পালি প্রাকৃত ও সংস্কৃত সাহিত্যের খনি অন্বেষণ করিতে হইবে; অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যও খুঁজিতে হইবে। আরবী ফারসী ভাষায় কোরাণ কালাম কেচ্ছা বয়েতের পুঁথি, সমসাময়িক ঘটনা, ইতিহাসের ক্ষীণ স্মৃতি সমস্তই ঝাড়িয়া দেখিতে হইবে। লোকসাহিত্যের এই পর্যায়ের সংগ্রহক্ষেত্রেও বিশ্বভারতী পিছাইয়া নাই। তবে এই দিকে উপযুক্ত কাজ করিতে গেলে, গ্রামের সহিত যোগযুক্ত ছাত্রছাত্রীর অবিরাম অনুসন্ধিৎসা অবশ্যপ্রয়োজনীয়। যাহাই হউক, এখানে আমরা মাত্র কয়েকটি নমুনা উপস্থাপিত করিতেছি। গ্রাম অঞ্চলের পুরুষ ও মহিলাদের নিকট হইতে সহস্রাধিক ছড়া-গান যথেচ্ছ সংগৃহীত হইয়াছে।

বেউল বাঁশের বাঁকখানি নীল পাটের শিকে
কিষ্টর কাঁধেতে দিয়ে চলিল রাধিকে।

রাধাকৃষ্ণের প্রেমবিলাসের এই চিত্রটি পাইতে গেলে পঞ্চদশ শতাব্দীর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের 'ভারখণ্ড' খুঁজিতে হইবে।

একটি প্রবাদ: রাঁধুনী এলো দুপুরে। হাত চেটে খায় কুকুরে। স্থানীয় প্রসিদ্ধির সহিত পরিচয় না থাকিলে এই প্রবাদটির ঠিক অর্থবোধ হইবে না।

একটি প্রসিদ্ধ প্রবচন : জামাইয়ের জন্তে মারে হাঁস। গুষ্টি সুদ্ধ খায় মাস॥ মধ্য ভারতীয় আর্যভাষায় লিখিত 'লৌকিকন্যায়াগুলিতে' এই ছড়াটির আদি-রূপের হদিশ মিলে, জামাত্রর্থং শ্রপিটস্ত সূপাদের অতিথ্যুপকারকত্বম্।

কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে সংগৃহীত প্রহেলিকা কবিতা বা একটি 'ভাঙ্গানি' এইরূপ;—

বেগে ধায় রথ নাহি চলে এক পা, নাচয়ে সারথি তথি পসারিয়া গা।
হেয়ালি প্রবন্ধে পণ্ডিত দেহ মতি, অন্তরীক্ষে ধায় রথ ভূমিতে সারথি।

আনন্দধরের সংস্কৃত-অপভ্রংশে লেখা 'মাধবানল কথায়'

পর্বতাগ্রে রথো যাতি ভূমৌ তিষ্ঠতি সারথিঃ।
চলতে বায়ুবেগেন পদমেকং ন গচ্ছতি॥

কুশললাভের গুজরাটী-হিন্দীতে লেখা 'মাধবানল কামকন্দলা চউপঈতে'

পর্বত সিখরে এক রথ জাই, থাংভেঐ বইসই ভূই ঠাই।
অতি উচ্ছূক চালই করি বাউ, এক পগ নাবি যাই আঘউ॥

আসামের ধুবড়ী হইতে শ্রীযুক্ত অজয়কুমার চক্রবর্তী 'মাণিক্য মিত্রের কথা' সম্প্রতি প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থটির রচনাকাল অষ্টাদশ শতকের প্রথম ভাগ। পুরানো রূপকথার নমুনা বলিয়া রচনাটির সুনাম হইয়াছে।

এইবার বাংলা মন্ত্রের কথায় আসা যাউক। একটি মন্ত্রে মনসা মঙ্গলের তত্ত্ব;—

হাই গো মাই গো জ'টা ঝাড়িতে বিস নাঞি গো
নাঞি বিস যেই মা মনসার আজ্ঞায় নাঞি।
নিকিন ধবান কাপড় কাচে মন পবনের খায়ে
বনে নাগ ধরে এনে আপন পুতা মারে।
চৌদিগে বুলিএ দিস
চিঅ পুতা ঘর জাব চাপড়ে উলম বিস। ইত্যাদি।

ধর্মমঙ্গলের 'জালালি কলিমায়' চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দিল্লীর বাদশাহ ফীরুজশাহ তুঘ্‌লকের উড়িষ্যা অভিযানের শোচনীয় কাহিনী লুকাইয়া আছে, এবং আছে এই মন্ত্রটির কয়েকটি ছত্রেও ;—

জখন দেয়ান গাই জবই করিল তুনিয়া ভিতরে
আটখানি হেড়া দিল গর্ধবির শিরে।
গর্ধবি সিনান করে মদের পখরে
মাজকার হেড়া দিল রন্ধনের সালে। ইত্যাদি।

উপসংহারে ভেলামুখী মনসার নামে একটি ভেল্কির মন্ত্র পড়ি :

দরবারে ভেল্কি ভেল ভেলোটি ভেলামুখী লাগ ভেল্কী চতুর্মুখী
লাগবী তো ছাড়িব না ছাড়িব তো পাসরবি না
লাগ লাগ লাগ সভা যুড়ে লাগ। ইত্যাদি।

সর্বশেষে 'নিঁদাটি' ছাড়ি :

সর্গের ধন মর্তের মাটি	নিদ পড়েছে গাছের পাতায়
সাপিনিকে লাগিল দাঁৎ কপাটি।	নিদ পড়েছে হেঁগল মাথায়।
ইন্দ্র মাটি সিন্দের চোর	সুয় থাকে বসে জাগে
নিদ পড়েছে আঘোর ঘোর।	মোর নিঁদিট তাকে লাগে।

য় গাইনে না কারে রা
মো পো জমরায়ের কালিকা মা।
হাড়িঝিয়ের আজ্ঞা চণ্ডির পা
কুম্ভকর্ণের স্মরনে নিদ্রা যায় নিদিটি দেয়া॥

এই মন্ত্রগুলির জের অথর্ববেদে খুঁজিলে পাওয়া যাইবে; কিন্তু আজ আর আমরা সে চেষ্টা করিব না। রাত হইল। দরবারে ভেল্কি লাগাইয়া ঘুমের মন্ত্র পড়া গেল। এখন মেলার এই হট্টগোলের মধ্যে একটি গ্রামিক আপ্তবাক্য স্মরণ করিতে করিতে পালা শেষ করি :

কি কথা জানি কি কথা কব কথা কয়ে কথার মান খোয়াব।
যখন কথার যোগ্য হব এক কথাতেই বশ করিব॥

বাংলা ও ওড়িয়া পল্লীসাহিত্যের ঐক্য

কুঞ্জবিহারী দাশ

সংস্কৃতি পুষ্করিণীর জলের মতো এক স্থানে আবদ্ধ হয়ে থাকে না। এর ধারা সাগরের স্রোতের মতো দেশ থেকে দেশান্তরে প্রবাহিত হয়। বাংলা ও ওড়িশার বেলাতেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। এই দুটি প্রতিবেশী প্রদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে। লোকসাহিত্যে-বিশেষতঃ লোকসংগীতে ও কবিতায় এই আদানপ্রদানের চিহ্ন সব চেয়ে স্পষ্ট। ওড়িশার পালা বাংলাদেশের কবিগানের মতো এক পুরানো লোকপ্রিয় সাহিত্যিক অনুষ্ঠান। গায়ক ও বাদক ছাড়া এতে আরও তিন চার জন যোগ দেয়। পালার গায়ক প্রাচীন ওড়িয়া সাহিত্যে ধুরন্ধর ও পুরাণো রাগরাগিণীতে ওস্তাদ। তার ডান হাতে গিনি বাম হাতে চামর। পরনে ঘের, চাপকান, টুপি। গ্রাম্য কবিদের রচিত গানই সাধারণতঃ সে গায়। সেই সঙ্গে প্রাচীন কবিদের ছান্দ, চৌপদী ও শ্লোকও গাওয়া হয়। উপেন্দ্র ভঞ্জ, দীনকৃষ্ণ, অভিমন্যু সামন্তসিংহার, কবিসূর্য গোপালকৃষ্ণ প্রভৃতি ওড়িয়া সাহিত্যরথীদের সঙ্গেও এদের যোগাযোগ কম নয়। কবিদলের মধ্যে প্রতিযোগিতার মতন বাদী পালাও বিশেষ উপভোগ্য; দুইদল গায়কের মধ্যে প্রশ্নোত্তর-ছলে সমগ্র সাহিত্য-ভাণ্ডার উজাড় করা হয়। অনেক সময় সাতদিন থেকে একমাস অবধিও একাদিক্রমে এই প্রতিযোগিতা চলে। জ্ঞানের গভীরতা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বাগ্মিতা, স্মৃতিশক্তি ও গান গাইবার

ভঙ্গী প্রভৃতি নানাদিক বিচার করে বিদগ্ধ বিচারকেরা শ্রেষ্ঠ গায়কের নাম ঘোষণা করেন।

কবিদল ও পালাওয়ালাদের অনুষ্ঠান দুটি মোটামুটি একই ধরনের। বাংলাদেশের পটুয়া গীতের সঙ্গে ওড়িশার পাটুয়া যাত্রার গভীর সাম্য আছে। পাটুয়ারা হিন্দুও নয় মুসলমানও নয়। তারা মুসলমানদের মতো নেমাজ করে আবার হিন্দু দেবদেবীদের চিত্রও অঙ্কন করে থাকে। কুড়ি পঁচিশ হাত লম্বা পটের উপর তারা কোনো কাহিনীকে ধারাবাহিকভাবে চিত্ররূপ দেয় এবং সেই কাহিনীকে ভিত্তি করেই গীতিকাব্য রচনা করে। এই চিত্র দেখিয়ে, এবং গান গেয়ে তারা জীবিকা অর্জন করে। তারা একাধারে কবি ও শিল্পী। ওড়িশার পাটুয়ারা নিজেদের হিন্দু বলে অভিহিত করলেও তাদের হিন্দু মন্দিরে প্রবেশাধিকার নেই। তারা মুসলমানদের সবারিকে (পাল্কি জাতীয় একটি যান) মাথায় করে বহন করতেও সংকোচ প্রকাশ করে না। তাদের মধ্যে মুখে মুখে রচনা করে গান কেউ কেউ গেয়ে থাকে বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পালার আদর্শে কবিদের রচিত গীতই গাওয়া হয়। বাদী পালার মতো বাদী পাটুয়ার গীতও উপভোগ্য।

বাংলাদেশের শিবের গাজনের মতো ওড়িয়া দণ্ডনাট প্রসিদ্ধ। উভয় অনুষ্ঠানেরই আরাধ্য দেবতা শিব। বাংলায় যেমন পুকুর থেকে 'বেত তোলা' 'ঘট ভরা' ইত্যাদি উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ওড়িশায়ও তেমনি হয়। গাজনের 'চামুণ্ডা', কালীর মতো। চড়েয়া, চড়েয়াণী, পত্রসউরানী, ফকীর, ফকীরানী বাই ধন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গাজনের গানের মতো বহু রচিত গীত দণ্ড-নাটেও গাওয়া হয়। এ দুটি যাত্রা-অনুষ্ঠান সাধারণতঃ নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও এতে বহু শাস্ত্র পুরাণের আলোচনা হয়ে থাকে। জাতিভেদের স্থান নেই এ অনুষ্ঠানে। উচ্চ শ্রেণীর লোকও অবাধে যোগ দিতে পারে। আবার চড়ক পূজার প্রচলনও উভয় প্রদেশেই আছে। আগুনের উপর চলা, কাঁটায় শোওয়া, গরম বালির উপর গড়ানো, জিভে কাঁটা ফোটানো, তীক্ষ্ণধার খড়্গের

উপর চলা, গাছের শাখায় পা দুটি বেঁধে জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে মাথা ঝোলানো ইত্যাদি যাবতীয় কায়ক্লেশপ্রদ ক্রিয়াগুলি প্রদর্শিত হয়। উদ্দেশ্য শিবের সন্তোষ বিধান। এই আনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে উভয় প্রদেশের মধ্যে অজস্র মিল।

আবার সত্যপীরের মানসিক পূজাও দুই প্রদেশেই আছে। আয়ুবৃদ্ধি সন্তান প্রাপ্তি, বিত্ত লাভ, যশ লাভের জন্যে এই পূজা। উভয় প্রদেশে প্রচলিত পাঁচালী গল্পের মধ্যেও বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ওড়িশায় প্রচলিত কবি কর্ণের পালার ভাষা বাংলা ও পারসিক শব্দ মেশানো। সম্ভবতঃ সত্যপীরের পূজা বাংলাদেশ থেকে ওড়িশায় এসেছে। ওড়িশায় কোনোদিন হিন্দু মুসলমান সাম্প্রদায়িক সমস্যা জটিল হয়ে দাঁড়ায় নি। যতদূর মনে হয় উভয় সম্প্রদায়ের মিলন প্রচেষ্টা বাংলাদেশেই আরম্ভ হয়, পরে ব্যাপ্ত হয় ওড়িশায়। বাংলা মেশানো ওড়িয়া সংকীর্তন এখনও ওড়িশার পল্লীগ্রামে প্রচলিত আছে। হাড়িপার শিষ্য বঙ্গদেশের রাজা গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যত্যাগকাহিনী এখনও ওড়িয়া পল্লী সীমন্তিনীদের নয়ন অশ্রুসিক্ত করে। তেমনি জলেশ্বরের লাঙ্গলেশ্বর শিবের বিষয়ে কিংবদন্তী, মেদিনীপুরের কবি রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যে রূপায়িত হয়েছে। উভয় প্রদেশের বারমাসী, ছড়া, ডাকবচন, কাহিনী কিংবদন্তী, পালা, পার্বণ, যাত্রা, উৎসব লোকবিশ্বাস ইত্যাদির মধ্যে বিশেষ সাম্য আছে। সবগুলির উদাহরণ দেবার অবকাশ নেই। প্রসঙ্গটুকুর অবতারণা করলাম মাত্র।

বাংলার বাউল সংগীতের মতো ওড়িশায় পিণ্ডব্রহ্মাণ্ড দর্শনের প্রতীক বহু শরীরভেদ ভজন, শূন্যবাদী বৈরাগ্যমূলক ভজন প্রচলিত আছে। পঞ্চসখা যুগ থেকে এখন পর্যন্ত ওড়িয়া লোকসংস্কৃতির উপর তার প্রভাব বিশেষভাবে বিস্তৃত। মহিমাধর্মের প্রচারকদের উদ্যমে এখন আশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে এই ভাবের জোয়ার এসেছে। বাংলা বাউল সংগীত ও ওড়িয়া ভজনের মধ্যে কি পরিমাণ সাদৃশ্য আছে তা নিম্নোদ্ধৃত উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে:

বাংলা

মনের অনুরাগী আমার পোষা পাখি গিয়াছে উড়ে
যখন পাখির মন ছিল সরল,
ফাঁকি দিয়া কাট্যা গেল তিন পেঁচের শিকল।
ওগো মা তোর পয়ে ধরি, আমার পাখি দাও ধরে
মনের অনুরাগী পোষাপাখি আমার গিয়াছে উড়ে।
পাখির মাথে ময়ূরের পাখা,
গৌর বরন সেই না পাখা, চোখ দুইটি রাঙা।
হিঙ্গুল বরন সেই না পাখি দেখলে মুনির মন ঝুরে
মনের অনুরাগী পোষাপাখি আমার গিয়াছে উড়ে।

(হারামণি ৬৭ পৃঃ)

ওড়িয়া

উজান বৃক্ষে খেলুছি লোটণি পারা
অঠা কাটি পঞ্জরীরে ন পড়ে ধরা
পারাটি যে পঞ্চবর্ণি
নাহিঁ ইন্দ্রি নাহি যোনি
পাঞ্চগোটি পুত্র ঘেনি খেলুছি পরা ।১।
সে পারার ডেণা নাহিঁ
লক্ষে যোজনে উড়ই
জল ফল ন ভুঞ্জই অটে অমরা ।২।
পারা অছি ষেউ ঠারে
কেহি তা দেখি ন পারে
শীতল ছায়া কোটরে ন পড়ে ধরা ।৩।
পারা আজি ষিব উড়ি
বৃক্ষ পড়িব উপুড়ি
দাস রাধু বোলে ভজ দুঃখ পাসোরা।৪।

উভয় প্রদেশের পল্লীগীতের মধ্যে কতদূর সামঞ্জস্য রয়েছে, নিম্নোক্ত কয়েকটি উদাহরণ থেকে বোঝা যাবে। বাংলা ও ওড়িশার দিদিমা ঠাকুরমারা প্রায় একভাবেই রূপকথা বলা আরম্ভ ও শেষ করেন। এই ধারা কোন প্রদেশ থেকে কোন প্রদেশে প্রবাহিত হয়েছে বলা কঠিন। গল্পের আরম্ভে :

ওড়িয়া

কথাটিএ কহুঁ, কথাটিএ কহুঁ
কিস কথা, বেঙ্গ মথা
কি বেঙ্গ, ঠুরা বেঙ্গ
কি ঠুরা, ব্রাহ্মণ মরা
কি ব্রাহ্মণ, কুজি ব্রাহ্মণ
কি কুজি, কিয়া বুজি
কি কিয়া, রজা ভিয়া
কি রজা, খণ্ডি খজা
কি খণ্ডি, মিরিগ লণ্ডি
কি মিরিগ, ঝাড় মিরিগ
কি ঝাড়, কণ্টা ঝাড়
কি কণ্টা, কান কোলি কণ্টা
যহিঁ লাগি যাএ ঝটাপটা।

(উৎকল কাহানী)

বাংলা

দিদি লো দিদি একটা কথা
কি কথা—ব্যাঙের মাথা
কি ব্যাঙ, সরু ব্যাঙ
কি সরু, বামুন গোরু
কি বামুন, ভাট বামুন
কি ভাট, গুয়া কাট
কি গুয়া, চিকি গুয়া
কি চিকি, সোনার চিকি
কি সোনা, ছাই খা না
তার অর্ধেক ভাগ নে না
ভাগ নিয়ে করব কি
তোর ভাগ তোরে দি।

(ছেলেভুলানো ছড়া)

গল্পের শেষে :

ওড়িয়া

মো কথাটি সরিলা
ফুল গছটি মরিলা
হই রে ফুল গছ তু কাহিঁকি মলু ?
মোতে কালী গাই খাই গলা

বাংলা

আমার কথাটি ফুরোল
নটে গাছটি মুড়োল।
কেন রে নটে মুড়ুলি ?
গোরুতে কেন খায় ?

হই লো কালী গাই তু কাহিঁকী	কেন রে গোরু খাস ?
খাই গলু ?	রাখাল কেন চরায় না ?
মোতে গউড় জগিলা নাহিঁ ।	কেন রে রাখাল চরাস না ?
হই রে গউড় তু কাহিঁকি জগিলু নাহিঁ?	বউ কেন ভাত দেয় না ?
মোতে বড় বোহু ভাত দেলা নাহিঁ ।	কেন রে বউ ভাত দিস নে ?
হই লো বড় বোহু তু কাহিঁকি ভাত	কলাগাছ কেন পাত ফেলে না ?
দেলু নাহিঁ ?	কেন রে কলাগাছ পাত ফেলিস না ?
পিলা কান্দিলা	জল কেন হয় না ?
হই রে পিলা তু কাহিঁকি কান্দিলু ?	কেন রে জল হোস না ?
মোতে ধুলিয়া জন্দা কামুড়ি দেলা	ব্যাঙ কেন ডাকে না ?
হই রে ধুলিয়া জন্দা	কেন রে ব্যাঙ ডাকিস না ?
তু কাহিঁকি কামুড়ি দেলু ?	সাপে কেন খায় ?
মুঁ ভূঁই তলে তলে যাএ	কেন রে সাপ খাস ?
কঅঁল মাউস পাইলে রট করি	খাবার ধন খাবো
কামুড়ি দিএ ॥	গুড় গুড়োতে যাবো ॥

অর্থ ও কুল মানের জন্য বুড়ো বরের সঙ্গে বালিকা কন্যার বিবাহ দেওয়া ওড়িশার পল্লী অঞ্চলেও দুর্লভ নয়। এই নৃশংস বর্বরতার কবিগুরু নিন্দা করেছেন। মরমী পল্লীকবিদের গানেও নিরাশ্রয়া বালিকা বধূর করুণ বেদনা রূপ পেয়েছে।

ওড়িয়া

দান্ত নাহিঁ বুঢ়া পাকুয়া পাটি বোউ কি লো
বেদীরে বসিছি আখি তরাটি বোউ কি লো
পর্বত শিখরে পাচিছি বেল বোউ কি লো
তোতে লাজ নাহিঁ

বুঢ়া মুণ্ডে নেই খংজিলু ফুল   বোউ কি লো
বাপা বসিথিলে গম্ভিরী ঘরে   বোউ কি লো
টংকা পহঞ্চিলা দিপহরে   বোউ কি লো
মোহর যেমন্ত নিশ্বাস থিব   বোউ কি লো
টংকা বার বোড়ি অংগার হেব   বোউ কি লো ॥
(বোহূক সুখদুঃখ গীতিকা, পৃঃ ৫)

বাংলা

তাল গাছ কাটম বোসের বাটম   গৌরী এল ঝি
তোর কপালে বুড়ো বর   আমি করব কী
টক্কা ভেঙে শঙ্খা দিলাম   কানে মদন কড়ি
বিয়ের বেলা দেখে এলুম   বুড়ো চাপদাড়ি
চোখ খাও গো বাপ মা   চোখ খাও গো খুড়ো
এমন বরকে বিয়ে দিলে   তামাকখেগো বুড়ো
বুড়োর হুঁকো গেল ভেসে   বুড়ো মরে কেশে
নেড়ে চেড়ে দেখি বুড়ো   মরে রয়েছে
ফেন গালবার সময় বুড়ো   নেচে উঠেছে।
(লোকসাহিত্য, পৃঃ ৭৬)

বাংলার একটি ছেলেভুলানো ছড়ার সঙ্গে আশ্চর্য মিল পাওয়া যাবে আমাদের দণ্ডনাটের চড়েইয়া গীতির— শুধু ভাবের নয়, ভাষার মিলও কৌতূহলোদ্দীপক।

ওড়িয়া

ধোব চারি ছান্দ কহিলু নাগর তু মোর জীবন ধন
কলা চারি ছান্দ যেবে কহিবু রে যাচি দেখি যউবন।
কঅলা কঅলা এ দুহেঁ কলা লো কলা ত যিব মইষি
আউরি যেবে তু কলা পচারিলু তোহরি মুণ্ডর কেশি।

রঙ্গ চারি ছান্দ কহিলু নাগর তু মোর জীবর ধন
ধলা চারি ছান্দ যেবে কহিবুরে যাচি দেবী যঊবন।
ধোওব ধোবলী এ দুহেঁ ধোব লো ধোব তো রজাঙ্ক হংস
আহুরি যেবে তু ধোব পচারিলু চড়েয়াণী লো
তোহরি পিন্ধিলা বাস…
রঅঙ্গ রঙ্গণি এ দুহেঁ রঙ্গ লো রঙ্গ ত ফুল মন্দার
আহুরি যেবে তু রঙ্গ পচারিলু চড়েয়াণী লো
তোহরি মথা সিন্দুর।

বাংলা

জাদু এ তো বড় রঙ্গ জাদু এ তো বড় রঙ্গ
চার কালো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ
কাক কালো, কোকিল কালো কালো ফিঙের বেশ
তাহার অধিক কালো কন্যে তোমার মাথার কেশ।
জাদু এ তো বড় রঙ্গ জাদু এ তো বড় রঙ্গ
চার ধলো দেখাতে পার যাব তোমার সঙ্গ
বক ধলো, বস্ত্র ধলো ধলো রাজহংস
তাহার অধিক ধলো কন্যে তোমার হাতের শঙ্খ।
জবা রাঙা, করবী রাঙা রাঙা কুসুম ফুল
তাহার অধিক রাঙা তোমার মাথার সিন্দুর॥

(লোকসাহিত্য, পৃঃ ২৭)

ছেলেভুলানো ছড়ায় আরও কত সাদৃশ্য। দুই প্রদেশের শিশুরা চাঁদমামাকে একইভাবে ডাকে :

ওড়িয়া	বাংলা
আ জহ্নমামুঁ শরদ শশী	আয় আয় চাঁদ মামা
মো কান্থু হাতরে পড় রে খসি	টি দিয়ে যা

আ আ জহ্নমামুঁ আ আ
পাট কাছটিএ দেই যাআ
গোটিএ দেলে কাহ্নু মোর হসিব
ষোড়িএ দেলে পিঢ়া মাড়ি বসিব।

মাছ কুটলে মুড়ো দেব
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব
কালো গোরুর দুধ দেব
চাঁদের কপালে চাঁদ টি দিয়ে যা।

(লোকসাহিত্য, পৃঃ ২৭)

পল্লীগ্রামের বারোমাসের সুখদুঃখ নিয়ে রচিত বারমাসী। বারোটি পদের ক্ষুদ্র পরিসরে নিরাড়ম্বর, নিষ্কপট পল্লীজীবনের প্রত্যক্ষ স্পর্শ পাওয়া যায়। বারমাসী নারীসমাজের একান্ত নিজস্ব। বারমাসীর গভীর অনুভূতি ও সাবলীল ছন্দে যেন পল্লীপ্রাণেরই স্পন্দন শোনা যায়। বর্ষযাপনের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা কোথাও অতীত স্মৃতির করুণ রসে ঝংকৃত, কোথাও বা দুঃখময় জীবনের আশঙ্কায় উদ্বেল। হিন্দী, ভোজপুরী, ওড়িয়া ও বাংলা ভাষায়, বহুবিধ বারমাসী প্রচলিত আছে। অধিকাংশের মধ্যে প্রায় একই ভাবধারা প্রচলিত। দুই প্রদেশের রুচির সাদৃশ্য ধরা পড়বে নিম্নোক্ত খাদ্য বারমাসী থেকে :

বাংলা

জ্যৈষ্ঠ মাসে মিষ্ট ফল
আষাঢ়ে বরিষার জল।
ভাদ্র মাসে তালের পিঠা
আশ্বিন মাসে শশা মিঠা।
অঘ্রানেতে নবান্ন নতুন ধান কেটে
পৌষ মাসে পিঠে পার্বণ ঘরে ঘরে পিঠে।
শ্রাবণে ঝুলনযাত্রা ঘি আর মুড়ি
ভাদ্র মাসে পান্তা ভাত খান মনসাবুড়ি॥

ওড়িয়া

মগুশিরে নূআ ভাত চুঙ্গুড়ি মাছর রস
অশিণরে ঘিঅ পিঠা, কার্তিকে হবিষ্য
পৌষ মাসে মূলা-মুড়ি খাইবাকু মিঠা
ঘন আউটা পাটকপুরা কদলী চকটা।
বারমাসরে বার খাইলু
আউ খাইবু কী
পখাল ভাতরে বাইগণ পোড়া
খেচেড়ি ভাতরে ঘি॥

ভাষণ : লোকসাহিত্য

প্রবোধচন্দ্র বাগচী

লোকসাহিত্য সাধুসাহিত্যের বিরোধী নয়, যদিও তা মূলতঃ পল্লীগ্রামের সাহিত্য। প্রাচীন কালেও নাগরিক সাহিত্য ছিল। তখন কিন্তু নাগরিক ও গ্রাম্য সাহিত্যে এত প্রভেদ ছিল না। নাগরিক সংগীত ও গ্রাম্য সংগীতে তফাৎ হয়েছে ইংরেজ আমলে— শান্তিদেব যা বললেন— বৈদেশিক প্রভাবে। লোকসাহিত্য অসাধু বা তথাকথিত অর্থে 'গ্রাম্য' অবশ্যই নয়। বৈদেশিক সাহিত্য অধ্যয়ন না করলে হয়তো বর্তমান নাগরিক সাহিত্য সর্বতোভাবে বোধগম্য হতে পারবেনা। কিন্তু লোকসাহিত্য বিচারের সময় বিদেশীর চোখে দেখলে চলবেনা। তার মধ্যেও সংস্কৃতি আছে, যদিচ তা দেশজ। লোকসাহিত্যের রচয়িতারা সংস্কারবর্জিত ছিলেন, এমন নয়। শিবঠাকুরের বিয়ের সম্পর্কে প্রচলিত গ্রাম্য ছড়ার—বিষ্টি পড়ে টাপুর টপুর নদেয় এল বান ইত্যাদি— সাধারণ পৌরাণিক ব্যাখ্যা ছাড়াও যে-গভীর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা হয় শৈবদর্শনের মূল হল তাই। বাংলা লোকসাহিত্যে বিভিন্ন রকমের সংস্কার ও শিক্ষার বিভিন্ন ধারা এসে মিশেছে। মনস্থরউদ্দীন সাহেব লোকসাহিত্যে হিন্দুমুসলমান ভাবধারার কথা বলেছেন। শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য লোকসাহিত্যে উপজাতীয় ধারার কথা বললেন। বিভিন্ন প্রদেশের লৌকিক ধারার মধ্যেও যে কতখানি ঐক্য বিত্তমান, তারও পরিচয় পাওয়া গেল শ্রীযুক্ত কুঞ্জবিহারী দাশের কাছে।

এমনি সাদৃশ্য ওড়িশা ছাড়া অন্য প্রদেশের লোকসাহিত্যের সঙ্গেও থাকা সম্ভব।

আমাদের লোকসাহিত্যের ধারাই দেশের আদর্শ সাংস্কৃতিক ধারা, না ইংরেজি শিক্ষার ফলে প্রসারিত সাহিত্যের ধারাই আদর্শ ধারা—এটা বিচারের বিষয়। কোন্ ধারায় নতুন যুগের সাহিত্য গড়ে উঠলে দেশের লোক তা মনেপ্রাণে গ্রহণ করবে সেটাও জানতে হবে। বলাই বাহুল্য, দেশের সঙ্গে যে-সাহিত্যের প্রাণের যোগ সবচেয়ে বেশী, তার দাবিই সর্বাগ্রে। বর্তমান সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে মুদ্রিত পুস্তক বিক্রয়ের সংখ্যা খুব বেশি নয়। কারণ এক্ষেত্রে পাঠকগোষ্ঠী একটি ছোট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। সেই গণ্ডি পেরিয়ে দেশের লোকের মর্মস্থলে পৌছতে হলে লোকসাহিত্য এবং বর্তমান নাগরিক সাহিত্য এই দুই ধারার মিলন ঘটাতে হবে। তবেই আমরা দৃষ্টি ও বুদ্ধির সংকীর্ণতা অতিক্রম করে বৃহত্তর জগতে প্রবেশ করতে পারব এবং সাহিত্যের যথার্থ প্রসার ও ব্যাপ্তি সম্ভব হবে।

শিশুসাহিত্য

শিশুসাহিত্যের সূচনা

প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম কথা, শিশুসাহিত্য কাকে বলব? শিশুর বোধশক্তি এবং ভাষাজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার জন্য যে-সাহিত্যের প্রয়োজন হয়, যে-সাহিত্য তাকে একাধারে আনন্দ এবং শিক্ষা দেয়, তার কল্পনাকে প্রসারিত, বুদ্ধিকে মার্জিত এবং জ্ঞানভাণ্ডারকে পুষ্ট করে তাকেই আমরা শিশুসাহিত্য বলতে পারি। গল্প, কবিতা, নাটক থেকে আরম্ভ করে দর্শন, বিজ্ঞানের বই—সবেরই এর মধ্যে স্থান হতে পারে, যদি ছেলেমেয়েদের উপযোগী সরস এবং সহজ ভাষায় লেখা হয়। কাজের সুবিধার জন্য দু'বছর বয়স থেকে ষোল বছর বয়সের ছেলে-মেয়েদের প্রয়োজনের দাবী মেটানো এর কর্মক্ষেত্রের পরিধি ধরা যেতে পারে।

এরপর শিশুসাহিত্যের বিভিন্ন স্তরের কথা আসে। শিশুর বয়স অনুযায়ী শিশুসাহিত্যের বিভিন্ন ধাপে বিভিন্ন রকমের আঙ্গিকের দরকার হয়। প্রথম স্তরে আসে ঘুমপাড়ানি গান ও ছড়াগুলি, ধ্বনি এবং ছন্দের মাধুর্যের সঙ্গে আবোল-তাবোল বকুনি এ-স্তরের সাহিত্যে বেশ চালানো যায়। এর পরের স্তরে প্রয়োজন হয় ধ্বনিমাধুর্যের সঙ্গে সুসংগত কথার মানের। শিশু মহারাজের স্তবস্তুতি, বড়োদের বহু উদ্ভট কল্পনা, আশাআকাঙ্ক্ষা, হাসিকান্না রূপ গ্রহণ করে এই স্তরের ছড়া এবং গল্পগুলির মধ্যে। অনুপ্রাসের ছড়াছড়ি চলে। মাতৃহৃদয়ের স্নেহরসে কবিত্বের মায়াস্পর্শে উজ্জ্বল এই স্তরের বহু অখ্যাত অমর কবির রচনা। শিশুর অজ্ঞাতসারে এই সময়ে মায়ের কোলে তার ছন্দের

মিলের এবং অনুপ্রাসের কান তৈরি হয়, জগতের যত মহাকবিদের মহাকাব্যের জন্মভূমি এইখানেই। এই স্তরের শিশুসাহিত্যে অর্থাৎ ছড়ার রাজ্যে শিশুরা সর্বত্রই শ্রোতা নয়, কোথাও কোথাও রচয়িতাও বটে। তার ছন্দের কান তৈরি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে রহস্য ক'রে, খেলার ছলে বা অন্যকে আঘাত করবার জন্য ছড়া রচনা করে, শহরে গ্রামে এর অনেক উদাহরণ মিলবে। এরপর আসে পুরোপুরি গল্পের যুগ। বোধশক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের কল্পনা চোখে-দেখা-জগতের বাইরে ঘুরে বেড়াবার ক্ষেত্র চায়। এ-স্তরের প্রথমে আসে জীবজন্তুর গল্প। তার পর ক্রমে রাখালের পিঠে-গাছ, নাপিতের ভূতধরা, তাঁতির বোকামি প্রভৃতির গণ্ডি পেরিয়ে শিশু আরও অজানার রাজ্যে যাত্রা করে, তালপত্তর খাঁড়া, ঘুমন্ত পুরী, সাতভাই চম্পা, সাতশ রাক্ষসীর রাজ্যে পাড়ি দেয়। এই সময়ে সে মায়ের ঠাকুরমার কোল ছেড়ে বাপের ঠাকুরদাদার গল্পের আসরেও বসতে শিখেছে, নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করে আর চলে না এখন, এটা কি, ওটা কোথায়, এটা কেন, ওটা কবে হ'ল—এ-সব প্রশ্নের জবাব দিতে হয় তাকে সহজবোধ্য ভাষায়। অতীতের উদ্ধত গ্রীক পণ্ডিত রাজাকে বলেছিলেন "জ্যামিতি শেখবার কোনো রাজকীয় সহজ পথ নেই।" কিন্তু সেকালের এবং একালের অনেক পণ্ডিতই এতে সায় দেননি। শিশু-মহারাজের জন্য সেকালের পণ্ডিতেরাও রাজনীতি ধর্মনীতির সহজবোধ্য বই লিখেছেন আজও পদার্থ-বিদ্যা, জীববিদ্যা, শিল্প, ইতিহাস, ভূগোল ও জ্যোতিষের এমন কি বড়োদের জন্য রচিত সাহিত্যের শিশুপাঠ্য সংস্করণ বেরোচ্ছে। ছেলেবেলায় এই ভাবে নানা বিষয়ের সঙ্গে সহজে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পেলে শিশু তার নিজের পছন্দ অনুযায়ী নিজের ভবিষ্যতের পথ স্থির ক'রে নিতে পারে, তার অনেক শক্তির অপব্যয় বেঁচে যায়। এ একটা মস্ত লাভ।

এই গেল শিশুসাহিত্যের মোটামুটি ক'টি স্তর,—ছড়া, গল্প ও প্রবন্ধের স্তর। এর মধ্যে দ্বিতীয়টিরই প্রচার এবং জনপ্রিয়তা বেশী। এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন;

প্রাচীনকাল থেকে কথাসাহিত্যের দুটি ধারা স্পষ্ট চোখে পড়ে, একটি পুরুষ-প্রভাবিত সত্যঘটনামূলক আখ্যায়িকার ধারা, আর একটি নারী-প্রভাবিত কল্পনামূলক গল্পের ধারা। এই দুই ধারার মিশ্রণে গড়ে উঠেছে অতীতের মহাকাব্য এবং পুরাণগুলি, হীনযানী বৌদ্ধদের 'জাতক' এবং মহাযানী বৌদ্ধদের 'অবদান' গ্রন্থগুলি, গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা', দণ্ডীর 'দশকুমার চরিত', বাণভট্টের 'কাদম্বরী' প্রভৃতি শত শত গ্রন্থ, যা আজ দু'হাজার বছর ধ'রে বহু লোককে আনন্দ দিয়েছে এবং ভবিষ্যতেও দেবার ক্ষমতা রাখে।

ইংরেজি উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের সাহিত্য ছিল মা-ঠাকুরমার মুখের ভাষায় ছড়া এবং রূপকথার গণ্ডীর মধ্যে। এর সঙ্গে যাত্রার কথকতার আসরে বড়োদের আনন্দের ছিটেফোঁটা পড়ত বটে তাদের ভাগে, তবে সেজন্য দাবী চলত না। প্রধানত পাশ্চাত্য প্রভাবের ফলে এই সময় পণ্ডিতদের নজর পড়ল শিশুদের উপর। পুঁথিপত্রে শিশুসাহিত্য সৃষ্টি আরম্ভ হল। প্রথমদিকে যে-বইগুলি লেখা হল তার অধিকাংশ বিদ্যালয় পাঠ্য বই, ছেলেদের রাতারাতি পণ্ডিত এবং সুবোধ সুশীল ক'রে তোলবার জন্য লেখা। এ সব বই-এ মনোরঞ্জনের চেষ্টা যে একেবারে ছিল না তা নয়, অল্প ছিল। বেত্রদণ্ডবিড়ম্বিত বাংলার শৈশবকে সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রথম তার প্রাপ্য সম্মান দিলেন রবীন্দ্রনাথ। শুধু নীতিশিক্ষা, জ্ঞানশিক্ষা দিয়ে নয়, আনন্দ দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে। প্রধানত তাঁর আদর্শ ও অনুপ্রেরণায় বিগত পঞ্চাশ বছরের শিশুসাহিত্য লালিত পালিত ও বর্ধিত হয়ে এমন একটি পরিণতি লাভ করেছে যা নিয়ে বাঙালী গর্ব বোধ করতে পারে। গত পাঁচবছরের শিশুসাহিত্যে এই পরিণতির চিহ্ন পরিস্ফুট। আজকের অধিবেশনে উপস্থিত যে-সব সুসাহিত্যিক ছেলেমেয়েদের জন্য সাহিত্যরচনায় নেমেছেন তাঁদের ভাষণ ও আলোচনা থেকে আমরা বাংলাদেশের শিশুসাহিত্যের বর্তমান রূপ ও প্রগতি সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারব।

শিশু-সাহিত্যের বিষয়বস্তু

লীলা মজুমদার

শিশু সাহিত্যের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে গত পাঁচ বছরের বিষয় বলাও যা, গত চল্লিশ বছরের বিষয় বলাও তাই। কারণ, যদিও দেখতে দেখতে আমাদের চারিদিকে ছোটদের বইএর এক বিশাল গন্ধমাদন জমে গেছে, উনচল্লিশ বছর আগে "সন্দেশ" পত্রিকার প্রথম সংখ্যা যখন প্রকাশিত হয়েছিল, তখনও যে-সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা হত এখনও তাই হয়। ছোটদের নাম-ধাম, চুলের ছাঁটের অদল-বদল হয়েছে মাত্র। তার বেশী হবেই বা কেন? সমর্সেট ম'ম তাঁর সম্প্রতি-প্রকাশিত একখানি বইএ বলেছেন যে কাব্যের আদর চিরকালের জন্য, কিন্তু গদ্য-সাহিত্যের আদর দু-তিন পুরুষ বড়জোর টিকে থাকে, তারপর সে সেকেলে হয়ে যায়। তখন তাকে ছাত্ররা আর পণ্ডিতরা ছাড়া কেউ নাকি বড় একটা পড়েও না। কথাটার সত্যমিথ্যা বিচার করবার সময় এখন নেই, কিন্তু আমার মনে হয় শ্রেষ্ঠ শিশু-সাহিত্য হল ঐ কাব্যশ্রেণীর রচনা, এবং তার আদর চিরকালের নিমিত্ত। উক্ত উনচল্লিশ বছরের পুরানো "সন্দেশ" খানা যদি কেউ খুলে দেখেন, তিনি একথা স্বীকার করবেন। Alice in Wonderland হল আরেকটি দৃষ্টান্ত।

আবার অনেকে বলেন যে শিশু-সাহিত্য বলে আলাদা একটা সাহিত্য থাকতে পারে না। আমাদের মতে সহজ ভাষায় লেখা ছোটদের উপযুক্ত সাহিত্যকেই শিশুসাহিত্য বলা যায়। ছোটদের নিজেদের রচনা কিংবা

তাদের বিষয়ে রচনা হলেই কিন্তু শিশু-সাহিত্য হয় না। এমন কি ছোট ছেলেদের এঁচড়ে-পাকা রচনাও প্রায়-কখনই শিশু-সাহিত্য হয় না। আসল কথা হল কেবলমাত্র তারাই ছোটদের জন্য লিখতে পারে, যাদের নিজেদের ছোটবেলাকার চোখ দিয়ে দেখা ছেলেবেলাকার কথা মনে আছে। আবার শুধু ঘটনাগুলিকেই মনে রাখলে যথেষ্ট হবে না, ছোটবেলার দৃষ্টিখানিও চাই। তাহলে বিষয়বস্তু বাছাবাছির আর কোনো ল্যাঠা থাকে না।

দুনিয়ার সমস্ত বিষয় নিয়ে শিশু-সাহিত্য হতে পারে। সৃষ্টি, ধ্বংস, রাগ, হিংসা, দ্বেষ, ভালবাসা, কিছুই বাদ দেবার প্রয়োজন নেই; প্রয়োজন শুধু একাধারে পরিণত বুদ্ধি আর শৈশবের দৃষ্টি। অনেকে ভাবেন শিশু-সাহিত্য হল বড়দের জন্য বই লেখার ট্রেনিং গ্রাউণ্ড। বেশ খাসা একটি কুস্তীর আখড়া পাওয়া গেল, এখানে সহজেই বাহবা পাওয়া যাবে, আবার সেইসঙ্গে দিব্যি হাতটাকেও পাকিয়ে নিয়ে, পরে বড়দের লেখার ক্ষেত্রে নির্ভয়ে নেমে পড়া যাবে। কিন্তু ছোটরা ত অসম্পূর্ণ বড় মানুষ নয়, তারা হল গিয়ে সম্পূর্ণ ছোট মানুষ। তাদের দুনিয়াকে দেখবার ধরনটাই আলাদা। সে-চোখ যার নেই, সে হাজারবার শিশু-সাহিত্যের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে পারে, কিন্তু শিশু-সাহিত্য রচনা করতে পারবে না।

শিশুসাহিত্যের বিষয়-তালিকাতে বাস্তব-অবাস্তব ভেদ নেই। অবাস্তব নইলে কেমন করে চলে? বাস্তবের তো মাত্র দশ দিকে বিস্তার, তায় আবার এটা নয়, ওটা নয়, এখন নয়, এখানে নয়, অতখানি নয়, পদে পদে বাধা। শিশু-সাহিত্যে অসম্ভবের চাহিদা আছে। পরী আছে, রাক্ষস আছে, দুইই একটু বোকামতো; আর কথা বলতে পারে এমন হাজার হাজার জন্তুজানোয়াররা আছে, দু'চারজন ছাড়া তাদের সকলের কি বুদ্ধি! ছোটদের গল্পে অসম্ভব স্বচ্ছন্দে চলে যাবে, তাই বলে কিন্তু অসংগতি চলবে না। কুকুরদের কুকুর-কুকুর স্বভাব থাকতে হবে। পরীরা উড়বে আর ভূতদের হাঁটু থাকবে

উলটো দিকে। এসব নিয়মকে কি পাঁচ বছরের মেয়াদ দিয়ে বেঁধে দেওয়া যায়? এ হল চিরদিনকার।

দুনিয়ার সব বিষয়ে শিশু-সাহিত্য রচনা হতে পারে। কিন্তু ছোটদের জন্য বই লিখলেই সে শিশু-সাহিত্য হয়ে যায় না। প্রথমতঃ পাঠ্যপুস্তকগুলির অধিকাংশকেই বাদ দিতে হবে। যার প্রকাশ্য উদ্দেশ্য শুধু জ্ঞান বাড়ানো, গুণীর হাতে পড়লে সেও যে জাতে উঠে সাহিত্যের সমগোষ্ঠি হয়ে যেতে পারে না, এমন কথা বলছি না। তবে কিনা সাহিত্য কারো অপেক্ষায় বসে থাকে না, তার কাছ থেকে কে কোন্ শিক্ষা গ্রহণ করল কি করল না, তাতে তার কিছু আসে যায় না। সে ফুলের মতো বিকশিত হয়ে ওঠে, তাকে কে দেখল আর কে দেখল না, কে তার সৌরভ পেল আর কে পেল না, সে তার হিসাব রাখে না। কেউ কিছু না শিখলেও তার সাহিত্য-মর্যাদা ম্লান হয় না। শিশু-সাহিত্যের বেলাতেও তাই। "ছোট ছেলেদের এইসব শেখাতে হবে"—এই কথা মনে করে শ্রেষ্ঠ রচনা তৈরি হয় না। "আমি নইলে গাছের পাতায় সবুজ রং ধরবে না"—এই মনে করে কি আর পৃথিবীর উপর সূর্যের সোনালী রোদ ঝলমল করে ওঠে? কিন্তু তবুও ঐ রোদ লেগেই ধরণী শ্যামল হয়ে যায়। সুন্দর হয়ে বিকশিত হওয়াই সাহিত্যের স্বভাব, শেখানো তার আসল উদ্দেশ্য নয়।

তবে অপরপক্ষে, কয়েকটি জিনিসকে শিশু-সাহিত্যের বিষয়তালিকা থেকে ছেঁটে ফেল্‌তে হ'বে, যেমন ছিঁচ্‌কাঁদুনে কবিতা, ছিঁচ্‌কাঁদুনে গল্প। কোথায় কার কে মরে গেল, কে কত রকমে কষ্ট পেল, কার ভাগ্যদোষে কি রকম করে কার জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল; এই ধরনের সব খুঁচিয়ে চোখের জল-বের-করা, মন-ছোট-করে-দেওয়া, হতাশামূলক গল্প আর কবিতা দূর করে দিতে হবে। দুঃখের কথার শুধু তখনই কোনও মূল্য থাকে, যখন তার মধ্যে দিয়ে মানুষের চরিত্র দৃঢ় হয়ে ওঠে, চিত্ত ক্ষমা করতে শেখে। এ-কথা বড়দের সাহিত্যেও যেমন খাটে, ছোটদের বেলাতেও তেমনই। ছিঁচ্‌কাঁদুনেদের আমরা কোনোমতেই প্রশ্রয় দেব না।

কিন্তু চোরডাকাতের গল্প চল্‌বে। শোনা যায় বিলেতে নাকি ছোট-ছেলেদের ডিটেকটিভ বই পড়ে চুরি-ডাকাতি করবার ইচ্ছা হয়; সেইজন্য অনেক অভিভাবক চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। এখানে পুনরায় দৃষ্টিভঙ্গীর কথা ওঠে। আমাদের ছেলেরা জানে চোররা হল তাদের বাবা-মাদের দুশ্চিন্তার কারণ, অতএব গোড়া থেকে চোরদের প্রতি সহানুভূতি হওয়াটা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তবে আর কেন নিশ্চিন্তে বাস করার আনন্দের মধ্যে, একটা মৃদু শিহরণের আনন্দ থেকে তাঁদের বঞ্চিত করা? এখনো মনে আছে ছোটবেলায় নসু ডাকাতের গল্প শুনেছিলাম। সে নৌকো করে চুরি ডাকাতি করত আর ভাল ভাল সোনাদানা বাড়িতে এনে জমা করত। একদিন গভীর রাতে নসুর দলের লোকরা একটা নৌকোকে আট্‌কেছে। এমন সময় নৌকোর ভিতর থেকে নসুর মা বাঘের মতো চোখ করে বেরিয়ে এসে হাঁক দিলেন, "নস্যা!" নসু ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে এল। মা বললেন, "লক্ষ্মীছাড়া ব্যাটা! আমার পা ছুঁয়ে শপথ কর্ যে—এমন কাজ আর কক্ষনো করবি না।" নসু গুটিসুটি এসে পা ছুঁয়ে শপথ করল। সেই নসু ডাকাতি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে গিয়ে সুখে বসবাস করতে লাগল। এমন ধারা গল্প শুনলে কারো কি কোনো অনিষ্ট হ'তে পারে? ভাগ্যিস চোররা আছে, তাই না মাঝখান থেকে ছোটছেলেরা একটু আনন্দ পেয়ে নিতে পারে।

চোরডাকাতরা না হয় পাশ করে গেল, ভূতপ্রেত বিকট দানবদের বিষয়ে গল্প লেখা কি উচিত? শেষটা ছেলেমেয়েরা ভীতু হয়ে যাবে না তো? আমার মনে আছে বাইশ বছর আগে এইখানে, লাইব্রেরির সামনে মহুয়াগাছের তলায় আমি অঙ্কের ক্লাশ নিচ্ছি। হঠাৎ দেখি একটি ছেলে দিব্যি আমার দিকে পাশ ফিরে বসে, গাছে ঠেস দিয়ে কি-একটা [illegible] পড়ছে, আর তার চোখ ঠিক্‌রে বেরিয়ে আসছে, ভুরু কপালে উঠে যাচ্ছে, চুল খাড়া হয়ে উঠছে। আমি এমনি অবাক হয়ে গেলাম, যে রাগ্ করতে ভুলে গেলাম। বাঁদরের তেলচিটে বাঁশ বেয়ে ওঠার কথা বন্ধ করে, ছেলেটাকে বললাম, "এদিকে আয়।" দেখি

তার হাতের বইটার উপর একটা কালো অন্ধকার গহ্বরের ছবি আঁকা, তার মধ্যে থেকে মাথা বের করে রেখেছে একটা বিকট জানোয়ার না কি যেন। বইএর নাম—"তিব্বতী গুহার ভয়ঙ্কর, রোমাঞ্চ সিরিজ ২২ নং।" ছেলেটার ঐ গভীর রোমাঞ্চময় আনন্দের কথা এখনো মনে আছে। আমরা রোমাঞ্চ সিরিজের নাম পরিবর্তন করতে পারি, ভাব মার্জিত করতে পারি, ভাষা বিশুদ্ধ করতে পারি, কিন্তু রোমাঞ্চকর কাহিনী থেকে ছেলেমেয়েদের বঞ্চিত করব কোন অধিকারে? মনগড়া গল্প শুনে, কাল্পনিক ভয় পেলেই তারা যদি ভীতু হয়ে যায়, তবে তারা পৃথিবীর সত্যিকার বিপদের সম্মুখে দাঁড়াবে কি করে?

কেউ কেউ ছোটদের প্রেমের গল্প পড়তে দেন না। কিন্তু যাদের জীবন প্রেম দিয়ে ঘেরা থাকে, ছোটবেলা থেকে সেই প্রেমের কথা শুনলে তাদেরই ন্যাকা হয়ে যাবার সবচেয়ে আশঙ্কা আছে, এ তো খুব যুক্তিসংগত কথা হল না। ন্যাকারা প্রকৃত প্রেমকে শ্রদ্ধা করে না, কৃত্রিম ভাবাবেগ নিয়ে উচ্ছ্বাস করে। যে-প্রেম মানুষকে স্বার্থশূন্য করে দেয় তার কথা পড়লে ছেলেরা ন্যাকা হয়ে যাবে, এ কেমনধারা কথা? তাই বলে শুধু কল্পনা আর কাব্য-কাহিনী দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না। শিশু-সাহিত্যে জীবনকাহিনী, ভ্রমণকাহিনী, জ্ঞানবিজ্ঞানেরও স্থান আছে। কিন্তু এ-সকল যেন সাহিত্যের মন্দিরে আসন পায় শুধু সত্যের সৌন্দর্যে, ভাবের গভীরতায়, ভাষার লালিত্যে। বই মাত্রেই সাহিত্য নয়। ছেলেরা অ্যাড্‌ভেঞ্চারের গন্ধ পেলে, দিক্‌বিদিক্ ও ব্যাকরণ-জ্ঞানশূন্য হয়ে শ্মশানে-মশানে, ভূতের বাড়িতে, বর্মার জঙ্গলে, দামী স্যুট্ পরা ও ভুল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-ওয়ালা গোয়েন্দাদের পিছু পিছু ভক্তিশ্রদ্ধায় গদগদ হয়ে কেন ঘুরে বেড়ায়, সে বিষয় কিঞ্চিৎ গবেষণার প্রয়োজন। আসল কথা হল যে-কারণে আরেকটু কম বয়সে পরীদের অদ্ভুত কীর্তিস[illegible]নে মোহিত হয়ে যেত, এখন দশবারো বছর বয়সে সেই কারণেই দুগ্ধপোষ্য কাহিনীতে আর মন ওঠে না। তার চেয়ে আরও কঠিন পদার্থে এখন দন্তস্ফুট করবার ইচ্ছা হওয়াটা স্বাভাবিক বইকি।

সেইজন্য হাজার হাজার নীলকান্তমণির খোঁজে জীবন্ত ম্যমিরা, একচোখো

ভিখিরীরা, গভীর রাতে না খেয়ে না ঘুমিয়ে, যেখানে-সেখানে বিচরণ করে। অবশ্য তাদের যতই সন্দেহের চোখে নিরীক্ষণ করা যাক না কেন, আসল পাপিষ্ঠ হল গিয়ে মোটাসোটা অমায়িক পিসেমশাই, যাঁকে সকলে ছোটবেলা থেকে চেনে বলে আদৌ সন্দেহ করে না। গত পাঁচ বছরের শিশু-সাহিত্যের মধ্যে এই ধরনের গল্পের নিদারুণ প্রাধান্য। এরাই হল সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। কারণ এরা বালকের মনের কাছে চেনাশোনা, আইনমানা, পোষমানা, একঘেয়ে-কথা-শোনা, নিরাপদ জীবনযাত্রার মধ্যেও এমন রসের আস্বাদ এনে দেয় যা আর কোনো কিছুর মধ্যে পাওয়া যায় না। জোর করে এ ধরনের বই পড়া বন্ধ করে দেওয়া যায় না। তিক্ত অভিজ্ঞতা বলে, প্রকাশ্যে না পারলে গোপনে এ বিষয়ে চর্চা চলবে। একমাত্র উপায় এই তৃষ্ণা নিবারণের অন্য ব্যবস্থা করা। সস্তা খেলো গল্প, ভুল বৈজ্ঞানিক তথ্য, অশুদ্ধ ভাষা পরিহার করেও রোমাঞ্চ রহস্যের কাহিনী হয়। গত পাঁচ বছরের মধ্যে এমন একটিও বই প্রকাশিত হয়নি যা Treasure Island এর পাশে দাঁড়াতে পারে। অথচ এই বিষয় নিয়েই সেরা শিশু-সাহিত্য রচনা করা যেতে পারে।

জীবনকাহিনী, ভ্রমণকাহিনী, জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা দিয়েও এ-প্রয়োজন অনেকাংশে মেটানো যায়। তবে রসগ্রাহী রসিকগণ না হলে এ-কাজে হস্তক্ষেপ করা বিপজ্জনক। কিন্তু এ-ধরনের রচনা পরোক্ষভাবে মাষ্টারমশাইদের বিনা পয়সার অ্যাসিস্ট্যাণ্ট বলে, এদের দ্বিগুণ আদর হওয়া উচিত, এবং রচনার ভাষা চলিত ও বিষয় সহজ হলেও উভয়েরই নিখুঁত ও নির্ভুল হওয়ার আরও বেশী প্রয়োজন।

অনেক কিছু বলা হল, কিন্তু হাসির গল্পের ও কবিতার বিষয় বলা হল না। বিষয়টা শুনতে যত সহজ, কাজের বেলায় ততটা নয়। ছোটদের হাসানো বড়দের হাসানোর থেকে অনেক বেশী কঠিন ব্যাপার, কারণ ছোটদের রসবোধে বিস্তৃতি আছে কিন্তু গভীরতা নেই। হাসির কারণটাতে অনভ্যস্তের মোহ থাকা চাই, অপরিচয়ের মধু থাকা চাই, কিন্তু অতিশয় চাক্ষুষ ও প্রত্যক্ষ হওয়া চাই।

যাতে ভাবতে না হয়, দেখলে শুনলেই হাসি পায়। অর্থাৎ কাহিনীর মধ্যেই রস চাই, চ্যাটাং চ্যাটাং ভাষা চাই ; অদ্ভুত হওয়া চাই, কিন্তু চালাক হওয়া চাই না। গল্পের চরিত্ররা চালাক হলে ক্ষতি নেই। কিন্তু লেখকের নিজের বেশী চালাকী করতে যাওয়াটা অমার্জনীয় অপরাধ। তাতে পাঠকদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগে, সন্দেহ হয় বুঝি-বা তাদের নিয়েই মস্করা হচ্ছে। তাদের সঙ্গে মস্করা করা এক কথা, কিন্তু তাদের নিয়ে মস্করা অন্য ব্যাপার। ছোটদের সাহিত্যে আগাগোড়া এই নৈর্ব্যক্তিক ভাবটা রক্ষা করা হয় বলেই সে সহজে সেকেলে হয়ে যায় না। শিশু-সাহিত্যের জগতে বুদ্ধিমান পাঠক আর বুদ্ধিমান লেখক সমান মাপের জায়গা জুড়ে মনের আনন্দে বিচরণ করে। আর তাদের চারপাশ ঘিরে যতসব লোকজন, সম্ভব অসম্ভব প্রাণীরা আর জন্তু-জানোয়াররা—বিশেষ ক'রে জন্তুজানোয়াররা—সে যে কি কাণ্ড শুরু করে তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস নেই। যাদের চোখ খারাপ হয়ে গিয়েছে, তাদের একজোড়া করে রঙিন চশমা জোগাড় করতে হবে। নইলে তারা বছর দুই আগে প্রকাশিত, আমাদের অধ্যাপক শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার মহাশয়ের 'কালোর বই'-এর মানেই বুঝতে পারবে না, অর্থাৎ এ-দুটো বছর তাদের একেবারে ব্যর্থ হয়ে যাবে। কুকুরটা কেনই বা অমন ন্যাকা সেজে কালোর সঙ্গে সঙ্গে এল, আবার দুদিন বাদে কেনই বা জঙ্গলের দিকে টানল, আর টানলই যদি তবে ব্যাটা গেল নাই বা কেন, এসব তারা কেউ বুঝবে না।

এককথায়, শিশু-সাহিত্য বলে আলাদা কিছু থাক বা না থাক, শিশু-সাহিত্যের বিষয় বলে আলাদা করে রাখা কোনো কিছু নেই। সব বিষয়ই শিশু-সাহিত্যের বিষয় ; অর্থাৎ শিশুদের চোখ দিয়ে যা কিছু দেখা যায় সেই হল শিশু-সাহিত্যের বিষয়। বুড়োদের জগতের সব বিষয় হল শিশু-সাহিত্যের বিষয় ; তা ছাড়া আরও এমন অনেক জিনিসও শিশু-সাহিত্যের বিষয়—যাদের বুড়োদের জগতে হাজার খুঁজলেও পাওয়া যায় না, ঐ রঙিন চশমা নাকে না লাগাতে পারলে।

চলতি পাঁচ বছরের শিশু-সাহিত্য

নরেন্দ্র দেব

গত পাঁচ বছরের মধ্যে শিশু-সাহিত্য বিভাগে আমাদের বাংলার সারস্বত ভাণ্ডার কতটা পুষ্ট হয়েছে তার খবর বলতে পারবো না। কিন্তু কতটা দুষ্ট হয়েছে সে হিসাব দিতে পারবো।

আমার প্রথম অভিযোগই হচ্ছে, গত পাঁচ বছরের মধ্যে আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, ত্রৈলোক্যনাথ, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উপেন্দ্রকিশোর বা সুকুমার রায়ের মতো শিশু-সাহিত্যের যাদুকর কেউ আসেন নি। একমাত্র শ্রদ্ধেয় শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মহাশয় একা শিবরাত্রির সলতের মতো এখনও টিম টিম করছেন বটে, কিন্তু তাঁরও ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুরদাদার ঝোলা, কিম্বা ঠানদির থলে ঝেড়ে ঝুড়ে গুঁড়োগাঁড়া আর কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। শিশু-সাহিত্যের ওস্তাদ ছান্দসিক বন্ধুবর সুনির্মল বসুরও আর নূতন কিছু ছন্দের টুং টাং শোনা যাচ্ছে না। শিশু-সাহিত্যের অদ্বিতীয় Thriller শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় মহাশয়ের প্রতিভার অনুকরণে এখন অনেকেই শিশু-সাহিত্যের বাগবাজারে ভীড় লাগিয়ে দিয়েছেন। 'যখের ধন' নিয়ে আজও কাড়াকাড়ি চলেছে। শুধু বাংলাদেশের দু'খানি বড় বড় দৈনিকপত্র তার বিশেষ পৃষ্ঠায় ভর করে ছেলেমেয়েদের সাহিত্যের আসর—খেলাধুলা, শিক্ষা, সেবা ও আমোদ-প্রমোদের সাড়ে-বত্রিশ-ভাজায় জমিয়ে রেখেছেন।

হালের পাঁচ বছরের মধ্যে শিশু-সাহিত্যে যে পরিমাণ ভূরি ভূরি গোয়েন্দা

কাহিনী, এ্যাড্‌ভেঞ্চারের গল্প, রোমান্স, থ্রিল, রাক্ষস খোক্কস, ভূত পেত্নী প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব দেখা যায় আগে তা ছিল না। এখন, ডজনখানেকেরও বেশি শিশুদের জন্য মাসিকপত্র, অর্ধডজন 'পূজাবার্ষিকী' ইত্যাদি বেরুচ্ছে। এ ছাড়া আবার বড়দের মাসিকপত্রেও ছোটদের জন্য কয়েকটা করে পৃষ্ঠা আর দৈনিক সংবাদপত্রগুলিতেও সাপ্তাহিক একটি করে ছেলেমেয়েদের পাতা থাকছে। দুঃখের বিষয় এর মধ্যে কোনটাই কিন্তু শিশু-সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধির প্রয়োজনে, অথবা শিশু-শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য নিয়ে, কিম্বা ভবিষ্যৎ জাতি-গঠনের সাধু সংকল্প নিয়ে আবির্ভূত হয়নি। এই সবগুলির মূলেই ছিল বা আছে কোনও বড় আদর্শ নয়, নিছক ব্যবসাদারী মনোবৃত্তি। অর্থাৎ শিশু-সাহিত্যের বাজারে কেতাবীয় বেসাতি ক'রে কিছু উপার্জন করা। সেই চিরন্তন demand আর supply এর প্রশ্ন। প্রকাশকেরা দেখলেন, বাজারে ছেলেদের বইয়ের চাহিদা খুব, কিন্তু মালের অভাব। শুরু হয়ে গেল যা'কে তা'কে ধ'রে ছেলেদের বই লিখিয়ে নিয়ে বার করা। প্রবন্ধ রচয়িতা স্বয়ং সেইদলেরই একজন। কথাটা খুবই অপ্রিয় বটে, কিন্তু নির্মম সত্য! এবং এইজন্যই আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রে 'ছেলেমেদের জন্য' লেবেল এঁটে যে-সব ঝুড়ি ঝুড়ি বই ঠ্যালাগাড়ী বোঝাই হয়ে এসে জড়ো হ'চ্ছে তার মধ্যে অধিকাংশই শিশু-সাহিত্য পদবাচ্য নয়, এমনকি সুকুমারমতি ছেলেমেয়েদের তা অপাঠ্যই বলা যেতে পারে। দুঃখের বিষয় যে প্রকৃত শিশু-সাহিত্যিক বলা যেতে পারে এমন একজনও বিষ্ণুশর্মা বা হানস্‌ এ্যাণ্ডার্সেন আমাদের দেশে গত পাঁচ বছরের মধ্যে উদয় হন নি।

একটা কথা আমি এখানে জানতে চাই। ছেলেমেয়েদের জন্য বিশেষভাবে সম্পাদিত ও মুদ্রিত ডজনখানেক মাসিকপত্র এবং আড়াই শো আন্দাজ হাতে লেখা পত্রিকা এদেশে থাকতেও আবার বড়দের মাসিকপত্রে গোটাকয়েক ক'রে ছোটদের পৃষ্ঠা জুড়ে দেওয়া হয় কেন? ছেলেরা কি তাদের জন্য নির্দিষ্ট পাতাগুলি পড়া শেষ করে মাসিক পত্রখানির অন্য পৃষ্ঠাগুলি আর

ওলটাবে না? যে:হেতু, ওগুলো পড়া তাদের পক্ষে নিষিদ্ধ? এটা কিন্তু আমাদের মস্ত বড় ভুল ধারণা।

শিশুদের মনস্তত্ত্ব আলোচনা করলে দেখা যায় যেখানে রাজপুরীর দক্ষিণের দ্বার খুলে দেখা নিষেধ থাকে, তাদের সেই নিষিদ্ধ কাজটাই করবার ঝোঁক হয় সবচেয়ে বেশি! সুতরাং যে-সব লেখা তাদের জন্য নয়, বা যেগুলো পড়া তাদের পক্ষে অনুচিত, সেই নিষিদ্ধ 'এরোটিক' ও অবৈধ প্রেমের গল্পগুলোও তারা বেশ নিয়মিত পড়ে এবং বারো তেরো বছরেই এঁচড়ে পেকে ওঠে।

অনেকে হয়ত বলবেন: ওসব যারা পড়বে মশাই, তারা গোপনে অভি-ভাবকদের লুকিয়ে "চুম্বনে খুন" জাতীয় বটতলার উপন্যাসও সংগ্রহ করে পড়বে! স্বীকার করি তা 'হয়তো' কেউ কেউ পড়বে, তা'বলে, নির্বিচারে সকলের হাতের মুঠোর মধ্যে নিষিদ্ধ পাঠ্য পরিবেশন করা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় বলা চলে না। সংগ্রহ করা ও লুকিয়ে পড়ার সুযোগ তো আর সব ছেলেরাই পায় না! দৈনিক সংবাদপত্রগুলির সাপ্তাহিক শিশু মনোরঞ্জনের সাধু প্রচেষ্টাও তরলমতি ছেলেমেয়েদের পক্ষে সমান ক্ষতিকর বলে মনে করি। কারণ, তারা সবাই ছোটদের পাতাটি পড়া শেষ করেই 'খেলাধুলার' পাতাটি ধরে তারপরেই আইন আদালতে গিয়ে উঠে। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, প্রতারণা, স্ত্রী-লোককে ফুসলাইয়া লইয়া যাওয়া, মেয়েদের শ্লীলতা হানি, বলপূর্বক নারীহরণ, এমন কি শেষ পর্যন্ত বলাৎকার ও পাশবিক অত্যাচারের মধ্যেও গিয়ে পড়ে!

সুতরাং, বড়দের মাসিক পত্রে ছোটদের পাতা আর এই খবরের কাগজ-ওয়ালাদের শিশু-চরানো ব্যবসাটি দেশের শাসকবর্গের উচিত আইন ক'রে বন্ধ ক'রে দেওয়া। আর সেই সঙ্গে 'মোহন সিরিজ' জাতীয় ছেলেদের গোয়েন্দা কাহিনীগুলোও। তাতে আশা করা যায় 'জুভেনাইল ক্রাইম' অনেকটা কমবে এবং রিফর্মেটরি স্কুলের কাজও অনেকটা হালকা হ'য়ে যাবে। বড় বড় ডিপার্টমেণ্টাল ষ্টোরে বা দোকানে একটা ক'রে 'শিশুবিভাগ' থাকে। তার একটা সার্থকতা আছে বুঝতে পারি। মায়েরা দোকান ক'রতে বেরিয়ে

ছেলেদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে আনবার সুযোগ পান। কিন্তু কাগজওয়ালারা ছেলেমেয়েদের নাম ক'রে এ-দোকানদারী করেন কেন, এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে আমরা বলতে বাধ্য হব, তাঁরা এর কুফল সম্বন্ধে ভেবে দেখেন নি ব'লে। ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি অনেক স্থলে মানুষের সংবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। নইলে, এ-কাজে দেশের ছেলেমেয়েদের মঙ্গলের চেয়ে অকল্যাণের দিকটাই যে ভারি হ'য়ে উঠছে এটা তাঁরা বুঝতে পারতেন। দেশের ছেলে-মেয়েদের মঙ্গলই যদি এই সব কাগজওয়ালাদের নিঃস্বার্থ শুভেচ্ছা হ'ত, তাহ'লে তাঁরা প্রতি সপ্তাহে একখানি ক'রে ছোট আকারের আট পৃষ্ঠা বা ষোলো পৃষ্ঠার 'শিশু-সাপ্তাহিক' দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য অনায়াসে পৃথকভাবে প্রকাশ করতে পারতেন। তাতে ব্যবসায়ের দিক দিয়েও তাঁরা অধিকতর লাভবান হতেন বলেই মনে করি। সংবাদপত্রের নানা আপত্তিজনক অংশের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের পাঠ্যাংশ জড়িয়ে না-রাখলে তাঁদের এই অনিচ্ছাকৃত 'শিশুপালবধ'ও বন্ধ হ'তে পারতো।

এইবার আমি আপত্তি জানাতে চাই ছেলেমেয়েদের কাছে ভূত-পেত্নীর ভয়াবহ গল্প পরিবেশনে। ওসব গল্প দিনের বেলা পড়তে বেশ ভাল লাগে স্বীকার করি, যদি না রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে তার স্বপ্ন দেখে আঁৎকে উঠতে হয়। আর, রাত্রে ঘরের ভিতর আলো জেলে বসে পড়লেও সকলের একটু গা ছম্ ছম্ করে, এবং তারপর ঘর থেকে আর বাইরের অন্ধকারে বেরুনো অসম্ভব হ'য়ে পড়ে। এর শোচনীয় কুফল দেখতে পাওয়া যায় অনেক ছেলেমেয়ের উত্তর-জীবনেও। বিবাহিত যুবকেরাও রাত্রে বাথরুমে যাবার প্রয়োজন হ'লে নিদ্রিতা পত্নীকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে আলো ধরে দাঁড়াতে বলেন! একলা বাইরে যেতে নাকি ভদ্রলোকের ভয় করে! স্বাধীন ভারতের ভাবীকালের যুবকদের এ লজ্জা থেকে পরিত্রাণ করা দেশবাসীর উচিত বলে মনে করি। ছেলেদের মনোরঞ্জনের আরও তো নানা বিষয় আছে। ভূত-পেত্নীগুলোকে শিশু-সাহিত্যের আসরে নাই তাঁরা ছাড়লেম! দুর্দান্ত চোর ডাকাত খুনেদের

নৃশংসতার গল্পও ছেলেদের হাতে দেওয়া উচিত বলে মনে করি না। একটি সত্যঘটনা বলি শুনুন। একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সপরিবারে দেওঘরে বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁদের বাংলোখানি শহরের একটেরে বেশ ফাঁকা জায়গায়। দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁদের বাড়ীতে, একরাত্রে চোর এসে ঢুকেছিল। তাঁদের উপযুক্ত পুত্র সেই অবাঞ্ছিত অতিথির আগমন জানতে পেরে ঘরের দোরজানালা বন্ধ ক'রে পরিত্রাহি চিৎকার শুরু করেন—'চোর'! 'চোর'! বলে। কিন্তু, সে মাঠের মাঝখানে ফাঁকা বাড়ী, কে শুনবে সে আওয়াজ? পাশের ঘরে নিদ্রিত বাপের কানে সেই আর্তস্বর পৌছোতেই ভদ্রলোকে সস্ত্রীক খাটের নিচে গিয়ে প্রবেশ করেন এবং লেপ মুড়ি দিয়ে নিঃশব্দে পড়ে থাকেন। চোর জানালা ভেঙে তাঁরই ঘরে এসে ঢুকলো। টর্চের আলোয় শয্যায় কেউ নেই দেখে নিশ্চিন্ত মনে তাঁর যথাসর্বস্ব চুরি ক'রে নিয়ে গেল। তিনি খাটের নিচে থেকে নিরুপায়ের মতো শুধু মিট মিট করে চেয়ে দেখলেন। পাশের ঘরে চিৎকার-রত ছেলের কাছে বন্দুক ছিল। কিন্তু ব্যবহার করবে কে? চোরের ভয়ে ছেলের তখন থরহরি হৃৎকম্প!

তাই বলছিলুম, দুঃসাহসী যত চোর ডাকাতের নৃশংস অত্যাচারের গল্প,—যেমন, গৃহস্থের বাড়ী ঢুকে কর্তাকে জ্বলন্ত মশালের ছ্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়ে সিন্দুকের চাবি বার করে নেওয়া, বাড়ীর গিন্নী ও বৌ-ঝিয়ের গা থেকে জোর করে গয়না-গাঁটি ছিনিয়ে কেড়ে নেওয়া, এমন কি মাকড়ি বা কানবালার লোভে কান দু'টোকে ছিঁড়ে নেওয়া, নাকছাবির জন্য নাক কেটে ফেলা—এসব শিশু-সাহিত্যের ভোজে ছেলেমেয়েদের পাতে পরিবেশন না করাই বোধ হয় ভাল। কিন্তু এসব কথা শুনবেন কারা? অপরাধীরা বলেন, এসব বই বাজারে বিক্রী হয় বেশী। ছেলেমেয়েরা চায় এই সব রোমাঞ্চকর ও হৃদ্‌স্পন্দন দ্রুত ক'রে তোলা গল্পই পড়তে। আমি তা অবিশ্বাস করি না। আমাদের দেশের লোক পয়সা খরচ করে থিয়েটারে বায়োস্কোপে যান—'সীতার পাতালপ্রবেশ' আর 'অভিমন্যু বধ' অভিনয় দেখে কেঁদে ভাসিয়ে দিতে। তাঁদের ছেলেমেয়েরা যে

একটু ভয়াল ভীষণতার thrill enjoy করবার জন্য এহেন সাংঘাতিক বইগুলিই পড়তে চাইবে এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু ব্যবসার খাতিরে ছেলেমেয়েদের কাঁচা মনে কচি বয়স থেকেই একটা ভয়ের ছাপ এঁকে দিয়ে জাতটিকে ভীরু করে তোলা কি ভাল? অথচ হালের পাঁচ বছরের মধ্যে শিশু-সাহিত্যে সবচেয়ে সংখ্যায় বেশি বেরিয়েছে যে বইগুলি তা সমস্তই হচ্ছে এই জাতীয়। শিশু সাহিত্যের কেউ কেউ পিসিমাগোছের অভিভাবিকা আছেন, যাঁরা ছেলেমেয়েদের চিবুক ধ'রে আদর ক'রে বলেন—আহা ষাটু! ষাটু! তা হোক। তা ব'লে, বাছারা একটু thrill enjoy করবে না? একেই তো দুধ ঘি মাছ মাংস খেতে পায় না, একটু মুখরোচক Sensational Story পড়ার উত্তেজনা ও আনন্দ থেকেও তাদের বঞ্চিত রাখবো? আরে না না, তাকি হয়?

সেই সব 'ভুবনের মাসি পিসিদের' কল্যাণে শিশু-সাহিত্যে এই ধরনের জঞ্জাল বেড়েই চলেছে। তাঁরা বোঝেন না যে এগুলো মুখরোচক হ'লেও ভেজাল জিনিস। ছেলেমেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। যাইহোক, অন্ধকারে আশার আলোর মতো এই পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা শিশু-সাহিত্যে কয়েকটি শ্রেষ্ঠ 'জীবনী' পেয়েছি, ভ্রমণকাহিনী পেয়েছি, রূপকথা, ইতিহাস ও পুরাণের গল্প, আবিষ্কারের কথা, সাধারণ জ্ঞান, এবং বিদেশী শিশু-সাহিত্যের কয়েকখানি উৎকৃষ্ট বইয়ের বাংলা অনুবাদও বেরিয়ে শিশু-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছে। এটা নিঃসন্দেহ আমাদের গৌরবের কথা। শিশুদের জন্য ভাল ভাল বইও পাওয়া গেছে এই পাঁচ বছরে নিতান্ত কম নয়। সুতরাং হতাশ হবার কিছুই নেই।

আমি একজন আশাবাদী। আমি বিশ্বাস করি, আগামী দিনের শিশু-সাহিত্যে বাংলার দান ভারতের আদর্শ হয়ে উঠবে। দেশের ছেলেমেয়েদের মানুষ ক'রে গড়ে তুলতে হ'লে সাহিত্য, শিল্প ও ছায়া-ছবির দ্বারা যে বিশেষ কাজ পাওয়া যায় একথা বলাই বাহুল্য। সাহিত্যের শক্তি আশ্চর্য। সাহিত্য

অনেক দেশে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়াছে, অনেক জাতকে ভেঙে গড়েছে। জাতির মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে, তার দৃষ্টিভঙ্গীর দিক ফেরাতে, সাহিত্যের মতো প্রভাবশালী প্রহরণ আর কিছু নেই বলা যায়। আমাদের জাতকে তৈরি করতে হলে দেশের ছেলেমেয়েদের নিয়েই কাজ করতে হবে। ছেলের বাপ-খুড়োদের উপর আর কোনও আশা-ভরসা নেই। তাঁরা যুদ্ধের ফাঁপা বাজারে এবং তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়ায় একেবারে উচ্ছন্নয় গেছেন। ধর্ম, ন্যায়, সত্য এবং বিশ্বাস থেকে তাঁরা আজ বিচ্যুত। আমার অনেক সময় মনে হয়, আমাদের দেশে আজ children's magazine-এর চেয়ে parents' magazine-এর প্রয়োজনই বেশী। অর্থাৎ, যে পত্রিকায় থাকবে—কেমন ক'রে বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের মানুষ করতে হবে। অবাধ্য ছেলেদের কিভাবে শাসন ও সংযত করতে হবে। তাদের চরিত্র গঠন করতে হলে সর্বাগ্রে নিজেদের সচ্চরিত্র হতে হবে। কোন বয়সে তাদের কী খাওয়া, কী খেলা এবং কী শেখা দরকার। লেখাপড়ায় কি ভাবে তাদের মন বসাতে হবে, এগুলো তাতে থাকা চাই; কারণ, আমাদের দেশের বাপ-মা'য়েরা অধিকাংশই এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ। বাপ মা'য়েরা আমাকে মাপ করবেন। আমিও তাঁদেরই দলের একজন।

'শিশুসাহিত্য পরিষদ' নামে একটি মৃতপ্রায় প্রতিষ্ঠান আছে কলকাতায়। কিছুদিন আগে তাঁরা এ বিষয়ে অগ্রণী হয়েছিলেন। "আমাদের ছেলে মেয়ে" নাম দিয়ে তাঁরা একখানি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন অভিভাবকদের চক্ষুরুন্মীলনের জন্য। কিন্তু, বাংলাদেশের অধিকাংশ প্রতিষ্ঠানেরই চিরন্তন অর্থাভাবের যে করুণ কাহিনী, এঁরাও সে-রোগে মুমূর্ষুপ্রায়। গত পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁরা মাত্র দু'টি সংখ্যা এই পত্রিকা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। 'শিশুরাই দেশের ভবিষ্যৎ' এ কথাটা আমরা ভুলে গেছি, কাজেই আমাদের কংগ্রেস সরকারও এটা বেমালুম ভুলে বসে আছেন। শিশুদের অকালমৃত্যুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা, তাদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে তাদের মানুষ ক'রে গড়ে তোলবার চেষ্টা কোনো পক্ষেরই নেই। ভারতবর্ষের শিশুরা

যেন অনাথের মতো অদৃষ্টের মুখাপেক্ষী হ'য়ে বেড়ে উঠছে। সুস্থ সবল দেহ নিয়ে বেঁচে থাকে ক'জন? মানুষ হচ্ছে খুবই কম। অমানুষই হচ্ছে বেশী।

আমাদের শিক্ষক ও অভিভাবকেরাও এ জন্য অনেকখানি দায়ী। জীবনে নিজেকে অন্য কোনও কঠিন কাজের অযোগ্য জেনে যাঁরা শিক্ষকতাটাকেই সহজসাধ্য বুঝে প্রাণধারণের পেশারূপে গ্রহণ করেছেন তাঁদের এই শিক্ষার ব্যাপারে অশিক্ষিতপটুত্ব এবং উপার্জনের দিক থেকেও যৎসামান্য আয়ের ফলে আয় বৃদ্ধির জন্য বিষয়ান্তরে মনোনিবেশের জন্য মারা পড়ছে মাঝখান থেকে ছেলেরাই। অভিভাবকেরা মনে করেন, ছেলেকে স্কুলে ভর্তি ক'রে দেওয়াতেই তাঁদের কর্তব্য শেষ হয়েছে। কিন্তু স্কুলে থাকে ছেলেরা কতক্ষণ? পাঁচ ছ' ঘণ্টার বেশী নয়। বাকি সময়টা সে থাকে হয় বাড়ীতে, নয় পাড়াপড়শীর সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে। সুতরাং বাড়ীর আবহাওয়া যদি ভাল না হয়, অভিভাবকেরা যদি সৎ ও ভদ্র না হন, শিক্ষকেরা যদি কর্তব্যনিষ্ঠ না হন, স্কুল তাদের সৎ ও ভদ্র ক'রে তুলতে পারবে না। শিক্ষিত হয়ে ওঠা নির্ভর করে এই উভয় পক্ষের পরস্পর সহযোগিতার উপর। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, এদেশের অভিভাবকেরা অধিকাংশই এ বিষয়ে উদাসীন।

বয়স অনুসারে ছেলেমেয়েদের মনস্তত্ত্ব অনুশীলন ক'রে তাদের বিভিন্ন বয়সে পাঠের উপযোগী বিষয়বস্তুর একটা নির্দিষ্ট 'সিলেবাস' ঠিক করেছেন ওদেশের শিক্ষাব্রতী পণ্ডিতেরা। পাঠশালা ও স্কুলের কর্তৃপক্ষ এবং ছেলে-মেয়েদের অভিভাবকেরা সেই ক্যারিক্যুলাম মেনে চললে এবং শিশু-সাহিত্যিকেরা তদনুসারে ছোটদের জন্য গ্রন্থরচনায় মনোযোগী হলে তবেই আমাদের শিশুসাহিত্য সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠতে পারবে। ছেলেমেয়েদের জন্মদিনে, উপনয়নে, পরীক্ষায় বা খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় সুফল অর্জনের জন্য পুরস্কার হিসাবে, এমন কি পুজাপার্বণে উপহার দেবার সময়—কি বই তাদের দেওয়া যেতে পারে আমরা ভেবে পাই না। চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে ছবিওয়ালা মলাট দেখে হয়ত' এমন বই কিনে এনে দিলাম যা আবর্জনায় ভরা। এর

কারণ, আমাদের শিশুসাহিত্য কোনও বৈজ্ঞানিক ধারা অনুসরণে প্রসারলাভ করেনি। লেখকের খেয়ালখুশি, প্রকাশকের ফরমাশ এবং বেশী কাটতি হবার সম্ভাবনা—বইয়ের বাজারের এই তিনটি সূত্র ধরেই গত পাঁচ বছরের শিশুসাহিত্য বেড়ে উঠেছে অবাধে আগাছার মতো। আজকাল আবার বয়ঃপ্রাপ্তদের জন্য লেখা জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির সংক্ষিপ্ত সংস্করণ বাজারে ছেয়ে গেছে। গত পাঁচ বছরে বোধকরি একমাত্র ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর আর বটতলার "উদাসিনী রাজকন্যার গুপ্তকথা" ছাড়া আর কোনও বই-ই ছেলে-মেয়েদের জন্য সংক্ষেপিত হ'তে বাকি নেই! আর বাকি আছে শুধু 'বসুমতী সাহিত্যমন্দির' থেকে শিশুসাহিত্যিকদের গ্রন্থাবলীর ঝাঁকে ঝাঁকে প্রকাশ।

সাহিত্যে শিশুর সৃষ্টি

চিত্তরঞ্জন দেব

রবীন্দ্রনাথ বলতেন, মানুষের যেমন শিশু, সাহিত্যের তেমনি ছড়া। সাহিত্য-সৃষ্টির আদিতে এই ছড়া। বাংলাদেশের ছেলেভুলনো ছড়া নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছেন নানাখানে। পুরনো দিন ফিরে আসে না; নূতন ছড়া তৈরি করবার চেষ্টা নূতন লোক করেন কিন্তু তাতে পুরনো সে-ভাব থাকে না। এর কারণও আছে। এখনকার ছড়া বেরয় কলমের মুখে। মন থেকেই খাতার পাতায় তার ঠাঁই। তারপর ছাপাখানায়। তারপর বইএর ভিতরে হয়ে দেশ ছেড়ে দেশান্তরে। সৃষ্টির ধারা চলছে—কিন্তু ধরন বদলাচ্ছে। একদিন কে বলেছিল—

"তাই তাই তাই
মামার বাড়ি যাই
মামার বাড়ি ভারি মজা
কিল চড় নাই।"

কেন বলেছিল তা শুনেই আন্দাজ করা চলে। এ'টি বিশেষ করে সে-কালের শিশুর মনের কথা। তার সঙ্গে এ-কালের শিশুর তুলনা করি একটি চিঠির ভাষা দিয়ে:

"বাবা, কলকাতায় আমি থাকব না
এখানে ঝমঝমে বৃষ্টি

থমথমে বাড়ি
ভিজে ভিজে জামা আর
ভিজে ভিজে শাড়ি...
আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও।"

শান্তিনিকেতনে বেড়ে-ওঠা সাত বছরের মেয়ে বেড়াতে গিয়েছিল কলকাতায়। সেখান থেকে এই চিঠি। কলকাতার একটা মোটামুটি ছবি ধরা পড়লো তার মনের পর্দায়। একখানি চিঠি লিখতে গিয়ে কত যত্ন তার ভাবনার। সাহিত্যে সুন্দরেরই আমন্ত্রণ। শিশুও সে-আমন্ত্রণে যোগ দিতে আসে। শান্তিনিকেতনের 'সাহিত্যসভা' এ-বিষয়ে সহায়তা করে।

ব্যাকরণ জানে না শিশু ছন্দের, তবু ছন্দে কথা তৈরির চেষ্টা করে। কবিতা রচনা করতে শেখে :

"এক বনে ছিল এক শালিখ
সে ছিল বনের মালিক
শালিখ গাছে উঠে পাড়ত অনেক ফল
তার পায়ে ছিল দুটো মল
বনের পাশে ছিল নদীভরা জল
জলগুলো সব করত টলমল।"

ছন্দের পথে পা বাড়িয়ে তার যেন সাক্ষাৎ হয় মিলের সঙ্গেই প্রথমে। ছন্দপতন বুঝতে পারে না, কিন্তু মিল অমিল ধরার শক্তি আছে শিশুরও।

'জল পড়ে পাতা নড়ে' পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ যেন কী পেয়েছিলেন মনের মধ্যে। এমনি একটু ছোঁয়া সকল শিশুই পায় জীবনের কোনো এক ক্ষণে। সেই ক্ষণটি যার জীবনে যত বেশি বাঁচে—সাহিত্যে তার রুচি ও রচনা তত বাড়ে।

বইয়ে শিশু যা পড়তে পায়, তা মিলিয়ে নিতে চায় চোখের দেখায়। চারপাশের প্রকৃতি থেকে আহরণ করে কত কিছু। মনেপ্রাণে চেতনায় যখন কোনো বিশেষ স্পর্শ লাভ করে—তা ধরে রাখে নিজের রচনায়। কিন্তু ছন্দেই ধরা চাই :

"বসন্তকাল এলে পরে আমের মুকুল ফোটে
হু হু করে গন্ধ তাহার চারদিকেতে ছোটে…"

মুকুল থেকে আম। তারপর ঝড়ে আম পড়ে। শিশু কুড়িয়ে আনে। মাকে তখন ভোলে না। নিজের উপার্জন মার হাতে এনে দেয়। দিয়ে বলে,

"…আজ রাঁধ মা, আম-দেওয়া টক ডাল
মা বলেন, আজ নয়রে, রাঁধব না হয় কাল।"

আরেকটি শিশু ভাবে :

"আমি যখন বড় হব
থাকব না আর বালক
তখন আমি হবই হব
এরোপ্লেনের চালক।
আমি অনেক দূরে
যাব পাখীর মত উড়ে
নাই যদিও ডানা আমার
নাই যদিও পালক।"

একেবারে অলীক কল্পনা নয়। রূপকথার রাজপুত্রের মতো কল্পলোকে বিচরণের অপেক্ষা এ-শিশু করে না।

একটি শিশুর ধারণা—রসগোল্লা গাছেরই ফল। তার দাদার (সে-ও শিশু) কাছে এটা খুব আশ্চর্যের। তাই নিয়ে সে রচনা করে 'রসগোল্লার গাছ' :

"মার তখন রসগোল্লা তৈরি করা হয়ে গেছে। মা আমাদের সবাইকে একটা করে রসগোল্লা দিলেন আর গৌতমকে দিলেন দুটো। ও একটা রসগোল্লা ঘরের কোণে পুঁতে ফেলল।"

ছেলের কাণ্ড দেখে বাবা বললেন,

"গাছটা বড় হলে কেমন করে রসগোল্লা পাড়বে?"

গৌতম উত্তর করল,

"লাঠি দিয়ে পাড়ব আর নিচে একটা বাটি রেখে দেব। বিকেলে খেলতে যাবার সময় একটা করে রসগোল্লা তুলে নিয়ে যাব।"

এই রসগোল্লা নিয়ে গৌতমের ভাবনার অন্ত নেই। কত কথাই সে ভাবে, মাঝে মাঝে দু'একটা কথা তার বাবাকে জিজ্ঞেসও করে:

"রসগোল্লার কুঁড়ি কেমন হয়, ফুল কেমন হয়?"

বাবা বলেন,

"রসগোল্লার কুঁড়িও হয় না ফুলও হয় না, গোটা গোটা রসগোল্লাই হয়।"

ছোটো ভাই-এর খেলাকৌতুক চুপি চুপি লক্ষ্য করে তার দাদা। সে যেমন দেখে খুশি হয়, অবাক হয়, তেমনি খুশি করতে চায়, অবাক করতে চায় অন্যকেও—তার ভাই-এর কথা জানিয়ে। নিজের আনন্দ সে পরিবেশন করল সাহিত্যে—সেখান থেকেই আমরাও তার ভাগ পেলাম। কত ছোটো ঘটনা ভর করে কত বড় আনন্দের সৃষ্টি হয় সংসারে—একথা ভাবলেও মনের বোঝা মানুষের হাল্‌কা হতে পারে।

বাইরের অভিজ্ঞতাও বর্ণনা করে শিশু নিজের ভাষায়:

"পঞ্চ পাণ্ডব, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ প্রভৃতি নাকি এখানে মন্দির তৈরি করে গেছেন।...আমরা মন্দিরে এসে পৌছলাম। মন্দিরের সামনে একটা বিরাট পুকুর। সেটার নাম দুধ-দিঘি। তাকিয়ে দেখলাম দুধের ছিটেফোঁটাও নেই।"

ভুবনেশ্বর থেকে বেড়িয়ে এসে লিখছে সে এ-সব কথা। দুধ দুধদিঘিতে হতে পারে না—তা এ-কালের শিশুর অজানা নয়। তবু দিঘিটা এতদিন চোখের আড়ালে ছিল। মনে সেটা স্বপ্নের মতো। সে স্বপ্ন তার ভাঙলো। কথা-কিংবদন্তীর উপর একটা অনাস্থা এসে দখল করল তার মন। এখন থেকে কিছুই সে আর না-দেখলে বিশ্বাস করবে না। বিজ্ঞানের যুগে এটা যে শিশুর সত্যানুসন্ধানেরই চেষ্টা। সত্যে এর সঙ্গে পরিচয় অনেকের হল শিশুর এই রচনাটুকুর দৌলতে।

ঝড়ের ছবি শিশুর কলমে :

"গুরু গুরু ডাকছে মেঘ
হচ্ছে ভীষণ ঝড়
ভয়েতে গাছগুলি সব
কাঁপছে থর থর।"...

ভয় শুধু কি গাছের পেয়েছে? তার নিজের মনেও কাঁপুনি ধরেছে। সেই কম্পনের দোলায় দেখছে সে :

"আকাশেতে মেঘ চলেছে ভেসে
এমন সময় বৃষ্টি এলো
ঝম্‌ঝমিয়ে ঝেঁপে"...

এখানেই শেষ হল না। বলবার কথা আরও আছে :

"সারা বাগান ছেয়ে গেল
আম যে শত শত
ছেলের দল জুটল এসে
যেখানে ছিল যত"...

দূর থেকে সে দেখছে। সামনে অনেক সমবয়সীর ভিড়। তার ইচ্ছে সেও গিয়ে দলে জোটে। তাই গেলও :

"আমিও ছুটে গেলাম
তাদের কাছে"...

কিন্তু গিয়েও সুখ হল না। মনে রয়ে গেছে আরেক দুর্ভাবনা—মা-বাবার রাঙা চোখ ভেসে উঠলো তার চোখে। তাই :

"তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলাম
বকুনি খাই পাছে।"

যে কথাটা না বললেও চলত, সেটাও সে বলে ফেলল। গাছের ভয় ঝড়কে আর শিশুর ভয় ঘরকে।

বর্ষার কবিতায় শিশুর ছন্দ :

মেঘলা দিন
তা ধিন্ ধিন্
বৃষ্টি পড়ছে জোরে

চাষার আজ
অনেক কাজ
জোরসে মাটি খোঁড়ে...

ঘটনা কিছুই নয়। সকলেই এ-কথা জানে, এ দৃশ্য দেখে। কিন্তু এর থেকে ছন্দ খুঁজে নেবার কৌশল সকলের জানা নেই। কথা আর খবর মানুষ সহজে ভোলে। ভুলতে পারেনা কবিতা। কবিতায় যে জাদু বড় বড় কবিরা দিয়ে গিয়েছেন, ছোটরাও তা দেবার চেষ্টা করে :

"ডাকছে মেঘ
সঙ্গে ভেক
দুয়েই ধরে তান..."

ছোট্ট কথাগুলি। কিন্তু বড় ভাবনায় ধরা। আকাশ আর মৃত্তিকায় একটি অখণ্ড গানের ধ্বনি। সে ধ্বনি শিশুর কানেও পৌছয়। এমন সময়ে তার নিজের অবস্থাটা কি তারও আভাস পাওয়া যায় :

"লেপের তলে
কেউ-বা বলে
মোরাও জানি গান।"

প্রকৃতি প্রভাব বিস্তার করে শিশুর জীবনে। বিশেষতঃ এই বর্ষার এমন ছেলেভুলনো গুণ আছে যাতে শিশুর দৃষ্টিতে বর্ষা হয়ে ওঠে রমণীয়। শুধু পদ্যে নয়, গদ্যেও বর্ষার বর্ণনা পাই শিশুর লেখায় :

"...যখন মেঘটা পশ্চিম থেকে উঠে সমস্ত আকাশময় ছড়িয়ে পড়ে, তখন পৃথিবীর উপর একটা ছায়া নামে। ঘাসপাতাগুলো-ত সবুজই থাকে। তার উপরে মেঘের রঙ পড়ে আরও সবুজ দেখায়। আর ঠাণ্ডা বাতাসে সেগুলো দুলতে থাকে। তারপর বৃষ্টি ক্রমশ টপটপ থেকে ঝরঝর করে আরম্ভ হবার খানিক পরেই খোয়াই দিয়ে লালজল ছুটে যায়। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে থাকি।"

নিজে সে কি করলো—সে কথাটা বেরবার জন্য পথ খুঁজে বেড়ায় সব সময় তার রচনায়। বলবার যা ইচ্ছে—সেটি বলতে পারলেই তার আনন্দ। এই আনন্দেই থাকে তার সৃষ্টির ইশারা। যে দিন পড়ে থাকে পিছনে, শিশু তাকে সামনে এনে দেখে কখনও :

"বর্ষার সময় যখন তেজেশদার বাড়ির পাশের পুকুরের জল কানায় কানায় ভরে উঠত তখন প্রায়ই তেজেশদা পুকুরধারে তালগাছের নিচে ক্লাশ নিতেন। তখন দেখতাম দুটি ছোট্ট পাখি পুকুরে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে কিম্বা ঐ পারের ঐ তিন-পাহাড়ের উপর বুড়ো বটের ডালে বসে দোল খাচ্ছে।"

তারপর যখন এই পাখিরা উড়ে চলে গেল, শিশু তখন বলছে,

"একদিন আমরাও ঐ পাখিদের মতনই, তেজেশদার ক্লাশ ছেড়ে উঁচু ক্লাশে উঠলাম।...এখনও তেজেশদা তাঁর সেই তালগাছের বাড়িতেই আছেন। কিন্তু আমাদের সঙ্গে তাঁর আর তেমন যোগ নেই।"

'বনমালীর মেয়ে'র সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয় একটি শিশু :

"হলুদ রঙের ঘাসের ফুলে
মাঠ গিয়েছে ছেয়ে

যাচ্ছে গাঁয়ের পথটি ধরে
বনমালীর মেয়ে।
কালো কালো ঘন চুলে
সাজ করেছে আজব ফুলে
হাওয়ায় শাড়ির আঁচল দোলে
চলতে এ-পথ বেয়ে।
প্রজাপতি উড়ে বেড়ায়
রঙীন ফুলে ফুলে
কাশের বনে নাচন লাগে
হাওয়ায় দুলে দুলে
বনমালীর ছোট্ট মেয়ে
অবাক চোখে দেখছে চেয়ে
মাঠের মাঝে দাঁড়িয়ে থাকে
বাড়ির কথা ভুলে।"

বনমালীকে চিনিনে। কিন্তু তার মেয়ে আর অচেনা নয়। সূর্য চন্দ্রকে ধরতে পাইনে—কিন্তু তাপ আর আলোতে তাদের চিনতে পারি। বিশ্বস্রষ্টার এমনি একটি ঘোষণা চুপি চুপি সকলের কানেই পৌছয় আড়ালে আড়ালে।

প্রতিবেশীর বিষয়েও শিশুর কৌতূহল আছে। নিজে যা জেনেছে, অপরকেও জানিয়ে দিয়েছে :

"...এককালে সাঁওতালরা বিশেষ শক্তিশালী জাত ছিল। পণ্ডিতেরা বলেন "সামন্তপাল" কথাটি থেকে "সাঁওতাল" কথাটি এসেছে। কিন্তু আজ আর তাদের সেই গৌরবের দিন নেই। এখন এরা গরীব দুর্বল জাত। আমাদের প্রতিবেশী এই প্রাচীন জাতটি কবে আবার শক্তিশালী ও উন্নত হবে কে জানে?"

ব্যক্তিবিশেষকে নিয়েও শিশু ছন্দের ঝংকার তোলে :

"থাকেন তিনি পুনশ্চতে
ছাতা মাথায় বেরন পথে···
"স্বামী তাঁহার পি, চৌধুরী
লেখক নেইক তাঁহার জুড়ি···"

তবু যাঁর কথা বলছে তাঁকে জানতে অসুবিধে হবে এ-দ্বিধা নিয়ে সে আবার লেখে :

"সকাল থেকে সন্ধ্যেবেলা
ঘরেতে তার গানের মেলা।"

সংগীতের রাজ্যে এই সম্রাজ্ঞী হচ্ছেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী।

পুরনো কথায় গল্প খুঁজে বেড়ায় শিশু। নিজে যেমন বিস্মিত হয়, অপরকেও বিস্ময়ান্বিত দেখতে চায়। একটি শিশু লিখছে :

"···গাধাদের স্বভাবই শুধু বারবার ডেকে ওঠা। কাজেই গাধাটা খানিকক্ষণ পরে পরেই ডেকে উঠছিল। তিনি মনে করলেন গাধাটার খিদে পেয়েছে—তাই ডাকছে। মুনীশ্বরকে ডেকে বললেন,

'মুনীশ্বর, গাধাটার বোধ হয় খিদে পেয়েছে—ওকে খেতে দে!'

মুনীশ্বর বলল, 'এখন আমি খাবার কোত্থেকে দেব?'

তিনি বললেন,

'আমার জন্যে যে পাউরুটি আছে তাই খানিকটা দে।'

গাধা পাউরুটি খেল। খবরটা আশ্চর্য হলেও সত্যি। কারণ মুনীশ্বরের প্রভু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মশায় ছিলেন আশ্চর্য মানুষ। দুঃখীর প্রতি তাঁর দরদের অন্ত ছিল না। মানুষ পশু সকলকেই তিনি মমতায় সিক্ত করে রাখতেন। পাখিরা করত তাঁর সঙ্গে মান অভিমান। গল্পের মতো সে-সব কাহিনী শুনে শিশুর আনন্দ। নিজের উপভোগই সে বিলিয়ে দেয় এমনি করে রচনায়—নিজের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে।

শুধু আনন্দ-সন্ধানে নয়, বেদনাতেও তার শক্তি নিহিত। দেশবিভাগের পর পরিবর্তনের স্রোত বইছে বাইরে ভিতরে। দুঃখ-দুর্দশা ভুগছে অসংখ্য মানুষ। কিন্তু যে শিশু ভুক্তভোগী নয়, সেও দেখছে এই ছবি সাহিত্যের জানলায় দৃষ্টি গলিয়ে :

> "মুক্ত বেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
> আমরা বাঙালী বাস করি সেই দ্বিধাবিভক্ত বঙ্গে
> ভাগাভাগি করি বাঁটি নিল দোঁহে ভারত পাকিস্তানে
> যখন তখন সুযোগ লইয়া এ উহার বুকে হানে।
> ... ...
> চিত্ত-সুভাষ-বিবেক-শরৎ-রবীন্দ্রে করি দাঁড়া
> কোনো প্রকারেতে বাঙালী জাতির মান রাখিয়াছি খাড়া।"

বিশ্বসমস্যার দিকেও শিশুর দৃষ্টি সচেতন। লিখেছে : "জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের বাহিনীর পরাজয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে এসেছে। কিন্তু এ-ব্যাপারে মীমাংসা হয়ত এত সহজেই হবে না। আমেরিকা এবার শেষ চেষ্টা করবে। জাতিপুঞ্জের হয়ে আরও হয়ত কয়েকটি দল এগিয়ে আসবে। তখন উত্তর কোরিয়ার হয়ে আসবে শক্তিশালী সোভিয়েট রাশিয়া ও গণতন্ত্রী চীন। তারপরে তৃতীয় মহাযুদ্ধ লাগা এমন কিছুই আশ্চর্য নয়। এখন এ-কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে কোরিয়াতেই রয়েছে পৃথিবীর জিয়নকাঠি মরণকাঠি...।

আপনি যদি ধৈর্যসহকারে আমার এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ পাঠ করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে প্রবন্ধে আমি যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছি, তাহা প্রায় সত্য হইতে চলিল।"

১৩৫৫ থেকে ১৩৫৯ এই পাঁচ বছরে শান্তিনিকেতনের শিশুরা সাহিত্যের আসরে যা যা দিয়েছে তার কিছু পরিচয় দেবার চেষ্টা করা গেল সংক্ষিপ্ত

আলোচনার সঙ্গে। উদ্ধৃতিগুলো যাদের রচনা থেকে নিয়েছি তাদের বয়স ৭ থেকে ১৪র মধ্যে। এই রচনাগুলোর বিষয়ে যাঁদের কৌতূহল তাঁরা দেখবেন শান্তিনিকেতন থেকে প্রকাশিত শিশুদের বার্ষিকী "আমাদের লেখা"র পাতা খুলে।

সমস্ত বাংলাদেশের সাহিত্য-সৃষ্টির পরিচয় এই নির্ঘণ্টে নেই। তবু এখন যারা শান্তিনিকেতনের, দু'দিন আগে এদের অনেকেই ছিল সারা বাংলায় ছড়িয়ে। এখানকার জীবনধারার প্রভাব এ-সব রচনায় থাকা স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও এদের মনেপ্রাণে অতীতের যে-ছবি আঁকা হয়ে আছে সে একেবারে মোছবার নয়। যে-জীবন দিয়ে সৃষ্টি, তার ছাপ সৃষ্টিতে থাকবেই। রয়েছেও।

জীবনের সঙ্গে শিশু আনন্দ নিয়ে আসে। শিল্পের সাধনায় আনন্দকে সে অনন্তের দিকে নিয়ে চলে। মানুষের মহাযাত্রার পথে এদেরও দায়িত্ব আছে। সে-দায়িত্বের দায় সম্পর্কে বড়দের অবহিত হওয়া চাই। এরা প্রত্যেকে ভিন্ন রুচির, তবু একটি আনন্দ-সংগীতে সুরের বিচিত্র তরঙ্গের মতো।

শিশু বাইরে শিশু। ভিতরে তার বিস্তৃতি কতখানি সে-কথাই নিজের সৃষ্টিতে সে ধরে রাখতে চায়।

ভাষণ : শিশু সাহিত্য

ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

গত পাঁচ বছর আমার কাছে এক নিশ্বাসের মতো মনে হয়। এ সময়টুকুর সঙ্গে খুব ভালো করে পরিচয়ও ঘটেনি আমার। শিশু-সাহিত্যে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে কতখানি অগ্রসর হয়েছে, নাতিনাতনীদের গল্প শোনাতে গিয়েই তা' সামান্য জেনেছি। শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-পরিমাণ উদ্যম আজ চোখে পড়ছে তা সত্যিই উৎসাহজনক, একথা স্বীকার করতেই হবে।

অবশ্য আমাদের ছোটবেলায় আমরা স্কট, গ্রীম, এণ্ডার্সেন প্রভৃতি বিদেশী লেখকদের রচনা পড়ে যে অতুলনীয় আনন্দ পেয়েছি, দেশ থেকে ইংরেজি উঠে গেলে, দুঃখের বিষয়, আজকালকার ছেলেমেয়েরা তার থেকে বঞ্চিত হবে। সত্যি কথা বলতে কি, ওঁদের রচনার সঙ্গে তুলনার যোগ্য বই আমাদের সাহিত্যে তো বিশেষ কিছু নেই। বিদেশী সৎসাহিত্যের অনুবাদ ছোটদের জন্য ইতিমধ্যে কিছু কিছু হয়েছে, এটা নিঃসন্দেহে সুলক্ষণ। অনুবাদ আরো প্রয়োজন, আমাদের শিশুদের কাছে বিদেশী সাহিত্যের—বিশেষতঃ আশ্চর্য সেই সব রূপকথার—দরজা বন্ধ হয়ে গেলে সেটা বিশেষ আক্ষেপের কারণ হবে। যদিচ এক ভাষার রস যে আর-এক ভাষায় সঞ্চার করা কঠিন ব্যাপার, একথা অনুবাদকমাত্রই স্বীকার করবেন।

ছোটদের বইয়ে মলাটের চাকচিক্যটুকু একেবারে উপেক্ষণীয় নয়, যদিও এবিষয়ে অনেকেই আপত্তি জানান। বইগুলি দেখতে সুন্দর হলে, রুচিসম্পন্ন প্রচ্ছদপত্র থাকলে, নেড়েচেড়ে দেখতে ভালো লাগলে, তবেই ছেলেমেয়েদের কাছে আকর্ষণীয় হতে পারে। তবে সেটাই সব হওয়া উচিত নয়। ছোটদের বইয়ের ভাষা যেন তাদের উপযোগী হয়, নইলে রসগ্রহণে বাধা ঘটায়। আজকালকার বই সম্বন্ধে দু'রকমই লক্ষ্য করেছি: অত্যন্ত সুদৃশ্য বইও অনেক সময় অন্তঃসারশূন্য, অপর পক্ষে অনেক সুখপাঠ্য গ্রন্থের অঙ্গসজ্জা চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক। প্রকাশকদের এবিষয়ে অবহিত হতে হবে।

শিশু-সাহিত্য বলতে আমি বুঝি সেই সব রচনা, যা ছোটরা নিজেরাই পড়ে ও বুঝে উপভোগ করতে পারে, শিক্ষক বা গুরুজনকে যার ব্যাখ্যায় নামতে হয় না ॥

কাব্য-ও নাট্যসাহিত্য
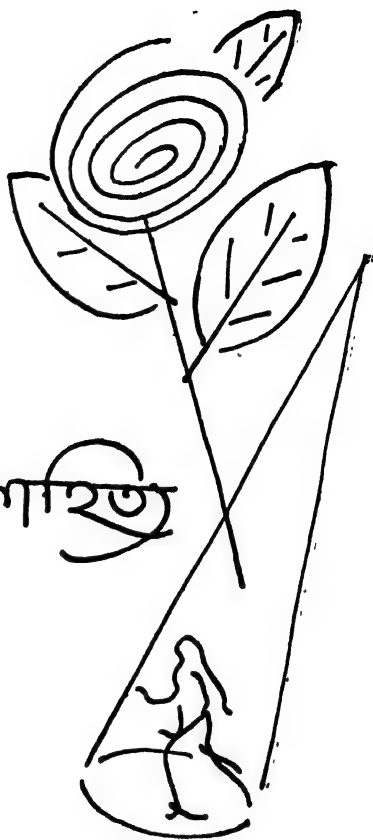
সূত্রপাত : কাব্য ও নাটক

অশোকবিজয় রাহা

কাব্য ও নাট্যজগৎ একটি বৃহৎ ও বিচিত্র বাণীশিল্পের জগৎ। জীবনের সঙ্গে এই জগতের সম্পর্ক যেমন গভীর তেমনি দূরপ্রসারী। বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের নিত্যনূতন অভিজ্ঞতা মানুষের আন্তরসত্তায় প্রতিনিয়ত যে আলোড়ন সৃষ্টি করছে তার থেকে কবিচৈতন্যের মধ্যেও বিচিত্র রূপান্তর ঘটছে। আবার একথাও সত্য যে এই নানা রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যেতে-যেতেও কবিচৈতন্য যুগযুগান্তরের ভাবসত্যকে একই কালে ধারণ করতে পারে। কবির এক জীবনে কী ক'রে জন্মজন্মান্তর ঘটতে পারে, আবার যুগযুগান্তরব্যাপী রসচেতনা বিধৃত হতে পারে, তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সন্ধ্যাসঙ্গীত থেকে শেষলেখা পর্যন্ত যে বিপুল সারস্বতলীলা আমরা সেদিন পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেছি তার চেয়ে বড়ো সত্য আর কী আছে।

রবীন্দ্রনাথের বাণীসাধনার ইতিহাসে যে-কোনো পাঁচটি বছর কল্পনা করুন। পাঁচ বছরে তিনি একা এত বিভিন্ন দিক থেকে এমন অজস্র ধারায় আমাদের সাহিত্যক্ষেত্রকে প্লাবিত করেছেন যে তাঁর লেখনী স্তব্ধ হবার পর থেকেই আমরা যেন আমাদের সাহিত্যের বৃহৎ নদীতে একটা দুর্ভাগা ভাঁটার ছবি দেখতে পাচ্ছি। কোথায় সেই অগাধ জলরাশি যা একটু আগেও দুই তীর ছাপিয়ে দুর্নিবার উচ্ছ্বাসে বিচিত্র আবর্তে ছুটে চলেছিল? রবীন্দ্রপ্রতিভার

এই বিশালতা, এই অজস্রতা, এই বৃহৎ বাণীবেগ পরবর্তী সাহিত্যে কি একমুহূর্তেই অন্তর্হিত হয়ে গেল?

আজকের অধিবেশনে আলোচনার দায়িত্ব আমার নয়, আমি আহ্বায়ক মাত্র। তবু এই প্রসঙ্গে দুয়েকটি কথা সংক্ষেপে বলা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পর আজ বারো বছর কাটতে চলেছে। এর প্রথম ক'বছর আমরা প্রায় বিমূঢ়ভাবেই কাটিয়েছি। এত বড়ো সূর্য চোখের সামনে হঠাৎ নিভে যাবে এ যেন আমরা কল্পনাও করতে পারি নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কৃষ্ণপটভূমিতে নেমেছে আমাদের রবিহারা দুর্দিন—সে-দুর্দিনে আমাদের জাতীয় জীবনে মূঢ়তাও ঘটেছে অনেক। বহু দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে একদিন এল রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা। একে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না বললেও জাতীয় জীবনের একটা নতুন পর্যায় বলা চলে। মহাশূন্যে পতনশীল অবস্থায় পায়ের তলায় যেভাবেই হোক একটা আশ্রয় পাওয়া গেছে যেন। এই অবস্থায় আবার একটুখানি আত্মস্থ হবার সুযোগ হয়েছে আমাদের। এই নতুন পরিবেশে আমাদের কবিতায় নাটকে কবিচৈতন্যের নতুনতর স্পন্দন কীভাবে এবং কতটুকু ধরা পড়েছে তা আজ আমরা সাম্প্রতিক লেখকদের কাছ থেকে শুনতে পাব।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জগৎ ও জীবনের পরিবেশ যেমন বদলায়, সাহিত্যে তেমনি নতুনতর বিষয়বস্তুর আবির্ভাব ঘটে। নতুনতর মূল্যবোধও জাগে। এর নজিরও আমরা রবীন্দ্রনাথেই পাব। তাঁর 'নবনবৃ-উন্মেষশালী' প্রতিভার শেষ জীবনের দান থেকেই আমাদের আলোচ্য সাম্প্রতিক সাহিত্য প্রধানত প্রেরণা পেয়েছে, কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনো পরোক্ষে।

আজকের দিনের কাব্য ও নাটকে যে জীবন-জিজ্ঞাসা জেগেছে, তা আজকের যুগচৈতন্যেরই অঙ্গ। যুগকে স্বীকার না ক'রে, গ্রহণ না ক'রে, কোনো কবিই অগ্রসর হতে পারেন না,—এমন কি যুগোত্তীর্ণ কবিও না। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে এ-জন্য যুগের রাশি রাশি তথ্যকে

গ্রহণ করলেই চলবে না, যুগের রসসংবেদনাহীন তত্ত্বকেও না,—যুগের জীবনরসঘন সত্যকে আশ্রয় করা চাই। এই জীবনরস একদিকে যেমন কোনো বিশেষ যুগেরই একান্ত, অন্যদিকে তেমনি যুগ-যুগবাহী জীবনরসধারার সঙ্গেও তার সংযোগ রয়েছে। তাই রামায়ণ মহাভারত বিগত যুগের ঘটনাসর্বস্ব ইতিহাসমাত্র না হয়ে যথার্থ কাব্য হতে পেরেছে—আজকের মানুষের রসচেতনার সঙ্গেও তার ভাবসংবেদনা ও শিল্পসুষমার একটি নিগূঢ় আত্মীয়তা আছে।

সাম্প্রতিক কালের বস্তুসত্য ও ভাবগত জীবনসত্যকে শিল্পীর রস-দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ ক'রে তার থেকে এযুগের বিশেষ বাণীরূপের বিচিত্র ভঙ্গিগুলিকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করছেন আজকের কবি ও নাট্যকার। বিভিন্ন লেখকের বিশিষ্ট মনোভঙ্গি তাঁদের নিজ নিজ ভাবে ভাষায় ও আঙ্গিকে তাকেই এক-একটি বিশিষ্ট রসরূপ দান করছে। এই রসরূপগুলি স্বতন্ত্র জীবনাদর্শের প্রেরণায় আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী হলেও আসলে এরা পরস্পরের পরিপূরক—যুগের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব তারই হৃদয়-বৃন্তে দ্বিদল পদ্মের মতোই ফুটে উঠেছে। এ-যুগের যথার্থ ঘ্রাণ এ-পদ্মের মর্মকোষে।

হয়তো জীবনসত্যের প্রকাশে, ভাব ভাষা ও আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সাম্প্রতিক কবিতায় যেটুকু কাজ হয়েছে, সাম্প্রতিক নাটকে ততটা সম্ভব হয়নি। অবশ্য তার কারণও আছে। নাটক harmonious art—বাণী, সংগীত, অভিনয়, মঞ্চসজ্জা—এতগুলি কলার সমন্বয়ের প্রশ্ন তো আছেই, তা ছাড়া আছে অন্তর্নিহিত মূল রসচেতনার সঙ্গে এই বিচিত্রবহুল বহিরঙ্গ-প্রকাশের দেহাত্মসম্পর্কের প্রশ্ন। আবার নাট্যগ্রন্থের সঙ্গে যেমন মঞ্চের সম্বন্ধ, মঞ্চের সঙ্গে তেমনি দর্শকের সংখ্যার সম্বন্ধ, কেন-না তার সঙ্গে প্রযোজকের ও মঞ্চব্যবসায়ীর অর্থাগম-সমস্যাও জড়িত। এসব অসুবিধা সত্ত্বেও সাম্প্রতিক নাট্যসাহিত্য আদর্শের পথে কতদূর অগ্রসর হতে পেরেছে আজকের সাহিত্যিকদের কাছ থেকে আমরা তা জানতে চাই।

অতি সাম্প্রতিক কাব্য-সাহিত্য

রাধারাণী দেবী

সাম্প্রতিক পাঁচ বৎসরের কাব্য-সাহিত্য নিয়ে আজ আমাদের আলোচনা। এই পাঁচ বৎসরে নূতন কবিতা রচিত হয়েছে যথেষ্ট, কাব্যগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে অনেক। লক্ষ্য করা যায়, এই পঞ্চবার্ষিকী কবিতার মধ্যে সৃজনী প্রতিভাজাত কবিতার চেয়ে নির্মাণ-নৈপুণ্যজাত কবিতাই বেশি।

পাঁচ বৎসরের অন্তর্গত বাংলার কাব্যলোকে সংঘটিত একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য—যা অভিনব সন্দেশ রূপে সাগর-পরপারে বিদেশী বেতারেও প্রচারিত হয়েছিল।

এক দল নবীন কবি নগরের রাজপথে প্রাচীরপত্রের ধ্বজা বহন করে 'বেশি করে কবিতা পড়ুন' ধ্বনি তুলে দেশবাসীকে কাব্য রসাস্বাদনে মনোযোগী করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। কবিতা-নিস্পৃহ জনগণকে কবিতাপ্রিয় করে তোলার জন্য উঁচু আওয়াজ তুলে কাব্যের প্রচার এবং ফুটপাথে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে স্বরচিত কবিতা পাঠ—অভিনব সন্দেহ নেই। এইটুকু বোঝা গেছে, সমাজ-সচেতন কাব্য নামে যে কথাটি কিছুকাল থেকে শোনা গিয়েছে, যার অর্থ ব্যাখ্যা ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে বক্তৃতা এবং বিতণ্ডা শোনা যায়, ধ্বনি ও পোস্টারের মাধ্যমে এই কাব্য-আন্দোলন সমাজ-সচেতন কাব্যেরই প্রত্যক্ষ একটি রূপ সম্ভবতঃ। জনগণ সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ সচেতন থেকে যে কাব্য নির্মিত হচ্ছে, জনগণই যদি সে কাব্য সম্বন্ধে নিস্পৃহ থেকে যায়, সে

কাব্যে তারাই যদি রুচিশীল না হয়, তাহলে যে কোনও উপায়ে হোক তাদের কাব্যস্পৃহ করে তোলার জন্য প্রত্যক্ষ আন্দোলন করা ছাড়া উপায় কি?

কিন্তু জিজ্ঞাসা, কাব্য কি আন্দোলন করে আস্বাদন করাবার সামগ্রী? কাব্য কি সমালোচনা দ্বারা নির্ণীত ও প্রমাণিত হওয়ার বস্তু? তা যদি না হয়, তা হলে আজকের বৈঠকে আমরা কি করতে জড়ো হয়েছি? উত্তর দিতে পারা যায়, সমালোচনা দ্বারা কবিতা আস্বাদন করতে। এই আস্বাদনের ব্যাপারে আমার যা বক্তব্য এবং জিজ্ঞাস্য, বিনম্রভাবে নতুন কবিদের কাছে নিবেদন করছি।

বহু পুরুষানুক্রমে মানুষ পৃথিবীতে যা-কিছু সৃষ্টি এবং নির্মাণ করেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় সৃষ্টি কাব্য। কবিতা মানুষকে তার আপন সীমানা উত্তীর্ণ করিয়ে বহু দূরে অনেক উর্ধ্বে নিয়ে চলে যায়। মানুষের সীমিত শক্তি এখানে আপনাকে অনেকখানি অসীমের মধ্যে উন্নীত করতে এবং প্রসারিত করতে সমর্থ হয়েছে। পরম দুর্লভকে সহজে লাভ করতে পেরেছে—কামনাকে যথাঅভিরুচি সফল সার্থক করে তুলেছে—যা মানুষ জীবনে আর কোনও ক্ষেত্রে এমন করে পারে নি বা পায় নি। মানুষ কল্পনায় স্বর্গ রচনা করেছে। যুগে যুগে দেশে দেশে পুরাণে গল্পে কিংবদন্তীতে ধর্মের পুঁথিতে পুঁথিতে স্বর্গ তার আশ্চর্য উজ্জ্বল রূপ নিয়ে মানুষের সামনে উঁকি দিয়েছে মাত্র, কিন্তু স্বর্গকে করতলগত করে সম্পূর্ণ উপভোগ করেছে পৃথিবীতে একমাত্র কবিচিত্ত। কবিতার মধ্যে স্বর্গ সম্পূর্ণভাবে মানুষের হৃদয়ে ধরা দিয়েছে।

কালিদাস যেদিন রচনা করছিলেন—

তত্রাগারং ধনপতিগৃহানুত্তরেণাস্মদীয়ং
দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন

সেদিন তাঁর কুটীরের পাশেই দুর্গন্ধ নর্দমা ছিল কি না, তাঁর ভাঙা দরজার সামনেই আবর্জনার স্তূপ পড়ে ছিল কি না, গৃহিণীর হাঁড়িতে চাল বা শিশুর গায়ে জামার অভাব ছিল কি না আমাদের কারুরই জানা নেই। কিন্তু

মহারাজা বিক্রমাদিত্যের রত্নসিংহাসনের বর্ণনা, রাজসভার আড়ম্বর, স্বর্ণপাত্রে রাজভোগ গ্রহণ আর রূপসী চামরধারিণীদের কাহিনী আমাদের যথেষ্ট জানা আছে। কিন্তু আমরা কেউ বোধ হয় অস্বীকার করব না, মেঘদূত কাব্য রচনাকালে কবি কালিদাস তাঁর কল্পলোকের যে সিংহাসনে বসে অমরার সুখ উপলব্ধি করেছিলেন, সে সুখভোগ সম্রাট বিক্রমাদিত্যের ভাগ্যে ঘটে নি। বিক্রমাদিত্যের তুলনায় কালিদাসের ঐশ্বর্য উপভোগ ও সুখানুভূতি তুচ্ছ নয়, বরং অনেক উচ্চই।

মানুষ জীবনের বাস্তবলোকে যেমন আপনার কর্মজগৎকে সৃষ্টি করেছে, তেমনি মানসলোকে সৃষ্টি করে নিয়েছে কল্পনাজগৎকে। কর্মজগৎ থেকে গড়ে উঠেছে তার বিরাট ও বিচিত্র সভ্যতা—কল্পজগৎ থেকে গড়ে তুলেছে মানুষ সাহিত্য, কাব্য। মনোময় জগতের এই কল্পলোক বস্তুময় জগতের কর্মলোক হতে তুচ্ছ নয় অথবা দূরে নয়। বরং অদৃশ্য অস্পর্শ হয়েও বস্তুজগতের অতি নিকটবর্তী বলা যেতে পারে। কর্মময় জগতের মূলে আছে মানুষের মন। মনেরই নিজস্ব লীলার রাজ্য কল্পনার অনির্বচনীয় লোক। বাস্তব থেকে রস আহরণ করে তার প্রাণ, কিন্তু তার আত্মা সকল বন্ধন, সকল দায়িত্বের ঊর্ধ্বে। মাটি আর সারের কাছে ঋণী বলে গোলাপ ফুলকে যদি মাটিরই পাপড়িতে গড়ে তুলতে চেষ্টা করা হয়, তার পেলবতা ও বর্ণ গন্ধের সমারোহকে বাস্তব-জীবনের প্রয়োজনশূন্য বিলাসিতামাত্র বলে উপহাস করা হয়, যুক্তিতর্কের দিক থেকে বিচার করলে সেটা ন্যায্য প্রমাণিত হতে পারে, কিন্তু ঠিক ঐ যুক্তি-তর্কের মাধ্যমে গোলাপ ফুলের বিচার করা হাস্যকর, রসিকজনেরা অবশ্যই বলবেন। সংসারে সকল বস্তুই ন্যায়ের দণ্ডে বা প্রয়োজনের দণ্ডে মাপা যেতে পারে না,—রসের দণ্ডে, আনন্দের দণ্ডে, শিল্পের দণ্ডেও মাপ আছে। অনেক কিছুই সাধারণ বস্তু এবং বিষয় আছে, যুক্তির সাহায্যেই যাদের প্রমাণিত করা হয়। কিন্তু সংসারে এমনও অল্প কিছু অসাধারণ বস্তু এবং বিষয় আছে, যাদের প্রমাণ—উপলব্ধি, আস্বাদন আর আনন্দের মধ্যেই নিহিত।

অবশ্য বলা যেতে পারে, উপলব্ধি, আস্বাদন এবং আনন্দেরও তো মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। অর্থাৎ মানুষের রুচি ও প্রবৃত্তির গতি বদল করার শক্তিও যখন মানুষের নিজেরই হাতে কতকটা,—তখন আজকের যুগের অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক গুরুতর প্রয়োজনের জন্য আমরা শিল্পের রূপ ও শিল্প-আস্বাদনের রুচি বদল করে নেবনা কেন?

এই রুচি ও শিল্প-আস্বাদনের রং-বদল পৃথিবীতে চিরকাল নিজের স্বাভাবিক নিয়মেই হয়ে আসছে। প্রয়োজনের চাপে উদ্দেশ্যমূলকভাবে হয় নি। ফুলেরই প্রয়োজনে ফুল ফুটে উঠেছে, ঝরে পড়েছে,—গরজের তাগিদে নয়। সাহিত্যেরও সজীবতার প্রয়োজনে সাহিত্য যুগে যুগে বদল হয়েছে, বদল হবেও।

আজ আমাদের শান্ত চিত্তে চিন্তা করে দেখা দরকার, যুগানুগত আপাত-কালের কাছে আমরা সর্বকাল বা চিরকালকে বন্ধক দিয়ে রাখব কিনা। শিল্পী এবং তার সৃষ্টি আপাতকালে আশ্রয় গ্রহণ করে মাত্র, তার লক্ষ্য বা ইষ্ট সর্বকাল। এই সর্বকালিক আদর্শকে সর্বকালিক সত্যকে কোনও কিছুরই জন্য ক্ষুণ্ণ করলে মহৎ শিল্পের অভ্যুত্থানে বাধা ঘটে।

আপন জীবনকালে যে-সকল জীবনসমস্যার মধ্যে, আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখের মধ্যে কবিচিত্ত আন্দোলিত হয়ে থাকে, যেখান থেকে তাপ সঞ্চয় করে তাঁর চিত্তের প্রদীপ জ্বলে ওঠে, তার প্রভাব এবং প্রতিচ্ছবি আপনিই তো সাহিত্যে কাব্যে ফুটে উঠবে। শিল্পী ও কবি তাঁদের জীবনের বর্তমান যুগের বাইরের মানুষ নন। স্বীয় কালের দুঃখ-সুখ, প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের সঙ্গে স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁরা জড়িত। প্রতি যুগের মানসিক ছবি তো আপনা হতেই কবির কাব্যে, চিত্রীর চিত্রে সঞ্চারিত হয়। যেমন বহু পূর্বকালের ছবি আমরা প্রাচীন সাহিত্যে, কাব্যে, চিত্রে দেখতে পাই।

আজ পৃথিবীর কাব্য সাহিত্যে চিত্রের জন্য অলিখিত অথচ দৃঢ় নির্দিষ্ট ক্যারিকুলাম তৈরি হয়েছে। আজ নবীন কবি লেখনী নিয়ে ভাবছেন তাঁর

কবিতার ভাব এবং বিষয়বস্তু কী হওয়া উচিত। চিত্রকর তুলি নামিয়ে চিন্তা করছেন,—কোন্ বিষয়কে অবলম্বন করে তাঁর হৃদয়ের আনন্দকে মুক্তি দিলে সার্থক চিত্র হবে। অর্থাৎ—আজ কবি ও শিল্পীর হৃদয়ের পূর্ণ স্বাধীনতা নেই যা খুশী তাই নিয়ে কাব্য রচনা করবার বা তুলি টানবার। মস্তিষ্ক সম্রাট হয়ে বসে বুদ্ধির শাণিত প্রভাবে হৃদয়ের গতি নিয়ন্ত্রিত করছে। এখন—'হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে ময়ূরের মতো নাচেরে—'লিখবার উপায় নেই। হৃদয় এখন বুদ্ধির শিকলে বাঁধা। নাচ সে হয়ত ভালরকম শিখেছে, তার শিক্ষার আশ্চর্য নৈপুণ্য যে বাহবা পাওয়ার যোগ্য এতে সন্দেহ নেই। তবে কল্পনাকাশের মেঘোদয়ে হৃদয়-ময়ূরের পেখমমেলা স্বাধীন নৃত্য, আর বিশেষ উদ্দেশ্য-সচেতন বুদ্ধির শিকলে বাঁধা হৃদয়ের সুশিক্ষিত সুনিপুণ নৃত্য—এ দুয়ের মধ্যে প্রভেদ সকলেই মানবেন।

যুগের প্রয়োজন, যুগের চিন্তা, যুগের রুচি কেউই অস্বীকার করে না। কিন্তু কাব্যের উদার বিস্তৃতিকে গণ্ডীর মধ্যে খর্ব করার ব্যবস্থায় আপাত কল্যাণ থাকেও যদি, চিরন্তন কল্যাণ থাকতে পারে না। কল্পলোক মানুষের জীবনে যতই প্রধান হয়ে উঠুক না কেন, বস্তুলোককে অস্বীকার বা অতিক্রম করতে পারে না। কারণ, কবির চিত্ত কল্পলোকে সঞ্চরণশীল হলেও কবি স্বয়ং বস্তুলোকেরই অধিবাসী, রক্তে-মাংসে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় গঠিত। তাই এতকাল কল্পলোক ও বস্তুলোকের সম্মিলিত স্পর্শে অনেক মহৎশিল্পের উদ্ভব হয়েছে পৃথিবীতে। আজ বস্তুলোক তার সর্বগ্রাসী আত্মপ্রসারণে কল্প-লোককে নির্মূল করতে চায়। কল্পলোককে অবজ্ঞায় উপহাস এবং অস্বীকার করে বস্তুলোককেই এখন একমাত্র চরম ও পরম সত্য বলে মেনে নেওয়ার মতবাদ এসেছে। আমাদের মনে হয়, এতে হবে মানুষের সামনের দিকের যাত্রাকে পিছনের দিকে টেনে পিছিয়ে আনা।

ছোটকে বড় করে তোলার মধ্যে গৌরব আছে কিন্তু বড়কে ছোট করে আনায় কৃতিত্ব, থাকলেও গৌরব নেই।

লাভ-ক্ষতির হিসাব আর দায়িত্ব ও কর্তব্যের গুরুভার—এর থেকে বিশ্ব-দুনিয়ায় কারুরই রেহাই নেই। কবিচিত্ত নামে যে বস্তুটা এতকাল ধরে কাজের দুনিয়ার দরকারী-জোয়াল টানা থেকে ফাঁকি দিয়ে আকাশে বাতাসে মাটিতে যদৃচ্ছ-বিচরণ করে ফিরছিল,—আজ তাকেও ধরে এনে প্রত্যক্ষ সংসারের সদুদ্দেশ্যের জোয়ালে জুড়ে দেওয়া হচ্ছে দেখা যাচ্ছে। আজ পরাধীন মানবের আর অন্নহীন মানবের দুঃখে সকলেই আমরা ব্যথিত, আত্মগ্লানিপরায়ণ, কিন্তু দুর্ভাগা কবিদের এই শৃঙ্খলিত বন্দীদশা কারুর অন্তর স্পর্শ করে না কেন? আমি তো দেখি, আজ পৃথিবীর মধ্যে সকলের চেয়ে দুঃখী এবং বঞ্চিত বর্তমানযুগের নবীন কবিরা। এদের উপরে আজ যে শাসন ও বন্ধন অদৃশ্য লিখনে দেশে দেশে বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, তাদের চিন্তাশক্তি, দৃষ্টিভঙ্গী ও রুচিকে সুনির্দিষ্ট এবং নির্ণীত-লক্ষ্য করে দেওয়া হচ্ছে, তার করুণতা কেন সকলের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না?

কবিতা যদি পরিপূর্ণ মুক্তির মধ্যে, দায়িত্বের ভারমুক্ত পাখায় অবাধ সঞ্চরণের উপযুক্ত উন্মুক্ত আকাশের দূরবিস্তৃতি না পায়, তবে তার প্রাণের লীলা, গানের লীলা, গতির লীলা খর্ব হবেই, হয়ে উঠবে আড়ষ্ট। আধুনিক নবতম কবিতার আস্বাদ গ্রহণ করতে গিয়ে আমরা বাধা ও বেদনা পাই তার সর্বাঙ্গের কঠোর নিষেধশৃঙ্খলগুলিতে।

সমসাময়িক কবিতা

অজিত দত্ত

গত পাঁচ বছরের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে অগ্রসর হতে বিশেষ সংকোচ এবং কিছুটা দ্বিধা বোধ না করে পারছি না। কারণ, সমসাময়িক কবিতা কতখানি সাবধানতার সঙ্গে পড়েছি এবং কতটা বিচার করতে পেরেছি, সে-বিষয়ে নিজের মনেই যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। তা ছাড়া পাঁচ বছর মাত্র সময়ের কবিতা সম্বন্ধে কোনো গুরুতর মন্তব্য করার মতো দুঃসাহসিকতা আমার নেই। সমসাময়িক কবিতার একজন সাধারণ পাঠক হিসেবে কয়েকটি কথা যা মনে হয়েছে, তাই নিবেদন করবো।

সম্প্রতি কবিতার ক্ষেত্রে একটা বিশেষ সুলক্ষণ লক্ষ্য করছি—সেটা হচ্ছে কাব্যোৎসাহী ও কাব্যপাঠকের সংখ্যাবৃদ্ধি। বাঙালী পাঠক কবিতার বই কিনে পড়ছে, কিংবা পড়বার জন্যই কিনছে, এ আশ্চর্য ঘটনা আজকাল আর বিরল নয়। অতি সম্প্রতি তরুণ কবিযশঃপ্রার্থীদের 'কবিতা-পড়ুন' আন্দোলন বাঙালী পাঠককে আরো বেশি কাব্যসচেতন করে তুলতে চাইছে, সেটাও সুখের কথা।

গত পাঁচ বছরের বাংলা কবিতা আমার কাছে নানা কারণে উল্লেখযোগ্য ব'লে মনে হয়েছে। প্রথমত এ ক'বছরে কাব্যের ক্ষেত্রে ভালো রচনা যা প্রকাশিত হয়েছে, তার পরিমাণ প্রচুর। ত্রিশ-চল্লিশ দশকের খ্যাতনামা প্রায় প্রত্যেক কবির কবিতার বই এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যের

আঙ্গিকের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত পুরোনো ও নতুন কবিদের নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা কবিতায় নতুন নতুন ব্যঞ্জনার পথ খুলে দিয়েছে। কোথাও কোথাও আশ্চর্য সফলতা চমক লাগিয়ে দেয়। যাঁদের প্রথম বই গত পাঁচ বছরের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে, এরূপ উল্লেখযোগ্য নতুন কবির সংখ্যাও কম নয়। মোটের উপর কবিতার সাম্প্রতিক পরিমাণকে কোনোমতেই সামান্য বা অল্প বলা চলে না।

কেবল পরিমাণেই নয়, ভাষা ও আঙ্গিকেও বাংলা কবিতা এখন অনেক প্রসার ও সৌষ্ঠব লাভ করেছে—এটা সম্ভবত সকলেই লক্ষ্য করেছেন। কবিতা, যা হচ্ছে মনের ভাষা—তার বাহন আজ মুখের ভাষার সঙ্গে প্রায় অভিন্ন, সেটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কেননা, এ ভাষায় যদি কবিতা সত্য ও জীবন্ত হয়, তবে তার পক্ষে হৃদয়ে প্রবেশের পথ সহজ হবে, এ বিষয়ে সন্দেহ কি? সাম্প্রতিক কবিতায় আরো বিশেষভাবে লক্ষণীয় এর কারুকৌশল ও শিল্পচাতুর্যের বিস্ময়কর অভিনবত্ব। বস্তুত এটা না মনে হয়ে পারে না, যে আজকের কবি তাঁর শিল্প সম্বন্ধে বিশেষরূপে সচেতন ও সাবধান হয়েছেন। উচ্ছ্বাসের বশবর্তী হয়ে ঢিলে-ঢালা বাক্ বিস্তারে কোনো-রকমে মনের আবেগ প্রকাশ করতে আজকের নবীনতম কবিও লজ্জিত হবেন বলে মনে হয়। সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার শব্দসমৃদ্ধি, এর উপমা ও চিত্রের বিস্ময়কর অভিনবত্ব, দৃঢ়বদ্ধ বাক্যবিন্যাস এবং রচনা সৌষ্ঠব, এক কথায় অতি সযত্ন সাবধানী বিষয়, উপমা ও শব্দ নির্বাচন, সবই সাম্প্রতিক কবির সচেতন অধ্যবসায় ও নিজের শিল্প সম্বন্ধে দায়িত্ববোধের পরিচয় দেয়।

কবিমনের এ সচেতন গতিশীলতা, আঙ্গিকের ক্ষেত্রে যা নতুন নতুন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে নিজের রচনাকে সমৃদ্ধ করতে চাইছে, তা বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রেও নিশ্চল নয়। ইদানিং কবিতার বিষয়বস্তুর উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেছে। গতানুগতিক কাব্যোপকরণগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আধুনিক

বিদ্যা-বিজ্ঞান-রাজনীতি-সমাজনীতি-অর্থনীতিতে ওতপ্রোত বর্তমান পৃথিবীর বস্তু, চিন্তা ও তর্ক। কবিতার ভাষাই যে কেবল মুখের ভাষায় রূপান্তরিত হয়েছে তা নয়, কাব্যের শব্দসম্পদের সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে জটিলতর জীবনের অনতিমৃদু ভাষা, সাংবাদিকের বিশিষ্ট ও এককালে অপাংক্তেয় শব্দ-গুচ্ছ এবং রূঢ় কথার ঝুড়ি। কারণ কাব্যের বর্তমান বিষয়ের সঙ্গে তাল রাখতে গেলে এ ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর প্রশ্নটা একটা বড় সমস্যা রূপে দেখা দিয়েছে। একটা শক্তিশালী লেখকগোষ্ঠী মনে করেন যে কাব্যের আঙ্গিকে সাংবাদিক বিষয় পরিবেশন করলে তা উঁচুদরের কবিতা হতে পারে। এঁদের মতে রাজনৈতিক তর্ক, বক্তৃতা, ভর্ংসনা ও আক্রমণ কোনো কিছুই কবিতার বিষয়বহির্ভূত নয়। কিন্তু নিন্দা, অসূয়া ও ক্রোধকে ভিত্তি করে ভালো পদ্য রচনা করলেও তা কাব্যপর্যায়ে উঠতে পারে কিনা, এ-বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ পোষণ না ক'রে পারি না। কিন্তু এই সব সংবাদ ও মতপ্রধান কাব্যপ্রচেষ্টা ছেড়ে দিলেও বর্তমান কালের নবীন কবিমন বিষয়ের সন্ধানে কিছুটা বিব্রত বলেই মনে হয়। কী লিখবো? এ একটা বিরাট প্রশ্ন। প্রেম? সেটাকে বুদ্ধি ও বিশ্লেষণের দ্বারা কতখানি বর্তমান জটিল ও মোহমুক্ত জীবনের উপযোগী করে নেওয়া যায়, তার উপর নির্ভর করছে আধুনিক কবির কাছে ঐ বিষয়টির উপযোগিতা। আমাদের জীবনকে ঘিরে অসংখ্য জটিলতা, অ্যাটম্-বোমা, যুদ্ধ, বুভুক্ষু। অসংখ্য ভগ্ন স্বপ্ন, ভঙ্গ মোহ, চূর্ণ গতানুগতিক মূল্যবোধের মান, এক্ষেত্রে কী নিয়ে কবিতা লিখবো এ-প্রশ্ন অবান্তর নয়। অথচ কবি-প্রাণ আছে, বলিষ্ঠ, সৌষ্ঠবসম্পন্ন ভাষাও আয়ত্তে। এরূপ ক্ষেত্রে নবীন কবি-প্রাণের যে অতৃপ্তি, সেটাই যেন আজ তরুণ কবিদের কাব্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগেই বলেছি নবীন কবিরা আজ অত্যন্ত আত্মসচেতন, এবং সে-কারণে, কালোপযোগী হবার প্রযত্নে মোহমুক্ত। তাই আজ নবীন কবির কাব্য বিস্ময়কর রূপ-সৌষ্ঠবপূর্ণ, ঋজু, বলিষ্ঠ, চমক-লাগানো হয়েও যেন বিজ্ঞ ও

প্রবীণ—যৌবনের উত্তাপহীন। এঁদের কাব্যে যৌবন যেন এক ধাপ এড়িয়ে প্রথমেই প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছেছে। প্রেম যেন আবেগকে প্রায় ত্যাগ করে বিশ্লেষণী বুদ্ধির কণ্ঠলগ্ন। বস্তুতঃ, সাম্প্রতিক কবিতার সর্বতোমুখী উৎকর্ষ এই বিষয়বস্তু সম্বন্ধে দ্বিধা ও সংশয়ের জন্যই পাঠককে সম্পূর্ণ তৃপ্তি দিতে পারছে না এরূপ মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

আমাদের পক্ষে, অর্থাৎ কবিতার পাঠকদের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় এই যে গত পাঁচ বছরের মধ্যে কুড়ি-ত্রিশ-চল্লিশ দশকের প্রধান কবিদের প্রায় প্রত্যেকের একটি বা একাধিক কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। পরবর্তী এবং নবীনতর অনেক কবির রচনার মতো এঁদের কবিতা রচনা-সৌষ্ঠবে, ধারালো বাগবিন্যাসে, চমক-লাগানো চিত্রে ও উপমায় এবং অভিনব প্রকাশ-ভঙ্গিতে বিস্ময়কর না হলেও, অনেকটা বেশি তৃপ্তিদায়ক। কেননা এঁদের রচনা বিষয়ের সন্ধানে এত বিভ্রান্ত নয়। আজ দেশ ও জগতের পরিবেশ ও আবহাওয়া হয়তো কাব্যরচনার অনুকূল নয়, এবং বর্তমান ভাবনাভরা জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে এঁদের কবিতা আজ একটা দার্শনিকতা ও চিন্তার জগতে ভ্রাম্যমাণ ; এঁদের অনেকেরই কাব্যে একটা বিষণ্ণ মধুর ক্ষোভ ও আক্ষেপের সুর। সে ক্ষোভ ও আক্ষেপের সঙ্গে সুন্দর জীবন ও প্রেম উপভোগের আকাঙ্ক্ষা জড়িত।

সংক্ষেপত, এটা আমার মনে হয় যে, যদিও আজকের নবীন কবিদের রচনায় খুব একটা অগ্রসর সচেতন মনের পরিচয় পাওয়া যায়, এবং যদিও এঁদের রচনা-সৌষ্ঠব ও আঙ্গিকের উৎকর্ষ বিশেষ আনন্দ দেয়, তবু কাব্য-পাঠের আন্তরিক তৃপ্তি পাবার জন্য এখনো ত্রিশ-চল্লিশ দশকের স্থির-প্রজ্ঞ কবিদেরই রচনার শরণ নিতে হয়। কেননা এঁরা কী লিখবো বা কী নিয়ে লিখবো এ-চিন্তায় দিশাহারা না হয়ে এই বিভ্রান্তিকর কলকোলাহলের মধ্যেও ঘোষণা করতে পারেন—

'আমার আকাঙ্ক্ষা তাই কবিতার অদ্বিতীয় ব্রত।'

পূর্ব বাঙলার সাম্প্রতিক কবিতা

শামস্থর রাহ্‌মান

পূর্ব বাঙলার সাম্প্রতিক কবিতার বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরুদ্ধ হয়েছি। সমসাময়িক সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা করতে যাওয়ার একটা বিপদ আছে। একথা প্রায়ই শোনা যায় যে সমসাময়িক সাহিত্যের প্রতি যথাযথ সুবিচার করা কোনো লেখকের পক্ষেই সম্ভব নয়। কথাটাকে সহজেই উড়িয়ে দিতে পারতুম যদি না সমালোচক-ধুরন্ধর ডক্টর জন্‌সনের মতো বিখ্যাত উদাহরণ আমাদের সামনে উপস্থিত থাকতো। স্বয়ং জন্‌সনও তাঁর যুগের অন্যতম সংকবি গ্রে-র কবিতার উপর বড়ো একটা সুবিচার করেন নি। বলাবাহুল্য তিনি মারাত্মক ভুল করেছিলেন এবিষয়ে। তবুও যে সমসাময়িক কাব্য-সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে ভরসা পাচ্ছি তার কারণ, সমালোচনার কোনো কথাই শেষ কথা নয়। তারপরও কথা থাকে।

বহুবর্ণিত কবিতার দেশ বাঙলা রাজনৈতিক কারণে আজ বিভক্ত। কিন্তু দেশের মানচিত্র বদলেছে বলেই দুই বাঙলার পারস্পরিক সম্পর্ক একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়নি, সম্প্রীতি নষ্ট হয়ে যায়নি। দেশ ভাগ হয়ে গেছে বলে পূর্ব বাঙলার মানুষ বাঙলা ভাষা ভুলে যায়নি। আমাদের এ-বাঙলা ভাষা আমাদের যে কতো প্রিয় সেকথা আমরা এই সেদিনও প্রাণ দিয়ে প্রমাণ করেছি। রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল মধুসূদন, আলাওল

এবং নজরুল ইসলামের ভাষাকে আমরা ভালবাসি, চিরদিন ভালবাসবো, জীইয়ে রাখবো আমাদের রক্তের প্রবহমান স্রোতে। বাঙলা সাহিত্যে পুর্ব বাঙলার প্রাক্তন দান কিছু নগণ্য নয়। আধুনিক বাঙলা সাহিত্য যদিও প্রধানতঃ কলকাতাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে তবু পুর্ব বাঙলার সাহিত্য-কর্মের উজ্জ্বল বিশিষ্টতায় বহুকাল সাহায্যপ্রাপ্ত হয়েছে বাঙালী জাতি, গঠিত হয়েছে সৎ সাহিত্যের বলিষ্ঠ শরীর। ভবিষ্যতেও যে পুর্ব বাঙলা সেই গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারা রক্ষা করবে তার প্রতিশ্রুতি বহন করছে বর্তমান। হাঁা, বর্তমানে কিছু সংখ্যক প্রবীণ এবং তরুণ সাহিত্যিকের মিলিত উদ্যমে পুর্ব বাঙলার সাহিত্যের চেহারা বেশ কিছুটা উজ্জ্বলই মনে হচ্ছে অনেকের বিবেচনায়।

আমার এ আলোচনা প্রধানতঃ বিভাগোত্তর পাঁচ বছরের কবিতাকে কেন্দ্র করেই তৈরী হবে। প্রাকবিভাগ যুগে কবিতা লিখে আমাদের যে কয়জন কবি বিখ্যাত হয়েছেন কাব্যক্ষেত্রে তাঁদের প্রায় সবাই এখন পুর্ব বাঙলায় আর সুখের বিষয়, তাঁদের অনেকেই এখনও কবিতা লিখছেন। তাই তাঁদের কবি-কর্ম সম্বন্ধে বলতে গেলে অতীতের দিকে এক আধটু চোখ ফেরাতেই হবে। পুর্ব বাঙলার সাম্প্রতিক কবিতা কয়েকটি সুস্পষ্ট ধারায় এগিয়ে চলেছে, এই এগিয়ে চলার পথে মাঝে মাঝে যে ছন্দপতন ঘটছে না এমনও নয়। এই বিভিন্ন ধারাগুলোর পরিণতি শেষ পর্যন্ত কি দাঁড়াবে তাও আপাততঃ বোঝা যাচ্ছে না। তবু আমি পুর্ব বাঙলার সাম্প্রতিক কবিতার পরিচয় যদ্দুর সম্ভব তুলে ধরতে চেষ্টা করবো।

পুর্ব বাঙলার অধিকাংশ মানুষই গ্রামবাসী আর সেজন্যে এখানকার সাহিত্য পুরোপুরি গ্রামকেন্দ্রিক হবে বলেই অনেকে ভাবছেন। সত্যি বলতে কি, এ ধরনের উক্তির ওপর আমার তেমন আস্থা নেই। স্বীকার করছি, এ দেশের মানুষ প্রধানতঃ পল্লীকেন্দ্রিক সাহিত্য তৈরী করবে, কিন্তু তাই বলে শহরকে

আমরা আমাদের সাহিত্যের আসর থেকে নির্বাসিত করবো না। আর কোনো সাহিত্যিক যদি শহরকে কেন্দ্র করে সৎ সাহিত্য তৈরী করেন তা হলে তাঁকে 'শহুরে' বলে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবার দুর্মতি হওয়া উচিত নয় কোনোমতেই। শহরকে আমরা নির্বাসিত করতে পারি না, কেননা আমাদের বর্তমান জীবনে শহর কিছু কম প্রভাবশালী নয়। ধরতে গেলে শহরই আধুনিক জীবনের প্রাণকেন্দ্র হয়ে পড়ছে। একথা খুবই সত্যি শহরে রয়েছে নোংরামি, কুশ্রীতা, হিংসা, লালসা আর কালো ধোঁয়া—কিন্তু তাই বলে শহরকে আমরা ঘৃণা করে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না, তারও একটা স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে, সৌন্দর্য রয়ে গেছে। পল্লীকে নিয়ে আমরা বেশ বাড়াবাড়ি-ই করে আসছি চিরকাল। পল্লী অপরূপ সুন্দর, আশ্চর্য তার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য, ইত্যাদি, ইত্যাদি। পল্লীকে আমরা ভালবাসি, খুবই সত্য। কিন্তু এ ভালবাসা যদি রীতিমতো শুচিবাইতে পরিণত হয় তা হলেই এর বিরুদ্ধে কিছু বলা একটা কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়। পল্লী-প্রেমের দোহাই দিয়ে যে-সব অক্ষম প্যাচপ্যাচে রচনায় সাময়িকী পাতাগুলো ভরে ওঠে তা' দেখলে আহত হতে হয় রীতিমতো। গ্রামকে কেন্দ্র করে ভালো সাহিত্য গড়ে উঠেছে এখানে, কিন্তু শহর-কেন্দ্রিক কোনো উল্লেখযোগ্য লেখা আমার চোখে, দুঃখের বিষয়, খুব কমই পড়েছে। পল্লী সাহিত্যের কথা উঠলেই সবচেয়ে আগে যাঁর নাম মনে আসে তিনি জসীমউদ্দীন। লোক-কবি হিসেবে জসীমউদ্দীন একক। তাঁর 'নক্সীকাঁথার মাঠ' বাঙলা কাব্য-সাহিত্যের একটি উজ্জ্বল বই, একথা আশা করি অনেকেই স্বীকার করবেন। তিনি যখন প্রথম আমাদের সোজন বাদিয়ার ঘাট, হলদে পাখির ছা, কাজলদীঘির কালো জল আর বউ-টুবানীর মেঠো পাঁচালী শোনালেন তখন আমরা বাঙলা কবিতার আসরে একজন প্রকৃত নতুন কবির সন্ধান পেয়ে খুশি হলুম, মুগ্ধ হলুম। তাঁর কবিতার সহজ, স্বচ্ছন্দ রূপকে আমরা ভালোবাসলুম। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা চুরি করে বলতে ইচ্ছে করে, জসীমউদ্দীনের কবিতা সুন্দর কাঁথার মতো ক'রে বোনা।

তাঁর কবিতাগুলোর মধ্য দিয়ে বাঙলার পল্লীজীবন আশ্চর্য-সুন্দর ছবির মতো ধরা দিয়েছে। আবার বলছি, পল্লী-কবি হিসেবে তিনি পূর্ব বাঙলার একক কবি-কর্মী। 'মাটির কান্না' জসীমউদ্দীনের সাম্প্রতিক কবিতার সংকলন। যদিও এ কাব্যগ্রন্থের কোনো কোনো পংক্তি কিম্বা উপমায় জসীমউদ্দীনের কবিত্বশক্তি বিদ্যুতের মতো ঝিকিয়ে ওঠে তবু বলবো, তিনি ক্রমেই তাঁর পূর্বের প্রসাদগুণ হারিয়ে ফেলছেন ইদানীং। আধুনিক হয়ে-ওঠার ঘর্মাক্ত চেষ্টায় তাঁর বর্তমান কবিতাগুলো ভারাক্রান্ত, ক্লান্ত। তিনি তাঁর বৈশিষ্ট্যকে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে চাইছেন দেখে আহত হয়েছেন তাঁর ভক্ত পাঠক-গোষ্ঠী। তিনি যখন শাপলা লতা, বিলের কাজল জল, নিঝুম রাতের বাঁশির সুর, ধান-কাউনের অথই রঙের মেলা, বাউ কুড়াণী আর উড়াণীর চর নিয়ে কবিতা লেখেন তখন তিনি নিঃসন্দেহে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কবিতার এ পরিমণ্ডলেই তিনি সিদ্ধি খুঁজে পেয়েছেন। আর যখন তিনি এ পরিবেশ ছেড়ে অন্য কিছুর দিকে পা বাড়িয়েছেন তখনই তাঁর কাব্য-চরিত্র ক্ষুণ্ণ হয়েছে। কিন্তু আশার কথা, যদিও তিনি এখন প্রৌঢ় তবু সময়ের ধুলো তাঁর কবিত্বশক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করতে পারেনি, তাঁর লেখনী এখনও শুদ্ধ হয়ে যায়নি। কে জানে হয়তো অদূর ভবিষ্যতে তিনি আরো উন্নত কবিতা উপহার দেবেন আমাদের। তাঁর কবি-কর্মকে অনুসরণ করে দু-একজন পল্লী-কবি কবিতা লিখতে চেষ্টা করছেন কিন্তু তাঁরা নিজের চেহারা উপস্থিত করতে পারছেন না, সেগুলো অনুকরণও নয়, রীতিমতো অনুলিখন।

আজকাল আমাদের সাহিত্যের বাজারে একটা কথা বেশ সরবেই উচ্চারিত হচ্ছে যে পূর্ব বাঙলার সাহিত্য কলকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্য হবে না অর্থাৎ পশ্চিম বাঙলা থেকে স্বতন্ত্র হবে এখানকার সাহিত্য। আমি কিন্তু এ ধরনের কথা অতো আড়ম্বরে চেঁচিয়ে বলার কোনো অর্থ খুঁজে পাইনে। এটা তো খুবই সত্য যে দেশ ভাগ না হলেও আমাদের সাহিত্য পশ্চিম বাঙলার সাহিত্য থেকে আলাদা হতো, স্বাভাবিকভাবেই আমাদের সাহিত্য

স্বতন্ত্র চেহারা নিয়ে এগিয়ে যেতো। কেননা অতীতের সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখলে এটা প্রমাণিত করা এমন কোনো কঠিন কাজ নয় যে বরাবরই পুর্ব বাঙলার সাহিত্য পশ্চিম বাঙলার সাহিত্য থেকে অনেকাংশে পৃথক, স্বতন্ত্র। কেননা, পুর্ব বাঙলার 'আত্মা'র একটা আলাদা সত্তা রয়েছে। এখানকার ভৌগোলিক পরিবেশ, পদ্মাপারের মানুষের সংগ্রামী জীবন, আকাশ, রোদ, হাওয়া, গাছ, ফুল, পাখি সব কিছুই ছায়া ফেলবে পুর্ব বাঙলার কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে। স্বভাবতই পুর্ব বাঙলার মাটি, আলো আর হাওয়ার গন্ধ লেগে থাকবে এখানকার কাব্যে আর যে কবিতায় এসব কিছু থাকবে না তা এমনিতেই ঝরে পড়বে, তার জন্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে বিনিদ্র রাত্রিযাপনের কোনো মানে হয় না আদপেই। কয়েকজন কবি যাঁরা ইসলামী ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী তাঁরা পুর্ব বাঙলার কবিতাকে স্বতন্ত্র চেহারা দেবার জন্যে কাব্যের পরমার্থ খুঁজছেন সাহারার ধু-ধু করা বালির সমুদ্রে, আলবোর্জ পাহাড়ে, আখরোটের বনে, বাদাম খুবানির বনে। এ পরিবেশেও সুন্দর কবিতা সৃষ্টি হয়েছে স্বীকার করি। কিন্তু দুঃখের সঙ্গেই বলছি এসব কবিতায় পুর্ব বাঙলা অনুপস্থিত। অথচ এঁরাই যখন আবার জোর গলায় পুর্ব বাঙলার সাহিত্যের স্বাতন্ত্র্যের কথা জাহির করেন তখন হাসির উদ্রেক হয় শুধু। সাহিত্যে ধর্ম একাধিকবার বিষয়বস্তু হয়েছে, হতেও পারে। বহুবার বিশ্বাস কবিতায় একটা আশ্চর্য দীপ্তি পেয়েছে, পেয়েছে কারুকলার সৌকর্য—কিন্তু বিশ্বাস, যে কোনো বিশ্বাসই হোক, প্রাণ-কেন্দ্র থেকে স্বচ্ছ ঝর্ণার মতো উৎসারিত না হলে সৎ কবিতার জন্ম হ'তে পারে না। ধর্ম যদি একটা খোলস হয়ে দাঁড়ায় কিম্বা জোর করে চাপানো হয় মানবিক সত্তায় তা' হলে তার কোনো আবেদন থাকবে না জনসাধারণের মনে। কবিতা অধঃপতিত হবে একটা নীরক্ত বিশীর্ণতায়। পুর্ব বাঙলার কবিতায় আমরা—আরব নয়—পুর্ব বাঙলাকেই পেতে চাই। এখানকার নাড়ীস্পন্দনই ধ্বনিত হবে আমাদের সাহিত্যে—তা না হলে জনসাধারণের মনে শিকড়

মেলতে পারবে না তথাকথিত ইসলামী কবিতা। ইসলামী ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনে বিশ্বাসী যে-সব কবি তাঁদের পুরোধা, high priest হলেন ফররুখ আহমদ। নজরুলের 'জিঞ্জির'-এর উত্তরাধিকার ফররুখ আহ্‌মদের অধুনাতম কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজাম মুনীরা'। আরবী, ফারসী শব্দের ব্যবহার করে, পুঁথি সাহিত্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করে তিনি নিজস্ব একটা পরিমণ্ডল এবং diction তৈরী করতে পেরেছেন। আরবী ফারসীর সুদক্ষ ব্যবহার করে তিনি জাঁকালো ধ্বনি সৃষ্টি করেছেন, সে ধ্বনি ব্যক্তিগত ভাবে আমি উপভোগ করেছি, কিন্তু যখন তিনি মুদ্রাদোষের খপ্পরে পড়ে মাত্রাজ্ঞান হারিয়েছেন তখনই তাঁর কবিতা রীতিমতো পীড়িত করেছে আমাদের চেতনাকে। ফররুখ আহ্‌মদ সে-সব বিরল কবিদের অন্যতম যাঁরা খুব অল্পদিনেই অনুকারকের দল সৃষ্টি করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর অক্ষম অনুকারকদের হাতে বাঙলা কবিতা রীতিমতো বিপর্যস্ত হচ্ছে। তাদের প্রগল্‌ভ রচনা আর যাই হোক কবিতা তো নয়ই এমন কি বাঙলাও নয়; ফররুখ আহ্‌মদের সর্বপ্রথম কাব্য-গ্রন্থ 'সাতসাগরের মাঝি' সত্যিকারের সাড়া তুলেছিলো। সর্বপ্রথম হলেও সাতসাগরের মাঝিই এখন পর্যন্ত ফররুখ আহ্‌মদের সবচেয়ে পরিণত গ্রন্থ। এ বইয়ে এমন কতকগুলো উজ্জ্বল কবিতা রয়েছে যার দীপ্তি ফররুখ আহ্‌মদের সাম্প্রতিক কবিতায় অনুপস্থিত। ইদানীং তিনি সে ধরনের কবিতা আর লিখিছেন না, লিখলেও প্রকাশ করছেন না। আজকাল তাঁর কলম দিয়ে যা বেরুচ্ছে তাকে কবিতা বলতে অন্তত আমি রাজী নই কোনোমতেই। আমার মতে সেগুলো হলো পদ্যে লেখা কাঁচা রাজনীতি। আশা করি, কেউ আমার একথার কোনোরকম কদর্থ করবেন না। আমি অবশ্যি এ কথা বলতে চাইনি যে কবিতায় রাজনীতি থাকবে না। রাজনীতিকে আশ্রয় করেও ভালো কবিতার জন্ম সম্ভব। আমার এ উক্তির সাক্ষ্য দেবে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চটি বই 'পদাতিক'। কবি হিসেবে তার প্রধান কর্তব্য হলো ভালো কবিতা লেখা, সৎ কবিতা লিখতে পারলেই কবিদের কাছ থেকে যথেষ্ট

সাহায্যপ্রাপ্ত হবে সমাজ। কবিরা যদি কবিতা না লিখে শুধু রাজনীতিতেই মেতে থাকেন তা হলে সমাজের আর যে দিকই উজ্জ্বল হোক কবিতা যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তাই, ফররুখ আহ্‌মদ যদি কবিতা লেখায় অধিক মনোযোগী হন তা হলেই আমরা উপকৃত হবো। তাঁর শক্তিতে বিশ্বাসী বলেই এসব কথা বলার তাগিদ অনুভব করেছি।

যাঁদের কবিতার শরীরে রবীন্দ্রকাব্যের জলবায়ু লেগে রয়েছে চিরকাল, রবীন্দ্র-পরিমণ্ডল থেকে যাঁরা কোনোদিনই মুক্তি পান নি শাহাদাৎ হোসেন তাঁদের অন্যতম। অন্যান্য অনেক কবির মতোই তিনি আজ পাঠক-সমাজে অগ্রাহ্য। ডোডো পাখির সঙ্গে তুলনা করা যায় তাঁর কাব্যকে। দিন দিন লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সুদূরের ধূসরতায়। যদিও তিনি কিছু ভালো কবিতা লিখতে পেরেছিলেন যৌবনে, বর্তমানে তাঁর কবিকর্মে উপকৃত হচ্ছেন না কোনো তরুণ কবি কিম্বা শাহাদাৎ হোসেন নিজেও লাভবান হতে পারছেন না তেমন। রবীন্দ্রকাব্যের ছায়ায় আজীবন লালিত হয়ে, বিকশিত হতে পারে নি তাঁর কবিতা বরং রবীন্দ্র-প্রভাব গ্রাস করেছে তাঁর শক্তিকে। আজ তিনি বার্ধক্যের অন্ধকারে ম্লান। তাঁর সাম্প্রতিক কবিতা সম্বন্ধে এক কথায় বলা যায় যে সেগুলো সংস্কৃত ঐতিহ্যে লেখা ইসলামী কবিতা। অনেক সময়ই এসব প্রচেষ্টা কবিতা হয়ে উঠতে পারছে না তবু তাঁর পুর্বের ছন্দের প্রবহমান গাম্ভীর্য এখনও কতকটা রয়ে গেছে। এমন অনেক কবি আছেন যাঁদের সবগুলো রচনা পড়া উচিত নয়, পড়লে তাঁদের উপর অবিচার করা হবে। তাই তাঁদের ভালো কবিতা-গুলো নিয়ে একটা সংকলন প্রকাশিত হলেই পাঠক উপকৃত হয়। শাহাদৎ হোসেন, আমার মনে হয়, এ ধরনের কবি। সম্প্রতি 'রূপছন্দা' বলে তাঁর কবিতার একটি সংকলন বেরিয়েছে।

মহাযুদ্ধ শুধু ইউরোপের সমাজ-মানসকেই বিধ্বস্ত করে নি, সারা পৃথিবীর ভিত নড়ে উঠেছে যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতিতে। হতাশায় কালো হয়ে গেছে মানুষ। জীবনের বিভিন্ন দিকের প্রচলিত সামাজিক ও নৈতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছে মার্ক্স-ফ্রয়েড-পড়া দুই যুদ্ধের মাঝখানে গঠিত মন। তাই তিরিশের কবিদের কাব্যে ধরা পড়েছে এই সময়ের বিষণ্ণতা, ক্লান্তি, হতাশা আর ধূসরতা! আবুল হোসেন এবং আহসান হাবীবের কাব্যোদ্যমে মধ্যবিত্ত হতাশা আর ব্যঙ্গ মূর্ত হয়ে উঠেছে, ক্রমশঃ একটা স্পষ্টতায় এগিয়ে গেছে। কিন্তু তাঁরা মূলতঃ প্রেরণা পেলেন তিরিশের বিখ্যাত বাঙালী কবিদের কাব্য থেকেই। জীবনানন্দ দাশ, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন, বিষ্ণু দে প্রভৃতি কবির ছায়ায় বেড়ে উঠেছে আবুল হোসেন এবং আহসান হাবীবের কবিতা। যদি বলি যে এ দুজন কবি তিরিশের কবিদের ছায়ামাত্র তাহ'লে তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে। পূর্বসূরীদের প্রভাব স্বীকার করে নিয়েও তাঁরা স্বতন্ত্র।

উৎকৃষ্ট নিকৃষ্ট কিছু কবিতা নিয়ে কয়েকবছর আগে প্রকাশিত হয়েছিলো আবুল হোসেনের প্রথম কবিতার বই 'নব-বসন্ত'। যে কারণেই হোক আমরা সেই বসন্তকে উপেক্ষিত হতে দেখলুম। তবে প্রথম থেকেই আবুল হোসেন সচেতন কবি-মনের অধিকারী। তিনি যদ্দূর সম্ভব কবিতাকে চলতি ভাষার আওতায় আনতে চেষ্টা করছেন, আর এ বিষয়ে তিনি বিশেষ করে অমিয়-চক্রবর্তীর কাছেই পাঠ নিয়েছেন। যদিও আবুল হোসেন অধিকাংশ সময় সমসাময়িক ঘটনা নিয়ে কবিতা লিখেছেন তবু ব্যক্তিগতভাবে আমি তাঁর প্রেমের কবিতাগুলোর অনুরাগী। বিভাগোত্তর যুগে তিনি অন্ততঃ তিনটি উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখতে পেরেছেন—শেষযুক্তি, বন্ধুর জন্য, স্বদেশী কোরাস। তবে আবুল হোসেন পাঠক-সমাজের কাছে তাঁর প্রাপ্য সম্মান এখনো পান নি, অথচ তিনি আমাদের একজন প্রধান কবিকর্মী।

আবুল হোসেনের মতো আহসান হাবীবের কবিতায় বুদ্ধিবৃত্তি অতটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে না সাধারণতঃ, তাঁর কবিতা হাওয়া দেয় অনুভূতির নীলাভতম উৎস-কেন্দ্রে। কিন্তু অসৎ সময়ের ধুলোয় তিনি বিষণ্ণ। হ্যাঁ, একটা বিষণ্ণতা তাঁর কবিতায় কুয়াশার মতো ব্যাপ্ত। আর এখানেই তাঁর কাব্যের সৌন্দর্য। চিন্তার গভীরতা হয়তো পাওয়া যাবে না আহসান হাবীবের কবিতায়, প্রগাঢ় ইতিহাস-চেতনাও অনুপস্থিত—তবে তিনি বেশ কিছু সংখ্যক পরিচ্ছন্ন ভালো কবিতা লিখেছেন। পরিচ্ছন্ন সুরেলা কবিতা লিখতে পারাটাও কিছু কম কথা নয়। এই পাঁচ বছরে তিনি যে সব উল্লেখযোগ্য কবিতা লিখেছেন সেগুলোর ভেতর অধিকাংশই ব্যঙ্গ কবিতা। একটা জিনিষ লক্ষ্য করে আহত হয়েছি যে ইদানীং তিনি প্রেমের কবিতা আর লিখছেন না। প্রেমের কবিতা না লেখার পিছনে একটা বিকৃত মনোভাব কাজ করছে আজকাল। এটা এক ধরনের অসুস্থতার লক্ষণ বলেই আমি মনে করি। যাই হোক, লিরিকের ক্ষেত্রে তাঁর সুনাম সর্বজনস্বীকৃত।

উল্লিখিত দুজন কবির প্রায় সমসাময়িক আরো দুজন কবি প্রতিশ্রুতি নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। সানাউল হক এবং হাবীবুর রহমান। এঁদের কারুরই কোনো কবিতার বই প্রকাশিত হয়নি—ভয় হয়, হয়তো শেষ পর্যন্ত এঁরা শুধু মাত্র প্রতিশ্রুতির চিহ্ন হয়েই থাকবেন। তারপর সানাউল হক এবং হাবীবুর রহমানের পাশে এসে দাঁড়ালেন আশরাফ্ সিদ্দিকী। তিনি প্রথমেই বেশ কিছুটা দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন অনেকের। ছন্দের টুং-টাং ধ্বনি দিয়ে তিনি পাঠকদের মন ভুলিয়েছিলেন। আমরা আশা করেছিলাম আশরাফ্ সিদ্দিকী ভবিষ্যতে হয়তো আরো পরিশ্রমী এবং মনোযোগী হবেন। হয়তো স্পষ্ট হয়ে ধরা দেবে তাঁর নিজের গলার আওয়াজ। কিন্তু আমাদের প্রায় হতাশ করেই তাঁর কবিতা উত্তরোত্তর বিরক্তিকর তারল্যে অধঃপতিত হলো। অত্যধিক অনুকরণপ্রিয়তা তাঁর সমূহ ক্ষতি করেছে। বিভিন্ন কবিকণ্ঠের ধ্বনিতে আশরাফ্ সিদ্দিকীর গলা কোথায় হারিয়ে গেছে। আজ যখন বাঙলা

কবিতা প্রৌঢ়ত্বের হেমন্তরোদ পোহাচ্ছে তখন কোনো বয়স্ক কবির কবিতায় শিশুসুলভ তারল্য অমার্জনীয় হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৫১ সনে তাঁর প্রথম কবিতার বই 'তালেব মাষ্টার ও অন্যান্য কবিতা' প্রকাশিত হলো। তবু উল্লিখিত কাব্য-গ্রন্থে কিছু ভালো কবিতা ছিল, কিন্তু ইদানীং তাঁর কবিতাগুলো প্রগল্‌ভতায় অপরিচ্ছন্ন, ক্লান্তিকর। এরও একবছর পরে আব্দুর রশীদ খাঁন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'নক্ষত্র : মানুষ : মন' নিয়ে উপস্থিত হলেন। বইয়ের একটি কি দুটি ছাড়া অধিকাংশ কবিতাই তরল ভাবালুতার এলোমেলো প্রকাশ।

এই বেশ কিছুদিন আগে আশরাফ্ সিদ্দিকী এবং আবদুর রশীদ খানের সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করেছিল তেরজন তরুণ কবির কবিতার সংকলন : 'নতুন কবিতা।' যদিও বইটির নাম 'নতুন কবিতা' দুঃখের বিষয় প্রকৃত অর্থে নতুন কোনো কবিতাই ছিল না সংকলনটিতে। তবে কয়েকজন কবির অস্পষ্ট বিশিষ্টতা প্রথম থেকেই চিহ্নিত হয়ে রইলো। এই তরুণ কবিদের স্বপক্ষে বলতে গেলে বলতে হয় তাঁদের নিবিড় আন্তরিকতার কথা। চুলচেরা বিশ্লেষণ করে দেখলে অবশ্যি অনেক দুর্বলতাই ধরা পড়বে এঁদের রচনায় ; আর কবি হিসেবে যাঁদের বয়স চার কিম্বা পাঁচ বছরের বেশি নয় তাঁদের কাছে দোষ-ত্রুটিহীন পরিণত কবিতা আশা করাটা, আমার মনে হয়, খুব বড় প্রত্যাশা। কেননা এঁরা অনেকদিন থেকেই প্রতিকূল আবহাওয়ায় কাব্যসাধনা করছেন। তবে আশার কথা যে এঁদের অনেকেই ক্রমশঃ কুশলতার পরিচয় দিচ্ছেন। যদিও তিরিশের বিখ্যাত কবিরা এঁদের কবিতায় খুব বেশি আনাগোনা করছেন, তবু একটা উজ্জ্বল প্রতিশ্রুতি পরিলক্ষিত হচ্ছে এই তরুণ কবিদের কাব্যোদ্যমে। আর এঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন হাসান হাফিজুর রহমান, সাইয়িদ আতীকুল্লাহ এবং আলাউদ্দিন আল-আজাদ। মধ্যবিত্ত হতাশার অন্ধকার নেই এ তিনজনের কবিতায়, বরং একটা বলিষ্ঠ আশাবাদ অনুরণিত হচ্ছে এঁদের প্রত্যেকটি রচনায়। কেননা মানুষের অপরিমেয় শক্তির প্রতি এঁরা বিশ্বাসী, পৃথিবীর সম্ভাবনায় এঁরা আস্থাশীল।

শুধু এই নয়, কাব্যরীতি সম্বন্ধেও এঁরা মনোযোগী এবং পরিশ্রমী। তরুণ কবিরা একাধারে প্রতিশ্রুতিশীল এবং পরিশ্রমী বলেই আশা করা যায় যে এঁদের কবি-কর্মে উত্তরোত্তর সাহায্যপ্রাপ্ত হবে আমাদের কবিতার ধারা। মোটামুটি ভাবে গত পাঁচবছরের পুর্ববাঙলার কবিতা সম্বন্ধে বলতে চেষ্টা করেছি—আলোচনা পুর্ণাঙ্গ হয়নি বলে আমি নিজেই সবচেয়ে বেশি পীড়িত। তবু এটুকু সান্ত্বনা যে আমাদের সাম্প্রতিক কবিতার আংশিক পরিচয়ও আপনাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছি।

পুর্ববাংলার নাট্যসাহিত্যের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাবে এই গ্রন্থের অন্যত্র কাজী মোতাহার হোসেনের কথাসাহিত্য-বিষয়ক প্রবন্ধে—সম্পাদক।

পাঁচ বছরের কবিতা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

"সাহিত্যে মানুষের চারিত্রিক ভালো মন্দ দেখা দেয় ঐতিহাসিক নানা অবস্থাভেদে। কখনো কখনো নানা কারণে ক্লান্ত হয় মানুষের শুভবুদ্ধি, যে বিশ্বাসের প্রেরণায় তাকে আত্মজয়ের শক্তি দেয় তার প্রতি নির্ভর শিথিল হয়, কলুষিত প্রবৃত্তির স্পর্ধায় তার রুচি বিকৃত হতে থাকে, শৃঙ্খলিত পশুর শৃঙ্খল যায় খুলে, রোগজর্জর স্বভাবের বিষাক্ত প্রভাব হয়ে ওঠে সাংঘাতিক, ব্যাধির সংক্রামকতা বাতাসে বাতাসে ছড়াতে থাকে দূরে দূরে। অথচ মৃত্যুর ছোঁয়াচ লেগে তার মধ্যে কখনো কখনো দেখা দেয় শিল্পকলার আশ্চর্য নৈপুণ্য।...তারই প্রতি বিশেষ লক্ষ্য নির্দেশ ক'রে যে রসবিলাসীরা অহংকার করে, তারা মানুষের শত্রু। কেননা সাহিত্যকে শিল্পকলাকে সমগ্র মনুষ্যত্ব থেকে স্বতন্ত্র করতে থাকলে ক্রমে সে আপন শৈল্পিক উৎকর্ষের আদর্শকেও বিকৃত ক'রে তোলে।"

রবীন্দ্রনাথের এই সাবধানবাণী মনে রেখেই গত পাঁচ বছরের বাংলা কবিতার কলাকৌশলের বিচার করতে হবে।

পাঁচ বছর আগে নয়, তার ঢের আগেই বাংলা কবিতা শিরদাঁড়া সোজা ক'রে মাটিতে পা রেখে চলবার সংকল্প নিয়েছিল। সে তাগিদ এসেছিল দেশেরই মাটি থেকে। শুধুমাত্র বাইরের হাওয়া বাংলা কবিতাকে এভাবে তোলপাড় করতে পারত না। সদর দরজা হাট ক'রে খুলে দিয়ে বাংলা

কবিতা মানুষের মুখের ভাষাকে, ধুলোকাদালাগা পায়ের চলার দৃপ্ত ভঙ্গিকে ঘরে তুলে আনল। কোন কিছুকেই সে পরোয়া করল না; বিধিনিষেধের বেড়াগুলোকে সে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো ক'রে দিল। জীবনের সমস্ত তল্লাট জুড়ে শুরু হ'ল তার চলাফেরা। কবিতায় কিছুই অপাঙ্‌ক্তেয় রইল না। যেখানে যত জঞ্জাল, যেখানে যত কালিমা—তাকে একত্রে পুঞ্জীভূত ক'রে সে জবাব চাইল—হে ঈশ্বর, এই তোমার সুন্দর পৃথিবী ?

যাঁরা প্রথম বাংলা কবিতার কলাকৌশল ভেঙেচুরে সাধারণ মানুষের জীবনের কাছাকাছি নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, তাঁদের অনেকেই বাড়ী থেকে পালানো ছেলের মত দুদিন পর বাড়ীর শাসন মেনে নিয়ে ঘাড় গুঁজে ঘরে ফিরেছেন। বাইরে জনসমুদ্রে মিশে গিয়ে নয়, গুহার নির্জন কোণে ব'সে তাঁরা কবিতার মুক্তিসাধনায় ধ্যানস্থ হলেন।

দলছাড়া শুধু বিষ্ণু দে। তাঁর মুখ জনতার দিকে ফেরানো। কিন্তু কুনো স্বভাব তাঁর যায়নি। তাঁর কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয় যেন তিনি নিজেকেই সহস্র ক'রে দেখছেন। তাঁর সঙ্গে যেখানে যতটুকু যার মিল, তাঁর কবিতা প'ড়ে তার মনে শুধু ততটুকুই সঞ্চারিত হয় আবেগ। ছন্দ তাঁর হাতে দুর্বহ ভার নয়, যখন যেমন ইচ্ছে তিনি তাকে খেলাচ্ছেন। মাত্রা কমিয়ে বাড়িয়ে ছন্দের বেগ তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। কখনও ক'ষে ধরেন, কখনও আল্গা দেন। শব্দনির্বাচনে তিনি দৃক্‌পাতহীন। এমন গোঁয়ারের মত তিনি অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করেন যে পড়তে পড়তে অনেক সময় ধৈর্য রাখা যায় না। ছবি ও ধ্বনির এমন দক্ষ ব্যবহার সমসাময়িক আর কোন কবির মধ্যেই চোখে পড়ে না। তাঁর ছবির বিশেষত্ব এই যে সেগুলো একরঙা ছবি নয়—বিচিত্র বহুবর্ণ ছবি। ছবিগুলো স্থির নয়, বিচ্ছিন্ন নয়—একই গতির মধ্যে দোলায়িত হয়ে তারা ছায়াচিত্রের মত চোখে ভাসে। অক্লান্ত কর্মীর মত তিনি সৃষ্টি ক'রে চলেছেন। কলাকৌশলের দিক থেকে তাঁর অন্তহীন জিজ্ঞাসা এই পাঁচ বছরে এক নতুন লক্ষ্য চিহ্নিত করেছে :

"চাই না তোমার কাব্যে ক্রুতলভ্য মিল।
এ অভাবে অনটনে নিষ্পেষিত দৈনন্দিনে
আমি খুঁজি মানসের সেই পরিক্রমা
যেখানে অচ্ছোদ জলে সগুস্নাত তুমি
মেলে দাও চোখ, দুই পাখা
দুই মানসবলাকা
চলে' যায় দিক্‌চক্রবালে সবুজ শিখরে
যেখানে তমালতালীবনরাজিনীলে উন্মুখর সমুদ্রসলিল।

চাই না সংসারে বন্দী আপাত পয়ার
মলিন বাসরে বন্দী শুধু প্রিয়তমা।
মৈত্রী দাও সহচরী ছন্দে ছন্দে কর্মে প্রাণে
মোহানায় প্রেমের প্রয়াণে
মুক্তি দাও বৃন্তে বৃন্তে তোমার বাহুতে
মেরুতে মেরুতে দাও পাখার সঞ্চার
তরঙ্গে তরঙ্গে ভেঙে অন্ধকার ভেঙে স্বরঙ্গমা
অত্যাচারে অনটনে তোমার ঘরের দীপে অমাবস্যা
দীপাবলী হোক পরিগ্রাহী শ্রেণীবন্ধহীন দীর্ঘকণ্ঠস্বর নেরুদার
দীর্ঘমাত্র অমিত্রাক্ষরের।

... ...

শব্দের অর্থের ছন্দের স্বরের দ্বন্দ্বে রূপান্তর
শব্দে শব্দে আপতিক ভেদাভেদ অতিক্রমি
কবিতায় কবিতায় স্বাতন্ত্র্যের অনন্য ও অন্যোন্যের
যোগাযোগে অর্থের বিন্যাস। তাই অত্যাচার
ধ্বংস হোক গাই, অভিধায় স্বয় নিপাতনে

ধ্বনির মুক্তিতে গাই, ধ্বনি খুঁজি পথের ধ্বনিতে
জুলুমের প্রতিবাদে, দাবির সম্বাদে। জীবনের দাবি।"

অরণ্যে পথ হারিয়ে নির্জন গুহাকোণে আগের যুগে যাঁরা প্রস্থান করেছিলেন, তাঁদেরই একজন দলছুট কবি এইভাবে এ যুগের আকুতিকে প্রকাশ করলেন। দুই যুগের ব্যবধানকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বাংলার তরুণ কবিকুল হেঁকে উঠল :

"বারো বছর আগে তুমি যাকে দেখেছিলে
তরুণ বালক
অন্ধ পাষাণে মাথা কুটতে
বারো বছর পরে আবার তাকে দেখ
অন্ধ আবেগে পাষাণ কারা ভাঙতে।

... ...

রবীন্দ্রনাথ, আমরা তীব্র ঘৃণায় পবিত্র হয়েছি
আমরা তীক্ষ্ণ হিংসায় আগ্নেয়গিরি
আমাদের ভালবাসায় উজ্জ্বল পৃথিবী।

বারো বছর আগের সেই অসহায় তরুণ
আজ অন্ধ কারার কবাট ভেঙে ফেলেছে
কুন্দ ফুলের মত ভোর বেলার আলো
যুগান্তরের অন্ধকারকে ছিঁড়ে ফেলেছে।
আমি সেই দুঃসাহসী যুবক
মিছিলের মাথায় এগিয়ে যাই

আমার প্রণাম নাও, রবীন্দ্রনাথ
আমাকে আশীর্বাদ করো, রবীন্দ্রনাথ।" (রাম বসু)

রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "কাব্যের অধিকার প্রশস্ত হতে চলেছে। গদ্যের সীমানার মধ্যে সে আপন বাসা বাঁধছে ভাবের ছন্দ দিয়ে। একদা কাব্যের পালা শুরু করেছি পদ্যে, তখন সে মহলে গদ্যের ডাক পড়েনি। আজ পালা সাঙ্গ করবার বেলায় দেখি, কখন অসাক্ষাতে গদ্যে-পদ্যে রফা-নিস্পত্তি চলেছে। যাবার আগে তাদের রাজিনামায় আমিও একটা সই দিয়েছি। এক কালের খাতিরে অন্যকালকে অস্বীকার করা যায় না।"

সেই অকুণ্ঠ স্বীকৃতি বৃথা যায়নি। গত পাঁচ বছরের কবিতার দিকে তাকালে দেখা যায় বহু স্মরণীয় রচনাই গদ্যে লেখা হয়েছে। যেমন ক'রে আমরা একজন আরেকজনের কাছে কখনও রাগে, কখনও ঘৃণায়, কখনও ভালবাসায় প্রতি মুহূর্তে নিজেদের হৃদয় খুলে ধরি—তেমনি ক'রে জীবনের সেই সহজ সুর গদ্যের ভেতর দিয়ে কবিতায় ধরা গেছে। গদ্য কবিতা সম্পর্কে আজও পাঠকদের অবজ্ঞা যায়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও গদ্য কবিতা আগের চেয়ে অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গদ্য যদি কবিতার বাহন হয়, তাহ'লে রাতারাতি অকবিরা কবি হয়ে উঠবে—যাঁরা এতদিন ধ'রে এই ভয় দেখিয়ে আসছিলেন, তাঁরা তাঁদের স্বপক্ষে আজও জেলজরিমানা দেবার মত তেমন কোন প্রমাণ দাখিল করতে পারেন নি।

কবি যখন তারস্বরে ডাকে :

"শোন,
বাইরে এস
বাঁকের মুখে পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে ;
শোন—বাইরে এস,
ধান বোঝাই নৌকো রাতারাতি পেরিয়ে যাচ্ছে
খোকাকে শুইয়ে দাও
বিন্দার বৌ শাঁখে ফুঁ দিয়েছে

এবার আমরা ধান তুলে দিয়ে
মুখ বুঁজে মরব না,
এবার আমরা তুলসীতলায়
মনকে বেঁধে রাখবো না
বাঁকের মুখে কে যাও, কে ?
লণ্ঠনটা বাড়িয়ে দাও
আমাদের হাঁকে রূপনারানের স্রোত ফিরে যাক
আমাদের সড়কিতে কেউটে আঁধার ফর্সা হয়ে যাক
আমাদের হৃৎপিণ্ডের তাল দামামার মত
ঝড়ের চেয়েও তীব্র আমাদের গতি।" (রাম বসু)

সে ডাক শুনে মনে হয় পেছন থেকে কে যেন আমাদের এক অস্থির তাড়নায় ঠেলে এগিয়ে দিচ্ছে। জনাকীর্ণ সভা আর মিছিলে এ কবিতা যদি পড়া যায়, তাহ'লে বলা যায় না—হয়ত এর ছন্দ ধনুকের ছিলার মত কাজ করতে পারে।

কবিতা—তা সে পদ্যছন্দেরই হোক, আর গদ্যছন্দেরই হোক—একমাত্র মুক্তি তার দেশকালজোড়া মানুষের সান্নিধ্যে। যে শব্দে মানুষের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাকে কবর খুঁড়ে তুলে এনে চালাবার হাজার চেষ্টা করলেও তা চলবে না। যে ভাষায় লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের বিচিত্র আবেগ প্রকাশ করে, যে ভাষার জন্যে ব্যাকুলভাবে তারা হাত বাড়িয়ে আছে—সেই ভাষাই হবে একালের সার্থক কবির ভাষা। নতুন নতুন বস্তু, নতুন নতুন ধারণা, নতুন শব্দের পোশাকে মানুষের জীবনকে জমকালো করে তুলছে। পুরনো কত শব্দের অর্থ বদলে যাচ্ছে। 'মিছিল' কিম্বা 'শোভাযাত্রা' আজ আর শুধু একদঙ্গল মানুষ নয়। তারা অনিচ্ছুক হাত থেকে জীবন ছিনিয়ে নিতে চলেছে। 'ক্যারাভানে'র জায়গা নিচ্ছে আজ 'কন্‌ভয়'। শুধু অর্থের বনিবনার জন্যে নয়, 'কন্‌ভয়' অনেক বেশি জোরালো; তার চাকার টক্কর আজও আমাদের

কানে লেগে আছে, তার গায়ের সবুজ হিজিবিজি চক্রগুলো আজও আমরা চোখ বন্ধ করলে দেখতে পাই।

বাঙালী জাতির বিচিত্র আবেগ ছন্দের বৈচিত্র্যে ধ্বনি পেয়েছে। স্বাধীনতার পদধ্বনি শুনে অধীর আগ্রহে উঠে বসেছে বাংলাদেশ। তারপর ভাই ভাইয়ের হাতে খুন হতে হতে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে মাছির মত মরে যেতে যেতে বুঝেছে—বড্ড ঠকান্ ঠকেছে। যারা দায়ী, গ্রাম আর শহর তাদের চোখে চোখ রেখে বলেছে—জবাব দাও। জবাব এসেছে। কিন্তু গুলির মুখে। তবু তাদের থামাতে পারা যায় নি। চোখের ঘোর মুছতে মুছতে অগণিত মানুষ দুরন্ত স্পর্ধা নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। একবার আশায়, একবার হতাশায়, জয়-পরাজয়ে গাঁথা জীবন বিচিত্র সুরতরঙ্গে উন্মুখর হয়েছে। একই কবির মধ্যে তা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কখনো চোখের দুকূল ছাপিয়ে উঠেছে বেদনায়, কখনো দুহাত বাড়িয়ে দিয়েছে অনেক আশায়, কখনও আশাভঙ্গের অভিশাপ আকাশ বিদীর্ণ করেছে।

কিন্তু সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকেও যিনি কিছুর মধ্যেই নন, সেই ভাবান্তরহীন কবি হলেন জীবনানন্দ দাশ। সমস্ত কিছুই তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন আর তারপর একের পর এক তাদের মুখগুলো ধূসর কুয়াশায় মুড়িয়ে দেন। নাম, সংখ্যা, আকৃতি—তাঁর কাব্যে কথার কথা মাত্র। প্রাকৃত থেকে অপ্রাকৃতে, আকার থেকে নিরাকারে তাঁর যাত্রা। সময়ের কণ্ঠরোধ ক'রে তিনি কথা বলেন, শব্দ তাঁর কাছে বস্তুবিরহিত সংকেত মাত্র। বিপরীত ভাব গায়ে গায়ে জুড়ে তিনি তাসের ঘর সাজান, তারপর নিজেই নিয়তিপুরুষ সেজে এক ফুঁয়ে সে ঘর উড়িয়ে দেন। অমিয় চক্রবর্তীও এই খেলারই খেলোয়াড়। হাই তুলে বলেন, বাড়ী যাবো। দেখেন না—ঠিক সেই সময় অন্ধকারে মুখ ঢেকে একটা লুব্ধ কুটিল হাত মহানন্দে তুড়ি দিচ্ছে। মানুষের ভাগ্যের প্রতি এই উদাসীন অবজ্ঞা, এই নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা কবিতায় আনে শ্মশানের স্তব্ধতা। ছন্দ প্রস্থান করে, গতি নিক্রান্ত হয়। প'ড়ে থাকে শুধু শূন্যতার হাহাকার। যাঁরা

কবিতার গলায় মালা দিয়েছেন, নিবাত নিষ্কম্প মৃত্যুর এ পথ তাঁদের সাজে না।

পাঁচ বছরে বাংলা কবিতা সেই আত্মঘাতী পথে যায়নি। তরুণ অভিযাত্রীদল বাধা ঠেলে এগিয়েছে। অন্ধকারের বুকে দাঁড়িয়ে রৌদ্রঝলকিত অব্যর্থ সকালকে তারা দেখেছে। যখন তারা ব্যথায় ককিয়ে উঠেছে, তখনও চোখ থেকে আনন্দউজ্জ্বল স্বপ্ন মুছে যায়নি। পায়ের শব্দে শব্দে তারা উচ্চকিত ক'রে তুলেছে শুকনো পাতার অরণ্যকে। ছন্দের আলিঙ্গনে বেঁধেছে তারা জীবনের বিদ্যুৎগতিকে। বাংলা কবিতাকে আজ সামনে এগিয়ে নিয়ে চলেছে একজন দুজন মহারথী নয়, দৃঢ়সংকল্প একটি বাহিনী। গত পাঁচ বছরের বাংলা কবিতার দিকে তাকালে তা বোঝা যায়। সকলের হাতের অস্ত্র সমান নয়। কারো হাতে গর্জে উঠছে কামান, দুর্যোগ মাথায় নিয়ে কেউ পথ কাটছে, সেতু বাঁধছে। লক্ষ্য এক, কিন্তু কাজের বিচিত্র কৌশল। কেউ চড়া গলায় হেঁকে কথা বলছেন; সময়ের কথা সময়ে বলতে তাঁদের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। কারো কারো স্বর উচ্চগ্রামে বাঁধা নয়; পাশে ব'সে ধীর সুস্থিরভাবে তাঁরা গভীর অন্তরঙ্গ সুরে কথা বলেন। কেউ বিদ্রূপে শাণিত, কেউ অসংগতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখান। কারো স্বরে অশান্ত ব্যাকুলতা, কেউ ফেটে পড়ার উন্মুখ আবেগে গম্ভীর। বাংলা কবিতায় এই ঐকতান আজ খুব বেশি ক'রে স্পষ্ট।

বিগত পাঁচ বছরের বাংলা কবিতার ত্রুটি অনেক, অসম্পূর্ণতা অনেক। চেঁচিয়ে কথা বলতে গিয়ে অনেক সময় চেঁচিয়ে কথা বলাটাই অনেকের অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে যে তা নিছক চেঁচামেচিতে পরিণত হয়ে শ্রোতাদের কান ঝালাপালা করে, তার বিলক্ষণ প্রমাণ গত পাঁচ বছরে পাওয়া গেছে। বলবার আগে অনেকেই ভেবে দেখতে ভুলে যান কথাটা চেঁচিয়ে বলবার মত কিনা এবং যিনি চেঁচাবেন তাঁর বলবার জোর আছে কিনা। আবার অনেকে চাপা গলায় ফিস্‌ফিস্ ক'রে এমন কথা

বললেন, যা লোকের জানা কথা—বহু আগেই তা রাষ্ট্র হয়ে গেছে। শত্রুর বিরুদ্ধে ঘৃণা জানাতে গিয়ে কেউ কেউ তার বীভৎস চেহারা এমনভাবে খুলে ধরেন যে, তাতে ক্রোধ জাগার বদলে কবিতা প'ড়ে গা ঘিন্‌ঘিন্‌ করে। ঘৃণা হ'ল ভালবাসারই আর-এক চেহারা একথা তাঁরা ভুলে যান। যাকে ভালবাসি, তাকে আমি সমস্ত আপদ্‌ থেকে বুক দিয়ে রক্ষা করি। ভালবাসার মধ্যে বীর্য আছে; ভালবাসা ক্লীব, অসহায় নয়। সে আক্রান্ত হ'লে তবেই শত্রুর প্রতি জলন্ত ঘৃণায় অস্ত্র হাতে নেয়। ঘৃণা হ'ল ভালবাসার পাহারাদার—তার দরকার পড়ে কিন্তু তার সঙ্গে তাই বলে ঘর করা যায় না। আজকের বাংলা কবিতার যে দুর্বলতার কথা বললাম আমার নিজের কবিতাও তা থেকে মুক্ত নয়।

গত পাঁচ বছরের বাংলা কবিতায় আঙ্গিকের দিক থেকে সব থেকে উল্লেখযোগ্য যদি কিছু থাকে, তা হ'ল লৌকিকের স্পর্শ। আধুনিক কবিতায় চল্‌তি প্রবাদ প্রবচনের হাওয়া লেগেছে অনেকদিন আগে। কিন্তু তাকে নাচাতে পারে নি। ছড়ার সুরও কিছু কিছু লেগেছিল। কিন্তু সেটা ছিল মাঝে মধ্যে বাড়ীতে বাউল ডেকে একতারায় গান শোনার মত ভদ্দরলোকের শখ মেটানোর ব্যাপার। কিন্তু এই পাচ বছরে দেখা যাচ্ছে ছড়া হয়ে উঠেছে আধুনিক কাব্যের অন্যতম বিশিষ্ট বাহন। এই বাহনটি বাঙালীর এত চেনা যে আরোহী নতুন হ'লেও সহজেই সে হৃদয়ের অন্দরমহলে প্রবেশের ছাড়পত্র পাচ্ছে। আধুনিক বাংলা কবিতায় বাঙালিয়ানার যে অভাব পাঠক থেকে, শ্রোতার থেকে কবিকে আড়াল ক'রে রাখছিল, সে অভাব দূর হ'তে আরম্ভ করেছে। সব থেকে আশার কথা এই যে, ছড়ার অসংগতি ও অর্থহীনতার ছুতো ধ'রে লোকের চোখে ধুলো দেবার চেষ্টা তাঁরা না ক'রে বরং তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্যের দিকে। পুরোপুরি ছড়ার ধর্ম বজায় রেখেই বলছেন:

তেলের শিশি ভাঙল ব'লে
খুকুর 'পরে রাগ করো

তোমরা যে সব বুড়ো খোকা
ভারত ভেঙে ভাগ করো ?
তার বেলা ?

ভাঙছ প্রদেশ, ভাঙছ জেলা
জমিজমা ঘরবাড়ী
পাটের আড়ৎ, ধানের গোলা,
কারখানা আর রেলগাড়ী ?
তার বেলা ?

তেলের শিশি ভাঙল ব'লে
খুকুর 'পরে রাগ করো
তোমরা যেসব ধেড়ে খোকা
বাংলা ভেঙে ভাগ করো ?
তার বেলা ?
(অন্নদাশঙ্কর)

এ ছড়া ছেলে-ভুলোনো নয়, ছেলের হাতে মোয়া দিয়ে যে ভোলানো চলছে না—এ তারই ছড়া। এ ছেলে মিনু কিম্বা বিনু নয়, এক প্রতিশ্রুত পৌরুষ—যা গোকুলে বাড়ছে।

একটা প্রকাণ্ড অন্যায়কে এমন অনায়াসে স্পর্ধার সঙ্গে দেখিয়ে দেওয়া একমাত্র ছড়াতেই সম্ভব। সহজ এখানে অতিসারল্য নয়, তার মধ্যে রয়েছে পরস্পরের মধ্যে জটিল সম্বন্ধে গ্রথিত সমৃদ্ধ আবেগ। ছড়াকে ভেঙে চুরে, দরকারমত তাকে মেজে ঘষে নিয়ে আধুনিক কবি তার সম্ভাবনাকে আরও প্রসারিত করছেন :

নিভন্ত এই চুল্লীতে মা
একটু আগুন দে

আরেকটু কাল বেঁচেই থাকি
বাঁচার আনন্দে!
নোটন নোটন পায়রাগুলি
খাঁচাতে বন্দী—
দু'একমুঠো ভাত পেলে তা
ওড়াতে মন দিই!
হায় তোকে ভাত দেব কী ক'রে যে ভাত দেব হায়
হায় তোকে ভাত দিই কী দিয়ে যে ভাত দিই হায়

... ...

কান্না কন্যার মায়ের ধমনীতে আকুল ঢেউ তোলে, জ্বলে না
মায়ের কান্নায় মেয়ের রক্তের উষ্ণ হাহাকার মরে না
চললো মেয়ে রণে চললো।
বাজে না ডম্বরু, অস্ত্রে ঝনঝন করে না, জানল না কেউ তা
চললো মেয়ে রণে চললো!
পেশীর দৃঢ় ব্যথা মুঠোর দৃঢ় কথা চোখের দৃঢ় জ্বালা অঙ্গে
চললো মেয়ে রণে চললো!

... ...

যমুনাবতী সরস্বতী কাল যমুনার বিয়ে—
যমুনা তার বাসর রচে বারুদ বুকে দিয়ে
বিষের টোপর নিয়ে!
যমুনাবতী সরস্বতী গেছে এ পথ দিয়ে
দিয়েছে পথ গিয়ে।

নিভন্ত এই চুল্লিতে বোন আগুন ফলেছে!

(শঙ্খ ঘোষ)

পাঁচ বছরের বাংলা কবিতার কলাকৌশলের লঘুগুরু বহুদিক আমার এ আলোচনায় স্থান পায়নি। তার কারণ সমালোচকের যে বিশ্লেষণমুখী প্রখর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি থাকা দরকার, আমার তা নেই। আমি হাতুড়ে কবি। নিজে চলতে চলতে সামনে পেছনে যেটুকু নজরে এসেছে, শুধু তারই একটা অগোছালো ছবি তুলে ধরলাম। অভিজ্ঞতায় বুঝেছি : কেমন ক'রে লিখব, এ প্রশ্নটা যাঁরা ছোট ক'রে দেখেন তাঁদের চোখ নিঃসন্দেহে খারাপ ; কিন্তু কী লিখব, এ প্রশ্নটা যাঁরা এড়িয়ে যান, তাঁরা কানার বেহদ্দ—প্রতি পদে তাঁদের খানাডোবায় পড়ার ভয় থাকে।

আধুনিক কবিতার সামনে জয় করবার আরও বহু দুর্গ আছে। গাথা, গীতিকাব্য, নাট্যকাব্য—এর কিছুই আমাদের নাগালের বাইরে থাকবে না : বাংলা কবিতার এই হোক আগামী পাঁচ বছরের সংকল্প। নাটকীয়তার ইঙ্গিত শুধু জীবনে আছে তাই নয় তার ইঙ্গিত এ যুগের কবিতার মধ্যেও আছে :

আজ যদি সমস্ত সংসার কুটো হয়ে ভেসে যায়
আমার এ অশ্রুর জোয়ারে যদি ডুবে যায়
রসাতলে
দাও ফিরিয়ে
আমার বাছার স্বপ্ন যেটুকু থমকে আছে
দাও
কেঁদে উঠতে দাও
দমবন্ধ আমাকে দাও
পাষাণী আমাকে দাও ফিরিয়ে প্রাণ
... ...
মা, তোমার কান্নার মাঝরাতে
আমি সান্ত্বনা
মা, তোমার আকণ্ঠ তৃষ্ণায়

আমি জল
মা, আমার
...
জাগো
প্রতিজ্ঞা জাগো
নির্মম জাগো
সৃষ্টি কি প্রলয়ে জাগো
ধরণীর গভীর থেকে উৎলে-ওঠা ঘূর্ণিঝঞ্ঝা
হৃদয়
কালবৈশাখীর ঝড়ের ঝাপ্টায়
হৃদয়
সমুদ্র মন্থন-বেগে
নক্ষত্র খসিয়ে জাগো
... ...
ক্ষেতখামারে আমার দখল
শয়তান, পিছু হটো
গ্রাম-জনপদে আমার দখল
শয়তান, পিছু হটো
ফ্যাক্টরি-ব্যারাকে আমার দখল
শত্রু, দূর হও
... ...
কোনদিন পৃথিবী এত সুন্দর ছিল
এত মহান্, কোনদিন ?
সমস্ত মানুষের জন্যে সসাগরা পৃথিবী কোনদিন ?

শান্তির প্রহরী
আমি সারা দুনিয়ার দখল নিলাম।"

(সিদ্ধেশ্বর সেন)

একটি মন্ত্র আজ এক রুদ্ধদ্বার আমাদের সামনে উন্মুক্ত করেছে। সে দ্বার মহাকাব্যের; সে মন্ত্র শান্তির। কেউ একলা না পারে, আসুন আমরা মিলিত হাতে সেই মহাকাব্য রচনা করি। এই একটি মন্ত্রের মধ্যে আসুন আমরা অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতে বিস্তৃত স্মৃতিতে, সংগ্রামে, সম্ভাবনায় স্পন্দমান জীবনকে নিহিত করি। সেই মহাজীবনকে আসুন মহাকাব্যে বাঁধি। বীরত্বের, স্নিগ্ধতার, প্রেমের, স্বপ্নের কথা বলুন। সেই সঙ্গে দামামার, বীণার, মৃদঙ্গের, মাদলের বিচিত্র সুরের ঐকতান উঠুক। একটি সুর শুধু আমরা বর্জন করব—আতঙ্কের; একটি রং শুধু আমরা মুছে দেবো—বিবর্ণ মৃত্যুর।

আর সংকল্প নিই: দেশের কবিতাবঞ্চিত মানুষের আকণ্ঠ তৃষ্ণায় আমরা জল দেবো—অঞ্জলি ভ'রে নির্মল, স্বচ্ছ জল। জীবনকে শুধু আমরা দর্পণের মত প্রতিফলিতই করব না, আমরা হবো জীবনের সংগঠক।

এই ব'লে বিদায় নিচ্ছি যে, হয়ত দেখতে না পেয়ে কাউকে কাউকে আঘাত দিয়েছি। কিন্তু, এত বড় মেলায় তো গা বাঁচিয়ে চলা যায় না—নিজেরও নয়, পরেরও নয়। তাই মেলারই স্বধর্ম ব'লে ওটা কেউ গায়ে মাখবেন না।

কী লিখব

বুদ্ধদেব বসু

আমার একান্ত স্নেহাস্পদ সুভাষের দীর্ঘ আলোচনার সবটা শুনিনি। আংশিক শুনে মনে হল কবিদের মনে প্রশ্ন জেগেছে, কী লিখব? চারদিক থেকে তার নানারকম প্রেস্‌ক্রিপশান আপনারা পেয়েছেন। সাহিত্যিক মহলে অনেক রকম মতবাদ প্রবল হয়ে উঠেছে। বেশ দেখা যাচ্ছে কবিরা, সাহিত্যিকেরা কয়েকটি ছোটো ছোটো শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছেন। আর যাঁরা এই সব শিবিরের আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা বলছেন—আমাদের মতের সঙ্গে মানিয়ে লেখ, আমাদের দেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখ। অন্য যা সব ভেজাল। কবিদের উপর এ উপদেশ অনবরত বর্ষিত হচ্ছে। অনেকে বশীভূতও হচ্ছেন।

'কী লিখব'—আমার তো মনে হয় এ কোনো প্রশ্নই নয়। বলবার কথা বাইরে থেকে আসে না। আসে মন থেকে। কবি এ সংসারে বেঁচে আছেন, সব অনুভব করছেন। কিন্তু কখন কোন হাওয়ায় সৃষ্টির বীজ উড়ে আসবে সে বিষয়ে নিয়ম চলে না। এর কোনো শাস্ত্র নেই। সেই হঠাৎ হাওয়াকে কোনো রকমেই বাইরে থেকে শাসন করা যায় না। সে আপন খেয়ালে আসে যায়। আর বক্তব্য যা, তা যদি মনের মধ্যে না জন্মায়, তবে তো ঘোরতর বিপদের আশঙ্কা। ভাবকে সুসম্পূর্ণ করার জন্যে সৃষ্টিশীল মন যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করে থাকে। কারমাসমতো

কোনো একটা কথা বললেই সেটা কবিতা হল,—না হলেই হল না, এ-মনোভাবের বিরুদ্ধে আমি তীব্র প্রতিবাদ করতে চাই। জীবনানন্দ, অমিয় চক্রবর্তী সম্বন্ধে সুভাষ বললেন যে এঁরা হচ্ছেন শূন্যচারী, প্রকৃত জীবনের সঙ্গে এঁদের যোগ নেই। তাঁর মতে যোগ যাঁদের আছে, তাঁদের রচনা থেকে অনেক উদাহরণ তো শুনলাম। এঁদের মোট বলবার কথা এই যে 'বর্তমান পৃথিবীটা খারাপ। একে ভাঙবো, আবার নতুন করে গড়ব।' গত পাঁচ বছরে এরকম বহু লেখা হ'য়েছে। তাদের মধ্যে কবিতা হয়েছে কটি? খুব চেঁচিয়ে কিংবা নাচুনি ছন্দে বললে মন ও প্রাণ সহজেই আকর্ষণ করে। কিন্তু সেটাই কি কবিতার আদর্শ হবে? জীবনানন্দ, অজিত দত্ত আসলে যথেষ্ট অন্তর্মুখী। এরও যে বিপদ নেই একথা বলব না। তবে, চেঁচাননি বলেই কি এদের কবিতাকে কবিতা বলতে বাধে?

কবিতার বিষয়বস্তু যা, তার কোনো স্বকীয় মূল্য মানতে আমি ইচ্ছুক নই। তবে কোনো মূল্যই নেই এমন নয়। সাহিত্য ও শিল্পের মূল কাজ আমাদের আনন্দ দেওয়া, তারই আর-এক নাম চিত্তশুদ্ধি। খুব ভালো ছন্দে লিখলেও ঘুঁষি পাকানো কবিতা কবিতা হয় না। তাতে কবিতার কাছে আমাদের আশা বা দাবী কোনোটাই মেটে না। ফরাসী জাতীয় সংগীত কি কবিতা?

কবিতার প্রাসাদে অনেক মহল আছে। তাকে অচলায়তনে পরিণত করবার চেষ্টা হল সংস্কৃতির বিরুদ্ধাচরণ। কবিতার সমালোচক বা পাঠকের পক্ষে রসবোধের উদারতা একটি পরম সম্পদ। বিভিন্ন রচনাকে তার নিজের আদর্শে বিচার করে যথাযোগ্য মূল্য দিতে হয়! রবীন্দ্রনাথের লেখা পলায়নী বৃত্তিতে ভরা, এই ধরনের একটা মত সাজিয়ে গুছিয়ে খাড়া করা শক্ত নয়। কিন্তু এ মত মানব না, শুধু আমরা ওঁর ভক্ত, কিম্বা তাঁর কাছে ঋণী বলে নয়, ওকথা বললে সাহিত্যের ভিত্তিকেই

নষ্ট করে দেওয়া হয় ব'লে। একটা একগুঁয়ে দৃষ্টিভঙ্গী নিলে সাহিত্যের রসবোধ পদে পদে ক্ষুণ্ণ হবে, নতুন নতুন লেখকেরা আদর্শচ্যুত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে আপন বিধিদত্ত শক্তিকে অবহেলা করবেন।

গত ক'বছরে নতুনেরা ভালো লেখা লিখেছেন। এঁদের ছন্দ ও বক্তব্যের আপাত সারল্যের পিছনে দুর্দান্ত আবেগও রয়েছে (পুরোনোদের ভিতর যেমন নজরুলের ছিল, সুইনবার্নেরও ছিল)। কিন্তু দুঃখের বিষয় এঁদের রচনা অতিকথনদুষ্ট এবং তার প্রায় সবটাই চীৎকারে ভরা। বলাটা যদি গলার জোরের উপর নির্ভর করে, তাহলে সে কবিতা বুদ্‌বুদের মতো মিলিয়ে যায়। জোড়াসাঁকোর এক সভায় রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন 'চেঁচালে কখনো দুঃখের কথা বলা যায় না।' ফুল্লরার সেই আমানি খাবার শোকক্রন্দন নানাভাবে আজকাল নানান লেখায় দেখা দিচ্ছে।

আমার মনে হয় এই সব কবিরাই আরো ভালো লিখবেন যদি তাঁরা আদর্শ বিষয়ে ভালো করে অবহিত হয়ে ওঠেন, ফরমায়েসী লেখা না লিখে যদি তাঁরা অন্তরের প্রেরণায় লেখেন, লেখবার বিষয় বাইরে থেকে কুড়িয়ে না নিয়ে যদি মনের ভিতর থেকেই সংগ্রহ করেন।

পুনশ্চ—

মুখে বলা কথার এই অসংলগ্ন এবং অসংবদ্ধ প্রতিলিপিকে কেউ যেন আমার বিরুদ্ধে সাক্ষীরূপে উপস্থিত না করেন, এই অনুরোধ জানাই। সাহিত্যের ক্রিয়াকর্ম বিষয়ে অনেক লিখেছি, আশা করি আরো অনেক লিখবো, আর 'মত' জিনিসটাও পাথরের মতো চুপ ক'রে পড়ে থাকে না, স্রোতের মতো অবিরল ব'য়ে চলে। আমার সেই সব লিখিত রচনা পড়ার মতো ধৈর্য যদি কারো থাকে, তাহলে হয়তো তিনি জানতে পারবেন সাহিত্য বিষয়ে আমি কী ভাবি, কী অনুভব করি। এই 'বক্তৃতা' তার ক্ষীণ উপচ্ছায়া মাত্র। শিকাগো, বু. ব.।

সাম্প্রতিকের স্বপক্ষে

নরেশ গুহ

কবিতাপাঠের প্রতি কদাচ যাদের কিছুমাত্র আগ্রহ নেই, আধুনিক কবিতার নানাবিধ কল্পিত ত্রুটির প্রতি তাদেরই দেখা যায় ক্রোধ এবং করুণার মাত্রাটা বেশী। তীব্র, কটু, ঝাঁঝালো ভাষায় এঁরা সাম্প্রতিক কবিতার বিবিধ নিন্দাবাদ করে থাকেন। প্রধান অভিযোগগুলি হচ্ছে এই: আধুনিক কবির ভাষা এবং ব্যাকরণ জ্ঞানের শোচনীয় অভাব; এবং আধুনিক কবিতায় স্বেচ্ছাকৃত উদ্ভট দুরূহতা। প্রথম অভিযোগের জবাব দেবার দরকার করে না, কেননা উক্ত ত্রুটি সত্যি যাঁদের আছে তাঁদের পক্ষে কবিতা কেন, যা-কিছু রচনা করার চেষ্টাই পণ্ডশ্রম এবং তার হয়ে সাফাই গাওয়ার চেষ্টা সমপরিমাণে হাস্যকর। দ্বিতীয় অভিযোগটি বরং আলোচনার যোগ্য, যদিও গত পাঁচ বছরের মধ্যে কবিহিসেবে কিঞ্চিৎ যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন তাঁদের রচনায় এহেন দুরূহতা আবিষ্কার করা যথোচিত পরিশ্রমসাপেক্ষ।

এই পাঁচ বছরে যে পরিমাণ চতুর কবিতা লেখা হয়েছে তার তুলনায় আবেগপ্রধান কবিতার পরিমাণ বেশী এবং সার্থকতাও। এটাই তো মানসিক স্বাস্থ্যের একটা মস্তবড় লক্ষণ যে দেশকালের এই দারুণ দুর্গতির মধ্যেও আবেগ এবং ভালোবাসার শক্তিকে এঁরা জাগিয়ে রেখেছেন। কিন্তু সেই আবেগের প্রকাশ যদি জলবৎতরল হ'য়ে না-দেখা দেয় তার জন্যে দায়ী মানুষের জটিলতর জীবনযাত্রা। জটিলতা কোথায় নেই? এমন কি যে

খবরের কাগজখানা প্রভাতী চায়ের সঙ্গে ঘরে ঘরে আজকাল নিয়মিত সেবন করা হয়ে থাকে তার বিবিধ বিষয়বস্তু এবং ভাষা-জটিলতা একশো বছর পূর্বেকার সংবাদপ্রভাকর-পাঠকের কাছে কি কিছুমাত্র সুবোধ্য ঠেকবে? আধুনিক জটিল বিজ্ঞানের একবর্ণও কি বুঝতে পারবেন জ্ঞানসমুদ্রতীরে নুড়ি সন্ধানী সেকেলে নিউটন—ইতিহাসের পাতা থেকে যদি আজ ভদ্রলোক হঠাৎ জেগে ওঠেন?

কবিতার ভাষা এবং ভাববস্তু যদি জটিল হ'য়ে থাকে তো জীবনের স্বাভাবিক নিয়মেই হ'য়েছে। আক্ষেপ অকারণ যে প্রভাত পাখীর নির্মল কাকলী—সম্ভবতঃ চিরতরেই—জীবন থেকে, কাজেই কাব্য থেকেও, বিদায় নিয়েছে। দুশ্চিন্তায় পীড়িত (ব্যক্তিগত দুশ্চিন্তার কথা বলছি না), জিজ্ঞাসায় ক্ষত বিক্ষত এবং দ্বন্দ্বে দ্বন্দ্বে বিভ্রান্ত আধুনিক কবির আবেগসঞ্জাত কবিতাও কিঞ্চিৎ দুরূহ হবেই—মেনে নেওয়াই মঙ্গলের।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তী বাংলা কবিতায় এই যে নতুন রোমান্টিক সুর দেখা দিয়েছে তার স্বাদ আলাদা। রূপটি এখনো হয়তো স্পষ্ট হ'য়ে ওঠেনি। কিন্তু তিরিশের যুগেকার লেখার পাশাপাশি মিলিয়ে পড়লেই পরিবর্তনটা ধরা পড়বে। কবিরা উপলব্ধি ক'রেছেন যে নিছক বিষয়ের মধ্যে কবিতা নেই, কবির চেতনার রঙে সেই বস্তু যদি-না রঙিন হ'য়ে ওঠে। সুরে ছন্দে বক্তব্যকে রূপবান ক'রে তোলার দিকে সাম্প্রতিক কবির এই প্রয়াস সাহিত্য-সুহৃদের অভিনন্দনযোগ্য॥

ক্রান্তিকালের কবিতা

দিনেশ দাস

আজ আমরা একটা ক্রান্তিকালের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছি। চারদিকে অসুস্থ থমথমে আবহাওয়া। একটা কালোছায়া আমাদের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের উপর এসে পড়েছে। কড্‌ওয়েলের ভাষায় এই সংস্কৃতির নাভিশ্বাস দেখা দিয়েছে। তবু আমাদের স্থির পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হবে। তাই আজ খাদ্য আন্দোলনের মত সংস্কৃতি-আন্দোলনের প্রয়োজন কম নয়। হজরত মহম্মদ বলতেন, যদি এক পয়সা জোটে তবে রুটি কিনবে আর হু'পয়সা জুটলে এক পয়সায় রুটি আর অন্য পয়সাটিতে ফুল কিনবে। এই ফুলই মানুষের শাশ্বত ক্ষুধার ইঙ্গিত বহন করছে। বাইবেলেও Man does not live by bread alone—কথাটির মধ্যেও মানুষের অনন্ত পিপাসার বাণী নিহিত রয়েছে। সাহিত্য মানুষের সেই অপ্রয়োজনীয় প্রয়োজনের দিকে দিকনির্দেশ করছে। বাস্তবিক মানুষের স্থূল প্রয়োজন না মিটিয়েও আদিম যুগ থেকে শিল্প বিশেষ করে কবিতা কেমন করে এখনো টিঁকে রইল তা ভাবতে অবাক লাগে। ইতিহাসের পাতা ওলটালে দেখা যাবে, মানুষের যা কিছু আজো পর্যন্ত টিঁকে আছে তার প্রায় প্রত্যেকের পিছনে আছে কোনও অর্থনৈতিক কারণ। নিছক প্রয়োজনের তাগিদ ছাড়া যদি কিছু বেঁচে থাকে তা হ'ল কবিতা। মানুষের বৈরাগ্যের প্রথম উন্মেষ হ'ল বোধ হয় তার কাব্যপ্রীতিতে। কারণ প্রয়োজনের দৃষ্টি দিয়ে

কাব্য হয় না, কাব্য হয় অপ্রয়োজনের দৃষ্টি বা শিল্পীর দৃষ্টিভঙ্গিমায়। এ ছাড়া এতে কবির হাতও নেই। কারণ কবিতা লেখা হয়, কবি লেখে না। কোন দিকের হাওয়ায় কবির মনের আগুন হঠাৎ জ্ব'লে উঠবে, সে-কথা কবি নিজেও জানে না। এইজন্যে শেলী কবির মনকে ছাইচাপা উনুনের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কোন দিকের ঝড়ে হঠাৎ দপ ক'রে জ্ব'লে উঠল কবির মন তার খবর কি কবি রাখে? না। তার হাতের সোনার কাঠির ছাঁয়ায় কেমন করে ঘুমন্ত রাজকন্যার ঘুম ভাঙে সে খবর তার অজানা। আদিম যুগে যাদুকর অতিপ্রাকৃতকে আনত প্রকৃতিরাজ্যে। এযুগে শিল্পী বা কবিও সেই অতিপ্রাকৃতকে হাজির করছে প্রকৃতির সীমায়। প্রাচীন যুগের তন্ত্রধারদের ছিল মন্ত্রের বা শব্দের যাদু, এযুগে কবিদেরও সেই একই শব্দের বা মন্ত্রের যাদু। আধুনিক কবিরাই হয়তো বাংলাদেশের শেষ তন্ত্রধার যারা অজানাকে জানার সীমায়, অসীমকে পৃথিবীর সীমানায় নিয়ে আসছে। কবিরাই হয়তো পৃথিবীর শেষ যাদুকর।

আজ চারদিকে অন্ধকার। কিছুই দেখা যায় না, চেনা যায় না। এখানে যে একদা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তা একথা ভাবা যায় না। তবু যদি আমরা আজ শান্ত হ'তে পারি, সাধক হ'তে পারি তা হ'লে হয়তো পথের সন্ধান পাওয়া কঠিন হবে না।

নাটক ও মঞ্চের পাঁচ বছর

তুলসী লাহিড়ী

নাটক অভিনয় ও নাট্য সাহিত্য দুটোই অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। অভিনয়ের জন্যই নাটক লেখা হয়। অভিনয় না হলে নাটকের সার্থকতা পুরোপুরি বোঝা যায় না। তাই মঞ্চাভিনয়ের হিসাব নিকাশ করলেই নাট্য-সাহিত্যের হিসাব নিকাশও সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে। এদেশে রঙ্গমঞ্চ ইংরেজের অনুকরণ করেই আমদানি হয়েছিল বটে কিন্তু কি আঙ্গিক, কি বিষয়বস্তুতে, এদেশের নাটক সম্পূর্ণ ইংরেজি ঢংয়ে হয় নি। দর্শকের রসানুভূতির খাতিরে অধিকাংশ নাটকই ছিল পৌরাণিক। কিছু সামাজিক সমস্যা নিয়েও লেখা হয়েছিল এবং কিছু ঐতিহাসিক নাটকও হয়েছিল। সৃষ্টির যুগে অনেক শক্তিশালী ব্যক্তি এক সঙ্গে কাজ করে বাংলাদেশে নাটক অভিনয় করার একটা আগ্রহ সৃষ্টি করেছিলেন। তারই ফলে কলিকাতায় কখনও চার কখনও পাঁচটি রঙ্গমঞ্চ গড়ে উঠেছিল এবং বাংলা ভাষায় নাট্য-সাহিত্য বিভাগেও কিছু ভালো নাটকের আবির্ভাব হয়েছিল। বাংলা ভাষায় অন্যান্য বিভাগের মতো, এ সাহিত্য সুপরিপুষ্ট হয়ে বিশ্বের দরবারে স্থান পাবার উপযোগী বেশি কিছু দেয় নি সত্য, তা হ'লেও এর অগ্রগতির ইতিহাস খুব নগণ্য নয়। সৃষ্টির যুগে নাটকের রচনায় ও অভিনয়ে যে প্রাণশক্তি ছিল কিছুকাল পরে নানা কারণে সে শক্তির অভাব ঘটেছিল। সে কারণগুলির প্রধান দুটি আজও তেমনি বাধা সৃষ্টি করছে। একটি

অর্থনৈতিক ; আর-একটি নাটকে দর্শকবৃন্দের রুচি-বিকার। তা সত্ত্বেও অল্পদিনের মধ্যেই, নূতন নাটক, নূতন নটনটী ও নূতন প্রয়োগ-কৌশলের সাহায্যে রঙ্গমঞ্চ আবার জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। নাট্য সাহিত্যের খুব উন্নতি না হলেও অভিনয়ের ধারা বদলে যে নূতনত্ব এসেছিল তাতে আশা করা গিয়েছিল বাংলা নাটকও বিশ্বের দরবারে স্থান পাবে।

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা। রঙ্গমঞ্চ ও নাট্য সাহিত্যের অগ্রগতির পথেও আমরা তাই দেখতে পাই। কখনও দেখি, শক্তিমান নাট্যকার অভিনেতাদের দুর্বলতা সত্ত্বেও সুলিখিত নাটকের সাহায্যে দর্শকবৃন্দের অবসাদ দূর ক'রে নাট্যশালার বিপদ কাটিয়ে দিচ্ছেন ; আবার কখনও দেখি শক্তিমান নটনটী দুর্বল নাটকও নিজেদের ক্ষমতায়, একমাত্র সুঅভিনয়ের বলেই, জনপ্রিয় ক'রে তুলে নাট্যশালার অর্থনৈতিক দুর্দশা ঘুচিয়ে এগিয়ে চলেছেন। নাটক অভিনীত না হলে তার প্রকৃত শক্তির পরীক্ষা হয় না। রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নাট্য সাহিত্যের সম্পর্ক তাই এত নিবিড়। দর্শকের রসপিপাসা থেকে রঙ্গমঞ্চে নাটকের চাহিদা হয় এবং সেই চাহিদার তাগিদেই নাটক রচিত হয়। অবশ্য কখনও কখনও এ নিয়মের নানা ব্যতিক্রম নানা দেশে হয়েছে। তা সত্ত্বেও একথা বলা চলে যে অভিনয়-দর্শকের চাহিদা ও রুচি নাটকের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের উন্নতি ও অবনতির কারণ। আবার সেই সঙ্গে একথাও বলতে হয় যে দর্শকের সেই রুচি ও চাহিদা সম্বন্ধে রঙ্গালয়ের কর্তৃপক্ষের ভ্রান্ত বা বিকৃত ধারণাও অনেক সময় উন্নতির পরিপন্থী। তাঁদের লক্ষ্য থাকে শুধু লাভ করার দিকে। সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অনেক ত্রুটি এসে উপস্থিত হয় এবং ক্রমে লাভের লোভই লোকসানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

গত পাঁচ বৎসরের হিসাব-নিকাশ করলে আমরা সেই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হব। গণমনের পরিবর্তন সম্বন্ধে অবহিত না হয়ে মঞ্চ-মালিকেরা চর্বিত-চর্বণ করে চললেন। ফলে গণমনের সঙ্গে সংযোগের অভাবে এবং যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফীতির দরুন ব্যয়বাহুল্যে, তাঁরা অর্থসংকটে প'ড়ে

ক্রমশ ডুবতে লাগলেন। অথচ এই পাঠকের মন্দার বাজারেও বর্তমান জীবন-সমস্যা নিয়ে, কয়েকটি অবৈতনিক নাট্য সম্প্রদায় কয়েকটি সুলিখিত না হলেও সুঅভিনীত নাটক পরিবেশন ক'রে জনগণের কাছে প্রশংসা ও অর্থ দুইই পেয়েছেন। প্যাঁচসর্বস্ব একদা-জনপ্রিয় অভিনেতাদের দ্বিধা ও সংকোচের জন্য সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষ বর্তমান জীবন-সমস্যা এড়িয়ে শরৎচন্দ্র ও অন্যান্য সাহিত্যিকের রসঘন গল্পগুলিকে নাট্যরূপ দিয়ে পরিবেশন ক'রে সংকট এড়াবার চেষ্টা করলেন এবং কতকটা সফলকামও হলেন। এই ভাবে রঙ্গালয়গুলি কায়ক্লেশে ঠাট বজায় রেখে চ'লছে বটে কিন্তু নূতন নাটক সৃষ্টি প্রায় বন্ধ বললেই হয়। নাটকের সংগঠনকারীদের সঙ্গে যে সংযোগ, যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা নাট্যকারের প্রস্তুতির জন্য একান্ত প্রয়োজন, তার একান্ত অভাব হয়েছে। তাই নাট্যকারের অভাব আর সঙ্গে সঙ্গে নূতন শক্তিমান নটনটীরও অভাব হয়েছে। এদেশে অভিনয়-শিক্ষার কোনও সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা নেই। সে কাজ রঙ্গালয়গুলিতেই হত। কিন্তু আজ সেখানে সব রকম ব্যবস্থা অত্যন্ত এলোমেলো হওয়ায় নবাগতরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে না। কয়েকটি লব্ধপ্রতিষ্ঠ নট বা নটী যাঁরা নাটকের প্রধান আকর্ষণ বলে কর্তৃপক্ষের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাঁদের বেতন যোগাতেই প্রায় সমস্ত আয় নিঃশেষিত হয়। নবাগতেরা কিছুদিন ধৈর্য নিয়ে অপেক্ষা করে না পায় শিক্ষা না পায় অর্থ। অবশেষে তারা সরে পড়ে। এছাড়া, ছায়াচিত্রের বাজারে বিশেষ কিছু প্রস্তুতি না থাকলেও, রূপ ও যৌবন সম্বল করে যশ ও অর্থ সহজলভ্য হয় বলে, নবীন দল সেই দিকেই আকৃষ্ট হয়েছেন। ঠিক এই একই কারণে যারা অনুশীলন করলে নাট্যকার হতে পারতেন তাঁরাও নাটক না লিখে, চিত্রনাট্যের আঙ্গিকে একটা কিছু লিখে দালাল মারফতে ছবির বাজারে ঘুরছেন।

এই এলোমেলো অবস্থা সাহিত্য সৃষ্টির পক্ষে উপযোগী মোটেই নয়। বিস্তারিত করে না বললেও এই থেকেই, নিজ নিজ অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে,

ব্যাপারটা অনেকেই অনুধাবন করতে পারবেন। এর পরই বর্তমান দুর্দশার কারণ এবং এই সংকট এড়াবার উপায় সম্বন্ধে কিছু বলা উচিত। কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে হলে অনেক তিক্ত কথা বলতে হবে বলে সংক্ষেপে কিছু বলব। অবশ্য এটা আমার ব্যক্তিগত মতামত। গ্রহণযোগ্য মনে হলেও আপনারা বিশেষ বিবেচনা ক'রে তবে যেন তা করেন। বর্তমান সভ্যতার মূল ব্যাধি লোভ। এই অতিরিক্ত লোভ এবং ধনবণ্টনের অসমতা এই ব্যবসায়কেও ক্ষয় করেছে। এটা মনের খোরাকের ব্যবসায়। ভেজাল চালিয়ে ভুলিয়ে বিষ পরিবেশনের ফলে এ ব্যবসায় প্রাপ্য সম্মান বা অর্থ দুইই পায়নি। সভ্য সমাজের বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠে যে ব্যবসা মানসিক উন্নতির সহায়ক হতে পারত, শুধু বিকট লাভের লোভেই তা ছেলেভুলানো ও সমাজের অনিষ্টকর ভেজাল বিষের ব্যবসায় দাঁড়িয়েছে। সিনেমার দেখাদেখি, অতীতের ঐতিহ্য ভুলে, শালীনতা আবরণে প্রচ্ছন্নভাবে যৌন আবেদন যোগান দেওয়ার উৎসাহ, ফাঁকি দিয়ে ভুলিয়ে লাভ করার প্রবৃত্তি থেকেই এসেছে। বিশ্বব্যাপী এই ভাঙ্গনের যুগে অবসন্ন মানুষকে মনুষ্যত্বে প্রবুদ্ধ করার কোনো চিন্তা নেই, বিপদ সম্বন্ধে সচেতন করার কোনো প্রয়াস নেই, আছে শুধু কতগুলি ফাঁকা বুলি ও নকল ভাবাবেগসম্বল মেকী চাকচিক্য দিয়ে ভোলাবার আয়োজন। তাই রসিকজন আজ বিমুখ। রসের বাজারে তাদের মতামত যে কত মূল্যবান, একথা মালিকরা ভুলেছেন। রসিক বাদ দিয়ে রসের আসর যে জমে না এই সত্য সম্বন্ধে তারা একান্ত উদাসীন। নাটক রসোত্তীর্ণ হয়েই দীর্ঘদিন চলে। এটা বহুবার দেখেও তাঁরা কিছু শেখেননি। সমগ্রভাবে নাটক সার্থক হতে হলে প্রতিটি কর্মীর ঐকান্তিক সংযোগ চাই। কিন্তু কর্তৃপক্ষের ভ্রান্ত নীতির ফলে আজ সে সংযোগ রঙ্গমঞ্চে নেই। অবসন্ন অভুক্ত কর্মীর দল সেখানে দিনগত পাপক্ষয় করছে। নিরানন্দ পুরীতে তাই দর্শক আনন্দের আশায় গিয়ে দিনের পর দিন নিরাশ হচ্ছে।

এ সব ত্রুটি কাটিয়ে উঠতে হলে অনেক কিছু পরিবর্তন দরকার। সবার চেয়ে বেশী দরকার নূতন প্রাণশক্তি। নূতন নাট্যকার নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নূতন আঙ্গিকে রস পরিবেশন করবেন। নূতন প্রতিভা তাকে রূপ দিয়ে সার্থক করবে। দর্শক পরিতৃপ্ত হয়ে জয়গান করবে। নাট্যশালা সুরুচি সুশিক্ষা আনন্দের কেন্দ্র হবে এই লক্ষ্য থাকা উচিত।

পেশাদার রঙ্গমঞ্চ যখনই অবসন্ন হয়েছে তখনই দেখা গেছে যে অপেশাদার শৌখীন সম্প্রদায় থেকে নূতন অভিনেতা অভিনেত্রী, নূতন নাট্যকার এসে আবার সেখানে প্রাণশক্তি ফিরিয়ে এনেছে। আজ দেখা যাচ্ছে সেই শৌখীন সম্প্রদায়গুলিও স্তিমিত দীপের মতো অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। সাজার আনন্দ পাবার ইচ্ছা থেকে সাজতে গিয়ে, ক্রমে চরিত্র, বাচন, অভিব্যক্তি প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে, সেই সব শৌখীনদের কেউ কেউ এই রসে মজে গিয়ে এর অনুশীলনে মেতে উঠতেন। বার বার চেষ্টা করে নিজেদের জড়িমা কাটিয়ে উঠে তাঁরা ক্রমশঃ সতেজ ও সবল হতেন। এই প্রকারেই ভাল অভিনেতা সৃষ্টি হত। পরে তাঁদের কেউ সাধারণ রঙ্গালয়ে এসে তাকে নূতনত্বের প্রভায় উজ্জ্বল করত। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে এগুলির আরও উন্নতি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু নানা কারণে সেখানেও প্রাণশক্তির অভাব। অত্যন্ত ব্যয় এর একটি প্রধান কারণ। সাধারণ রঙ্গালয় ভাড়া দিয়ে ক্ষতি পোষাতে গিয়ে এদের উপর অত্যাচার করে। তার উপর প্রমোদ কর। সবার উপর পুলিশী সেন্সর ব্যবস্থা নূতন নাটক সৃষ্টির একটি অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংরেজ আমলের কর্মচারীরা রাষ্ট্রের হিত বলতে—কর্তৃত্ব-অধিকারী দলের হিত বোঝেন। তা ছাড়া জনকল্যাণে তাঁদেরই একচেটিয়া অধিকার এবং অপর সবাই জনগণের অনিষ্টের চেষ্টায় আছে, এই রকম একটা মনোবৃত্তি অনেক সময় তাঁদের দেখা যায়। ফলে এই সব বাধা অতিক্রম করতেই শৌখীন সম্প্রদায়গুলির শক্তি একবার অভিনয় করতেই ফুরিয়ে যায়। প্রথম রজনীর অভিনয়ের দোষত্রুটি অসম্পূর্ণতা

সংশোধন করে আর একবার পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ তারা প্রায়ই পায় না।

তবুও এই শৌখীন সম্প্রদায়গুলির ভিতর থেকে দু-চারখানি ভালো নাটক—দুচারজন শক্তিমান নটনটীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে, এই এক আশার কথা। পুরাতনের অবসানে নূতনের অভ্যুদয়ের এ এক ইঙ্গিত। নয়ন মন বিমোহনকারী হংসবলাকা দিকচক্রবালে মিলিয়ে যাবার মতো হয়েছে দেখে যেমন অনেকে হতাশ হচ্ছেন, তেমনি কেউ কেউ মাটির নীচে অন্ধকারে 'তৃণদল ঝাপটিছে ডানা' তার সাড়াও ঐ শৌখীন অভিনয়গুলির মধ্যেই শুনতে পেয়েছেন। নাট্য সাহিত্যের ও নাটক অভিনয়ের অনেক দুর্গতি দেখা যাচ্ছে বটে তবুও এর গতি রুদ্ধ হয় নি। এই গতিপথ ধরে আবার নূতন করে সার্থকতা আসবে এই আশা আমি করি॥

বাংলা নাটক

শচীন সেনগুপ্ত

আলোচনার বিষয় হচ্ছে পাঁচ-বছরের বাংলা নাটক। অর্থাৎ, স্বাধীনতার পর বাংলা নাটক কী রূপ পেয়েছে, তাই দেখাতে হবে। একটা নতুন রূপ নিশ্চিতই পেয়েছে। কিন্তু বক্তৃতা করে সে রূপ ফুটিয়ে তোলা যায় না, প্রবন্ধ লিখেও নয়। নাটকের স্বরূপ কিন্তু নাটক পড়েও বোঝা যায় না। তা বুঝতে হলে অভিনয় দেখতে হয়। নাটক অনেকটা গানের স্বরলিপির মতো। শুধু কথা যেমন গান হয় না, শুধু স্বরলিপিও যেমন গান হয় না, তেমন শুধু সংলাপ আর ঘটনা-বিন্যাসও নাটক হয় না। যা গাওয়া যায় তাই গান; যা অভিনয় করা যায়, তাই নাটক। শুধু সংগীতের অভিনয়ও নাটক হয়, শুধু নৃত্যের অভিনয়ও নাটক হয়, আবার সংগীত নৃত্য ও মৌখিক ও আঙ্গিক অভিনয়ের সমন্বয়েও নাটক হয়। আমাদের নিকট অতীতের নাটক ওই তিন শ্রেণীতেই বিভক্ত ছিল। দূর-অতীতে নৃত্য ছিল নাট্য। সংগীতকে নাট্যের বাহন করা হয়েছে তখন, যখন নাটকের ভাষা কেবলমাত্র বিদগ্ধদেরই ভাষা হয়ে জনগণের দুর্বোধ্য হয়ে পড়ল।

২

ঊনবিংশ শতকের সপ্তম দশকে আমরা যখন নতুন করে নাট্যশালা পত্তন করলাম, তখন আমরা কিন্তু আমাদের অতীতের নাট্যাদর্শ নিয়ে কাজ শুরু

করলাম না—আমরা নিলাম বিদেশী নাট্যাদর্শ। সে আদর্শ এলিজাবেথীয় ইংলণ্ডের নাট্যাদর্শ নয়, বহু পরবর্তীকালের ভিক্টোরীয়-যুগের আদর্শ। মাইকেল দীনবন্ধু সেকস্‌পীয়ার অনুসরণ করেন নি। ওঁদের দুজনার কেউ নাট্যশালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না—নাট্যশালার অস্তিত্বই ছিল না তখন। ওঁরা নাটক লিখেছিলেন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য। ওঁদের নাটক অভিনীত হত ধনিকদের বাড়িতে বা বাগান-বাড়িতে। সাহেব-মেমরা, ধনিক ও বিদগ্ধরা ওঁদের নাটকের বা প্রহসনের অভিনয় দেখতেন। কিন্তু তবুও মাইকেল দীনবন্ধু তাঁদের নাটকে প্রহসনে জাতির শিক্ষিতদের এবং অশিক্ষিতদের, শহরের ও পল্লীর মানুষের, জীবন প্রতিফলিত করেছেন। চালু সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিবাদের স্বর ওঁদের সৃষ্টিতে ধ্বনিত হয়েছে, কোথাও প্রচ্ছন্ন ভাবে, কোথাও তীব্র শ্লেষের ভিতর দিয়ে। মাইকেলকে তাঁর সহায়করা (রাজারা) সইতে পারেন নি। দীনবন্ধুকে সইতে পারেন নি তখনকার সরকার যেমন, তেমন তখনকার সমাজপতিরাও। দীনবন্ধুর নীলদর্পণই শুধু যে নিষিদ্ধ হয়েছিল তা নয়, সধবার একাদশীও অশ্লীলতার অজুহাতে দীর্ঘকাল নিষিদ্ধ রাখা হয়েছিল। কিন্তু বিষয়বস্তুতে, ভাষার সুষ্ঠু প্রয়োগে, চরিত্র-সৃষ্টিতে, সমসাময়িক সমাজ-প্রতিফলনে, মাইকেল দীনবন্ধুর রচনা ভিক্টোরিয়ান নাট্যকারদের রচনার চেয়ে নিরেস ছিল, এমন কথা মেনে নেবার কোনো কারণ নেই।

৩

সাধারণ নাট্যশালার জনক গিরিশচন্দ্র ওঁদের নাটক নিয়ে, শৌখীন দলভুক্ত থেকে, অভিনয় যদিও শুরু করেছিলেন, নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত করে নিজ-রচনায় সেক্‌স্‌পীয়ারের রীতিই অবলম্বন করলেন ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করে। অপর দিকে মাইকেল যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ সৃষ্টি করেছিলেন তাই পরিবর্তিত করে তিনি ছন্দে নাটক রচনা করলেন। গিরিশ তাঁর নাটককে রূপ দেবার জন্য যে ছন্দ ব্যবহার

করেছিলেন তা তাঁর পরবর্তীরা ব্যবহার করেননি। কিন্তু এ-কথা বলা যেতে পারে যে, মাইকেলের যে ছন্দ সেদিন জনপ্রিয় হয়নি, গিরিশ সেই ছন্দকে নিজের প্রয়োজন মতো পরিবর্তিত করে অন্তত নাটকের মাধ্যম হিসেবে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। গিরিশ বিদ্রোহী ছিলেন; বঙ্কিমের মতো বিদ্রোহী। বিদ্রোহ করে তিনি ঐতিহ্যকে, পরম্পরাগত সংস্কৃতিকে অগ্রাহ্য করেননি। কিন্তু বিধবার জীবনের ব্যর্থতা যে সমাজ-জীবনে গভীরতম বেদনা সঞ্চারের কারণ হয়ে রয়েছে ট্রাজেডি রচনা করে তার দিকে সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সমাজের অর্থনীতিক ব্যবস্থায় কোথায় একটা বড় গলদ রয়েছে, একথা গিরিশ অনুভব করেছিলেন। গলদটা আসলে কী এবং তার গুরুত্ব কত, তা তিনি কতটা উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর রচনার ভিতর দিয়ে তা ঠিক বোঝা না গেলেও 'উকিল কি চিজরে বাবা', 'কাজ গুছিয়ে নিয়েছ' প্রভৃতি উক্তি থেকে বোঝা যায় গলদটা এমন ভাবেই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে তিনি নিশ্চিত করে ধরে নিয়েছিলেন বাঙালীর সাজানো বাগান শুকিয়ে যাবেই গোড়ার ওই গলদের জন্য। ব্যাঙ্ক ফেলকে গিরীশ জীবনের সব চেয়ে দুর্ঘটনা মনে করতেন না। ব্যক্তিগত ভাবে সকল ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের উর্ধ্বে তিনি যে ছিলেন, তা তাঁর প্রতি পরমহংসদেবের করুণার কথা থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু বাংলায় তখনকার দিনের নতুন-সভ্যতা যে যোগেশদের প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিল, তারা ব্যাঙ্ক ফেল পড়াকে দুঃসহ বলে মনে করত এই কারণে যে, তারা তখন আলোক-লতার মতোই পুঁজির-স্তূপের ওপর শোভা পাচ্ছিল, মাটির সংযোগ হারিয়ে ফেলেছিল। যে বাস্তু তাদেরকে মাটির সঙ্গে সংযুক্ত রাখত, অসৎ উকিলের ওকালতির কুটিল কসরৎ সেই বাস্তু থেকে তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করে পথে দাঁড় করাতে পারে, তাদের পানোন্মত্ততার সুযোগ ও সুবিধে না নিয়েও, এমন কথা সেদিন বোধগম্য হবার মতো সমাজ-চেতনার অভাব ছিল। গিরিশ বুঝেছিলেন একটা অনাচার কোথাও রয়েছে। কিন্তু সে অনাচারকে তিনি

পুরোভাগে না এনে যোগেশের পানোন্মত্ততাকে বড় করে ধরেছেন। পানোন্মত্ত না হলেই কি যোগেশ তার সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়া বন্ধ করতে পারত? পারত না যে, তা তার জীবনের আদর্শ থেকেই বোঝা যায়। ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় সেই আদর্শ ভেঙে যায়। আর কোনো আদর্শকে জীবনের সামনে রেখে তার মতো লোকের নতুন করে জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার কোনো প্রয়াস সম্ভব ছিল না। আজকার ছিন্ন-মূলরাও, মাতাল না হয়েও, পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সকলেই প্রতিষ্ঠা করে নিতে পারছে না। পারবার কথাও নয়। যে অবাস্তব প্রতিষ্ঠাকে তারা প্রতিষ্ঠা বলে জেনেছিল, তা যে অবাস্তব, সেই জ্ঞান তাদের অনেককে একেবারে দিশাহারা করে দিয়েছে। তারাও তাদের সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়া রোধ করতে পারছে না; মাতাল না হয়েও। মাতাল যদি কেউ হয়, তাতেও বিস্মিত হবার কিছুই নেই। সকলেই মাতাল কেন হয়নি, সেইটাই বিস্ময়। সেদিনকার যোগেশদের দেখে যে বিষয় পুরোপুরি বোঝা যায়নি, আজকার যোগেশদের দেখে সমাজ গঠনের সেই গলদ পুরোপুরি বোঝা যাচ্ছে। গিরিশ সমাজের অর্থনীতিক-গঠন নানা ভাবে প্রতিফলন করেছিলেন সেইটেই বড় কথা। বঙ্কিমের মতো গিরিশও মানুষের রূপান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন এবং বঙ্কিমেরই মতো তিনি বিশ্বাস করতেন অতীন্দ্রিয় চেতনা সেই রূপান্তর ঘটাতে পারে। এই রূপান্তর তিনি দেখিয়েছেন বিল্বমঙ্গলে, যার জন্য স্বামিজী বলেছিলেন, গিরিশ সেকসপীয়ারকেও ছাপিয়ে গেছে। বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসে এই রূপান্তর ঘটাবার জন্য সন্ন্যাসী এনেছেন প্রচুর; গিরিশ তাঁর সামাজিক নাটকে এনেছেন অবধূত এবং সংসারে অনাসক্ত অথচ আপাতদৃষ্টিতে পাগল বলে মনে হয়, এমন কিছু লোক। তারা সান্ত্বনা দেয়, তারা বোঝাতে চায় সুখ আর দুঃখ জীবনে অপরিহার্য হয়েই আসে। একটা চাইলে আর একটাও নিতে হবে, এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। গিরিশের সামাজিক নাটকগুলি বাস্তবতার ভিত্তিতে রচিত। কেবল

উল্লিখিত ওই চরিত্রগুলিকে অবাস্তব বলা হয়। আসলে কিন্তু ও-চরিত্রগুলি আমাদের আশে-পাশে হামেশাই আমরা দেখতে পাই, সকলে গ্রাহ্য করি না। কিন্তু আজও অনেক পরিবারকে কেন্দ্র করে অমন অনেক চরিত্র অনেকটা নির্লিপ্ত ভাবেই ঘোরা-ফেরা করে। গিরিশের জীবনের শেষের দিকে দেশে স্বদেশী আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। তার আগে বাংলা দেশে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব-প্রবাহ প্রবল ছিল। স্বদেশী আন্দোলনও শেষে ভাব-প্রবাহ নিয়ে প্রবলতর হয়ে ওঠে। গিরিশ এবং তাঁর সমসাময়িক নাট্যকাররা ধর্মান্দোলন ও স্বদেশী আন্দোলনকে প্রতিফলিত করে চলেন নাটকে। অমৃতলাল সমাজ নিয়ে কিছু ব্যঙ্গে প্রবৃত্ত হন। দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষীরোদপ্রসাদ দেশপ্রীতির আর মানবতার বাণী নাটকের মারফত প্রচার করতে থাকেন। দ্বিজেন্দ্রলাল নাটক লেখেন গদ্যে, ক্ষীরোদপ্রসাদ গিরিশ অমৃতলালের মতো গদ্যে ও পদ্যে মিলিয়ে, আবার কখনো বা কেবলই পদ্যে। দ্বিজেন্দ্রলালের গদ্য ছন্দে গঠিত; গিরিশ অমৃতলাল কি দীনবন্ধু মাইকেলের গদ্যের মতো বাঙালীর ঘরে-ঘরে বলা ভাষা নয় সে গদ্য। ক্ষীরোদপ্রসাদের গদ্যও কাব্যময়। পদ্যে গিরিশের বিশেষ ছন্দ নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ততদিনে সাবলীল হয়ে উঠেছে। ক্ষীরোদপ্রসাদ তারই প্রভাবে প্রভাবান্বিত। দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষীরোদপ্রসাদ মাইকেল-দীনবন্ধুর চেয়ে তো বটেই, গিরিশচন্দ্রের চেয়েও জনচিত্ত জয়ে অধিকতর সমর্থ হলেন এই কারণে যে, জন-চিত্ত তখন দেশ-প্রেমে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। বঙ্কিম ততদিনে দেশের মানুষের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। বঙ্কিম-উপন্যাসের নাট্যরূপ নাট্যশালার পরম সম্পদ হয়ে উঠল। নাটকে রোমান্স বড় হয়ে উঠতে লাগল। সে রোমান্স মাইকেল-দীনবন্ধু-গিরিশ-অমৃতলালে ছিল না। দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষীরোদপ্রসাদ তার সদ্ব্যবহার করেছিলেন, অথবা অসদ্ব্যবহার। বঙ্কিমের রোমান্টিক ভাষা (যেমন গোবিন্দলাল-রোহিণীর সংলাপে, প্রতাপ-শৈবলিনীর সংলাপে, লবঙ্গলতা-অমরনাথের সংলাপে) নাটকের রোমান্স সংক্রমণের মাধ্যম

হয়ে উঠল। মাত্র চল্লিশটি বছরে বাংলা নাটককে মাইকেল দীনবন্ধু গিরিশ অমৃতলাল দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষীরোদপ্রসাদ নানা রূপ দান করলেন, নাটকের ভাষাকে নানা সম্পদে ভূষিত করলেন, সমাজের নানা চরিত্রকে, জাতির সমসাময়িক নানা সংঘাতকে নানা আদর্শকে নাটকে স্থান দিলেন। মাত্র চল্লিশ বছরে বাংলা নাটক জন-সংযোগের সব চেয়ে ব্যাপক মাধ্যম হয়ে উঠল নাট্যশালাকে অবলম্বন করে। মনে রাখা আবশ্যক নাটকের ও নাট্যশালার এই প্রয়াস ও প্রতিষ্ঠা দর্শক ছাড়া আর কারো সহায়তা দ্বারা সফল হয়নি। তখনকার বিলেতী নাট্যশালায় যেসব মৌলিক নাটক অভিনীত হয়েছে, তা যে আমাদের ওই সময়কার নাটকের চেয়ে সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ এ-কথা বলবার কারণ নেই। বিলেতের নাট্যশালার বয়েস তখন তিনশো বছর অতিক্রম করে গেছে, আমাদের নাট্যশালা যখন সবে পঞ্চাশে পা দিয়েছে।

৪

জোড়াসাঁকোর শিল্পানুরাগী ঠাকুর পরিবার নাট্যানুরাগের নানা পরিচয় জাতির নাট্যান্দোলনের শুরু থেকেই দিয়ে এসেছেন। নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা তাঁরা দূর থেকে লক্ষ্য করলেন, স্বীকার করে নিলেন তার প্রয়াসকে, কিন্তু শঙ্কিত হলেন ভারত-নাট্যের প্রতি তার অনুরাগের অভাব দেখে, বিদেশের অনুকরণের আগ্রহ দেখে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সংস্কৃত নাটকের দিকে নাট্যশালার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলেন। কিন্তু পারলেন না। দোষ নাট্যশালার নয়, দোষ জাতির, দোষ জাতির শিক্ষার। সংস্কৃতকে সে মর্যাদা দিতে রাজী নয় তখন। ইংরেজি ছাড়া কোনো ভাষাকেই মর্যাদা দিতে সে রাজী নয়, ইংরেজ ছাড়া কোনো জাতিকেও না। ইংরেজি ভাষার মারফত যে নাটক আসবে না, সে নাটক অজানা বস্তু। কিন্তু ইংরেজিই বা জাতির কজনা জানে? ইংরেজি বই

কিনতেই বা পারে কজনা? মলেয়ার কিছু কিছু ইংরেজিতে এসেছিল, কিন্তু ব্রেসিল কর্নেলির নাম এ-দেশে তখনো পরিচিত হয় নি। ভলতেয়ার, হুগো, দোদে, জোলা, মোঁপাসাঁর দর্শন উপন্যাস গল্প এদেশে তখন এসেছে, কিন্তু তাঁদের নাটক এল কোথায়? ইবসেন কিছু-কিছু এল, চেকভ গোর্কিও এল। কিন্তু এলে হবে কি? সে সমাজচেতনা কোথায়? জাতির সমগ্র চৈতন্য তখন পরবশতা উচ্ছেদের জন্য উদ্বেল। দিকে দিকে সে এলোপাথাড়ি আঘাত হেনে চলেছে। তাকে র‍্যাশনালাইজ করবার চেষ্টা করলেন রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধ লিখে, উপন্যাস লিখে, নাটক লিখে। তাঁর প্রবন্ধ-উপন্যাস যাঁরা পড়তেন, মূল্য দিতে স্বীকৃত হতেন, তাঁর নাটক কিন্তু তাঁরা পড়তেন না, পড়লেও নাটকীয়তা স্বীকার করতেন না। এখনো করেন না, ফরমুলায় পড়ে না বলে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নাটককে সর্বতোভাবে স্বদেশী করতে চেয়েছিলেন। তিনি গানে নাটক লিখেছেন, নৃত্যে নাটক পরিবেশন করেছেন, ভাষা দিয়েও বহু নাটক গঠন করেছেন। কিন্তু তখনকার চালু নাটক থেকে তা এমনই স্বতন্ত্র যে, নাটক বলে তা স্বীকৃতিই পেল না। অবস্থা বুঝে তিনি নিজে দল গড়ে তাঁর নাটক অভিনয় করতে লাগলেন। সে অভিনয় বিদগ্ধদেরকে আনন্দ দিল, কিন্তু নাট্যজ্ঞান দিল না। বিলিতি ফরমুলায় ফেলে তার বিচার চলে না যে! যাঁরা বড় বেশি মনের প্রসারতার গরব করেন, তাঁরা বলা শুরু করলেন ও নাটক সিমবলিক, অর্থাৎ বাস্তব নয়। জীবনে যতটুকু দেখা যায়, তাই কেবল বাস্তব, না-দেখা যতটা থাকে সব অবাস্তব, এমন কথা ভারতবর্ষের কথা নয়। ভারতীয় প্রবুদ্ধ মন মুহূর্তে মাটি থেকে আকাশে, তৃণগুচ্ছ থেকে তত্ত্বশীর্ষে, পরিক্রমা করে ফেরে; ভূলোক দ্যুলোক তার কাছে ব্যবধানবিহীন। বাস্তব না হলেও তা তার পরম আশ্রয়, তার পরিণতির পথের পরম সম্পদ। বিদেশীরা যে নিষ্ঠা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের নানা নাটকের রূপ দিল, আমরা যদি তার সিকি নিষ্ঠা নিয়েও তাঁর

নাটকগুলিকে রূপ দেবার চেষ্টা করতাম, তাহলে আমাদের নাটক একটা বিশিষ্ট রূপ পেত, যা অপরাপর জাতির নাটক থেকে স্বতন্ত্র। কিন্তু দেব কি করে? জাতি হিসেবে সত্যি সত্যিই আমরা আজও আমাদের স্বাতন্ত্র্যের সন্ধান পাইনি, সন্ধানে প্রবৃত্ত হবার অবসরও পাইনি।

৫

দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষীরোদপ্রসাদের পর নাট্যশালা যে-সব নাটক উপহার দিয়েছে তাতে নানা একসপেরিমেণ্টের পরিচয় পাওয়া যায়। নাটক সংক্ষিপ্ত হয়েছে, সংলাপ তীক্ষ্ণতর ও অধিকতর পুর্বাপর সংগতি-সংরক্ষক (কন্‌সিকোয়েন্সাল) হয়েছে, গতিসম্পন্ন হয়েছে। ঘূর্ণায়মান মঞ্চ চালু হবার ফলে মঞ্চ সাজাবার জন্য অপরিহার্য অতিরিক্ত দৃশ্য রচনার প্রয়োজনীয়তা থেকে নাট্যকার মুক্তি পেয়েছেন। মঞ্চে নানা ফর্মের নাটক অভিনীত হয়েছে, নাটক আলো-ছায়ার সহায়তা নেবার চেষ্টা করেছে, বিষয়-বস্তুর দিক দিয়েও জাতির প্রয়োজনকে অধিকতর লক্ষ্যের বিষয় করে নিয়েছে। সমাজ, নারী, রাষ্ট্র, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা নাটকের বিষয়-বস্তুরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। ততদিনে বিদেশী নাটকের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠতর হয়েছে। তাদের কিছু-কিছু প্রভাব এ-দেশের নাটকেও এসে পড়েছে। কিন্তু যে প্রতিভা বিদেশের ওই সব নাটক সৃষ্টি করেছে, সে প্রতিভার আবির্ভাব এ-দেশে হয়নি। তার আর করা যায় কি? প্রতিভা তো চাবুক মেরে তৈরি করা যায় না। বিলেত ইবসেনকে নিয়ে খুব হৈ-চৈ করল। ইবসেনের প্রভাবে বিলেতে পিনেরোর আবির্ভাব হল, বার্ণার্ড শর আবির্ভাব হল। কিন্তু পিনেরো বা শ' ইবসেন হলেন না। ফাউস্টের একই গল্প নিয়ে নাটক লিখলেন মারলো আর গ্যেটে, কিন্তু নাটক পেল দুটো স্বতন্ত্র রূপ। ফরাসী নাটকের আদর্শ নিয়ে ইংলণ্ডে অজস্র নাটক রচিত হল, কিন্তু মলেয়ার রেসিন কর্নেলি ইংলণ্ডের মাটিতে একটিও গজালেন না—ফ্রান্সেও ফিরে-ফিরতি নয়। সেকসপীয়ারের দেশেই কি আবার

সেক্‌সপীয়ারেও আবির্ভাব হল? সেক্‌সপীয়ারোত্তর শ্রেষ্ঠ ইংরেজি ভাষার নাট্যকার শ'-এর রচনার মাঝে সেক্‌সপীয়ারের কতটুকু আছে? অস্কার-ওয়াইল্ড আর-একজন দিকপাল নাট্যকার। কিন্তু তার ভাষা বাদ দিলে নাটকের বস্তু থাকে কতটুকু? তাঁর ডাচেস অব পাডুয়া বাঙলায় তর্জমা হয়ে মঞ্চে অভিনীত হয়েছে ইরানের রানী রূপে। নাটক হিসেবে সে রচনা মর্যাদা পায়নি। গলসওয়ার্দি নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। তাঁর নাটক এদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য। কিন্তু এ-দেশের নোবেল-লরিয়েট রবীন্দ্রনাথের নাটক এদেশে উপেক্ষিত হয়েছে, ইংরেজি নাটকের সঙ্গে মিল নেই বলে। শকুন্তলার সঙ্গে গ্যেটের নাটকের কোথাও মিল নেই, কিন্তু গ্যেটে শকুন্তলা পড়ে মুগ্ধ হয়ে তার ওপর একটা কবিতাই লিখে ফেললেন। রবীন্দ্রনাথের যে নাটকগুলি বিদেশীরা তর্জমা করে অভিনয় করল, তাঁর দেশের লোক সেগুলি অভিনয় করবার যোগ্যতা অর্জন করবার চেষ্টাও করল না। ইবসেন বাংলায় অনূদিত হয়েছে, কিন্তু নাট্যশালায় স্থান পায়নি। না পাবার এ কারণ নয় যে আমরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বিরোধী, পুরুষপরম্পরা প্রবৃত্তির প্রকোপে অবিশ্বাসী, কারণ এই যে ইবসেনের নাটকীয়তা আমাদেরকে চমৎকৃত করেনি। গোর্কির চেয়ে চেকভ আমাদের দেশে আগে আসা উচিত ছিল, কিন্তু দুজনার কাউকেই আমাদের নাট্যশালায় স্থান দেওয়া সম্ভব হয়নি। সমালোচকরা বলেন অমুক নাটকের মতো নাটক কোথায়? কিন্তু যদি শ'র ব্যাক টু ম্যাথুসেলা অথবা জনবুল্‌স্ আদার আইল্যাণ্ড, অথবা ম্যান য়্যান সুপারম্যান, কি ক্যাণ্ডিডাই মঞ্চস্থ করা যায়, তাহলে না দেখবেন তাঁরা, না দেখবেন নিত্যকারের দর্শকরা। আমি বিয়র্নসনের নিউলি ম্যারেড কাপ্‌ল তর্জমা করে মঞ্চস্থ করেছিলাম তার সঙ্গে আরো দুটো দৃশ্য জুড়ে দিয়ে। তা করবার দরকার ছিল না। কিন্তু চলবে না মনে করেই ও-কাজ করতে হয়েছিল। অবশ্য খুবই চলেছিল। মোপাসাঁর গল্প ইউসলেস বিউটি নাটকে রূপায়িত করেছিলাম। প্রথমবার চলেছিল দুর্গাদাসের অনুপম অভিনয়ের

জন্য। তাঁর অবর্তমানে আর একবার পুনরভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিলাম, চলেনি। ইউজিন ও-নীলের স্ট্রেঞ্জ ইণ্টারলিউড যদি তর্জমা করা যায়, নিশ্চিতই চলবে না; মোর্নিং বিকামস ইলেক্ট্রাও না, আণ্ডার দি এমস্‌ও না। সেকসপীয়ারের ম্যাকবেথ চলেনি, যদিচ গিরিশের অনুবাদের সুখ্যাতি সবাই করেছিলেন। দেবেন বসু ওথেলোর ভালো অনুবাদই করেছিলেন, কিন্তু নিষ্ফল। অথচ হ্যামলেটের অমরেন্দ্র দত্ত-প্রদত্ত রূপ হরিরাজ চলেছিল। সাইন-অব-দি-ক্রসও দর্শক আকর্ষণ করেছিল। সব দেশেই বিদেশী নাটক মঞ্চস্থ হয়। কি রকম চলে বা চলে না, তার সঠিক খবর আমার জানা নেই। কিন্তু কিছুদিন যে চলে তা শুনতে পাই। আমাদের দেশে ওর দৃষ্টান্ত বিরল। আমরা বলবার সময় যে দাবী জানাই, দেখবার সময় তা দেখতে চাইনা। রবীন্দ্রনাথের নাটক দেখে বলি ও কি চলে। বার্ণার্ড শ' প্রভাবান্বিত নাটক দেখে বলি ও বিদেশী চাল এ-দেশে চলবে না, শকুন্তলার সার্থক অনুবাদকেও সেকেলে বলে উড়িয়ে দিই। লোয়ার ডেপাথস অনূদিত হয়ে পড়েই থাকে, মঞ্চে স্থান পায়না। নাট্যকাররা কিন্তু নানা পরখ করেই যান। বাইরের লোকেরা জানেন না যে নাট্যকাররা আর অভিনেত্রীরা নাট্যশালার কেউ নন। নাট্যশালা তাঁদের মত দ্বারা পরিচালিত হয় না। যতদিন তাঁরা পয়সা এনে দিতে পারেন, ততদিন তাঁরা কিছুটা আদর পান, কিন্তু পয়সা এনে দিতে না পারলে অর্ধচন্দ্র লাভ করেন। তাঁদের সহায়তা করবার জন্য এ-দেশে সেঞ্চুরী থিয়েটার কি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট থিয়েটারও হয় না, কি চ্যারিংটন, গ্রেইন, উইলিয়াম আর্চারের মতো কর্ণধাররাও এগিয়ে আসেন না। আগে কিছু কিছু সত্যিকারের নাট্যানুরাগী এগিয়ে আসতেন, এখন আসেন না। নাটক ছাড়া আর সব লেখাই একক রূপ দেওয়া যায়, কিন্তু নাটককে একক রূপ দেওয়া যায় না, লেখা যদিচ যায়। কিন্তু লিখিত রূপটাই নাটকের সবটা নয় বলেই থিয়েটারও চাই, রূপ ফুটিয়ে তোলবার মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীও চাই,

আবার ব্যবসায় বুদ্ধিসম্পন্ন সাধু ম্যানেজারও চাই। আরো অনেক কিছু চাই। এ সমাবেশ সর্বত্র সব সময়ে ঘটে না, আমাদের দেশে কদাচ ঘটে। নাটক বিচার করতে বসলে এ-সব কথা মনে রাখা দরকার। এই সব কথা মনে করে যদি আমাদের মাত্র আশী বছরের নাট্যপ্রয়াস বিচার করা যায়, তাহলে হাজারো ক্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়লেও এটা জানা যাবে যে নাটক অগ্রগামী হয়েছে এবং দর্শকদেরকেও এগিয়ে নিয়েছে। পরবশতার দিনে দ্বিজেন্দ্রলাল ক্ষীরোদ প্রসাদের পর সব নাটককে এগিয়ে যাঁরা দিয়েছেন তাঁদের মাঝে মন্মথ রায়, রবীন্দ্র মৈত্র, যোগেশ চৌধুরী, শরৎ ঘোষ, তারাশঙ্কর, প্রমথ বিশী, প্রবোধ মজুমদার, বিধায়ক ভট্টাচার্য, নিতাই ভট্টাচার্য প্রভৃতি নিশ্চিতই স্বীকৃতি পাবার অধিকারী। ক্রুটির কথা কিন্তু তুলছি না।

৬

স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমি যে নাটকখানি লিখি তা হচ্ছে 'এই স্বাধীনতা।' এই স্বাধীনতাকে আমি মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে চাইনি, শুধু দেখিয়েছি পরবশতার দিনে যে জঞ্জাল জড়ো হয়েছিল, স্বাধীনতা তা উড়িয়ে দিতে পারেনি। বাস্তুহারাদের দাবি-দাওয়া, হিন্দু-মুসলমানের দাবি দাওয়া, নানা পরস্পরবিরোধী রাজনীতিক দলাদলির দাবি-দাওয়া, ছোট-খাট স্বার্থ নিয়ে সংঘাত মানুষকে এখনো এমন আত্মহারা দিশাহারা করে রেখেছে যে স্বাধীনতাকে স্বীকার করে নিতেও মন দ্বিধাগ্রস্ত হয়। কিন্তু স্বাধীনতা যেমন সত্য তেমন সত্য এই স্বাধীন জাতির মানুষ। এই মানুষ পরবশতাকে মেনে নেয়নি, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে অনিবার্য দুর্গতি এসেছে, তাও মেনে নেবে না, সভ্যতার সংকটে রবীন্দ্রনাথ মানুষের ওপর যে বিশ্বাস ব্যক্ত করে গিয়েছিলেন তাই দিয়ে আমি নাটক শেষ করি। দ্বিতীয় নাটক 'কালো-টাকা' কালোবাজারের এক কারবারী আর তার স্বদেশ-সেবিকা স্ত্রীর দ্বন্দ্ব এই নাটকের বিষয়বস্তু। স্ত্রী চায় স্বামীকে কলঙ্ক-মুক্ত করতে আর স্বামী

চায় স্ত্রীকে মিথ্যায় ভুলিয়ে রেখে নানা অসদুপায়ে অর্থ সঞ্চয় করতে। স্বামীকে শেষে দণ্ড নিতে হয় এবং স্ত্রী সেই দণ্ডকে কল্যাণকর বলেই গ্রহণ করে এই আশা নিয়ে যে অসদুপায়ে অর্জিত সঞ্চয় যখন স্বামীর আর থাকবে না, তখন স্বামীর রূপান্তর ঘটবে এবং তখনই স্বামীর ঘর করতে তার আর কুণ্ঠা থাকবে না। তৃতীয় নাটক যা লিখি, তা হচ্ছে 'অনুরাগ'। সেও বাস্তুহারাদের নিয়ে রচিত নাটক। ঢাকার একজন শ্রেষ্ঠ উকিল, তার গ্রাজুয়েট মেয়ে এবং মেয়ের সহপাঠী কয়েকটি তরুণ-তরুণী কলকাতায় যে দুর্দশায় পড়েছে, তাই দিয়ে শুরু করে বর্তমানের নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী জেনে এবং না-জেনে যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছে এবং ইতিহাস তাদের কাছে যে দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়েছে নাটকে তাই ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রেণী দেশ-বিভাগের অনেক আগেই পল্লী ত্যাগ করেছিল। সেইটেই হয়েছিল তাদের বড় ভুল। জাতির জীবনের সঙ্গে তারা সংযোগহীন হয়ে পড়ে। দেশ-বিভাগ তারই ঐতিহাসিক প্রতিক্রিয়া। বাস্তুহারার সৃষ্টি ঐতিহাসিক তাগিদ, অস্বাভাবিক শ্রেণীভেদ বিলুপ্তির দাবী। নিম্ন-মধ্যবিত্তদের এক জেনারেশনের সাধনার ফলে স্বাধীনতা এসেছে। স্বাধীনতা এসেছে কিন্তু স্বস্তি আসেনি। ইতিহাসের দাবী পূর্ণ হয়নি। তাই নিম্ন-মধ্যবিত্তদেরকে শ্রেণী-বিভেদ ঘুচিয়ে দিয়ে মিলতে হবে কৃষক-শ্রমিকদের সঙ্গে। প্রচারকের ভূমিকা নিয়ে নয়, একেবারে রক্তের সম্বন্ধ স্থাপন করতে হবে, যাতে করে পরবর্তী জেনারেশন মানুষ হতে পারে। এই উপলব্ধি আসে আমার তরুণ-নায়কের চিত্তে। সে চলে যেতে চায় পল্লীতে। কিন্তু 'উকিলের মেয়ে' নাটকের নায়িকা তাতে রাজী হয় না, নায়কের বন্ধুরাও না। নায়ক একাই পথে পা বাড়ায়, পরগাছার মতো হয়ে নিম্ন-মধ্যবিত্তরা আর বেঁচে থাকতে পারবে না এই বিশ্বাস নিয়ে। প্রথম দুখানা নাটক অভিনীত হয়েছে, কিন্তু আশানুরূপ চলেনি। তৃতীয় নাটকখানি অভিনীত হয়নি।

তুলসী লাহিড়ীর 'তুঃখীর ইমান' বিষয়বস্তুর দিক দিয়েই কেবল নাট্যশালার নাটকে নূতনত্ব আনেনি, ভাষায় ও গঠনেও নাটকখানি নূতন। আরো বড কথা এই যে, নাটকখানি জনপ্রিয়ও হয়, খুব নামকরা অভিনেতৃ সমাবেশ ব্যতীত। কিন্তু এই সাফল্য সত্ত্বেও তুলসী লাহিড়ীর পরবর্তী নাটক 'পথিক' নাট্যশালায় অভিনীত হয় না। পথিক অভিনয় করেন বহুরূপী। কংগ্রেসের আদর্শ, সশস্ত্র বিপ্লবের বিকৃত রূপ এবং নিরস্ত্র সমাজ বিপ্লব বিশ্লেষণ করবার অভিপ্রায়ে এই নাটকখানি রচিত হয়। একটি দৃশ্যে সমগ্র নাটকখানি অভিনীত হয়। জনপ্রিয়ও হয় নাটকখানি। তুলসী লাহিড়ীর তৃতীয় নাটকও বহুরূপী সম্প্রদায় অভিনয় করেন,—ছেঁড়া তার। ছেঁড়া তার সর্বপ্রকারেই নতুন নাটক। বহু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দীনবন্ধুর নীলদর্পণকে স্মৃতিতে এনে দেয়। রংপুরের পল্লী-চিত্র যেমন বর্ণাঢ্য হয়ে ওঠে, তেমনি বাংলার কৃষক-কুলের বাস্তব চিত্র। তাদের আবেগ, তাদের আশা-নিরাশা, তাদের সংসারকে সাজিয়ে তোলবার আকাঙ্ক্ষা, ষড়যন্ত্রের ফলে তাদের সাজানো বাগান শুকিয়ে যাওয়া, তুলসী লাহিড়ী শিল্পীর নৈপুণ্য নিয়ে, শিল্পীর সংযম নিয়ে যেমন ফুটিয়ে তুলেছেন, তেমন রূপ দিয়েছেন তাদের লোক-নৃত্যের সাহায্যে, লোক-সংগীতের সাহায্যে, তাদের জীবনের ছোট-খাট রোমান্সের সাহায্যে বাংলার চাষীদের মনের রঙকে। ওরই সাথে তিনি দেখিয়েছেন ওই সরল, উচ্ছল, অসন্দিগ্ধ নর-নারীর জীবনের স্বল্প সম্বলটুকুও হরণ করবার জন্য লুব্ধ শোষকরা, ক্ষুদ্র স্বার্থান্বেষীরা বৃহত্তর শোষণের যন্ত্র-স্বরূপ হয়ে কেমন করে জাতির শতকরা নিরনব্বই জনের জীবন-রস শুষে নিচ্ছে। তারও চেয়ে বড় কথা এরা প্রতিকারের জন্য দলবদ্ধ হচ্ছে। হিন্দু নিজেকে কেবল হিন্দু মনে করছে না, মুসলমান নিজেকে কেবল মুসলমান মনে করছে না। তাদের সকলেরই উপলব্ধিতে এসেছে তাদের জীবন মরণ একসূত্রে গ্রথিত। পরবশতার দিনে এ ধরনের নাটক একখানিও মঞ্চস্থ হয়নি। তুলসী লাহিড়ীর আরো নাটক রচিত আছে, অভিনয়ের স্থান নেই।

বহুরূপীর পরিচালক শম্ভু মিত্র একখানি নাটক লিখেছেন। তার নাম উলুখাগড়া! আজকার যে ছেলেমেয়েরা কাজ করতে প্রস্তুত থেকেও ক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিতে পারল না, দেশার্চনার ফুল হয়ে ফুটে উঠতে পারল না, উলুখাগড়ার মতোই যারা উপেক্ষিত রইল—তাদের কথা, আজকার সংসারকে দেখবার তাদের দৃষ্টিকোণের কিছুটা হদিস এই নাটকে পাওয়া যায়। তাদের বাপ অনেক বড় বড় বুলি চালিয়ে তার অনেক হীন কাজ ঢাকা দিতে চায় সন্তানদের দৃষ্টি থেকেও, কিন্তু পদে পদে ধরা পড়ে যায় তাদের কাছে! সন্তানরা বাপকে শ্রদ্ধা করতে পারে না, ভালোবাসতে পারে না, কিন্তু নির্মমও হতে পারে না। তাদের মা, খুব ভালো মা, গোড়া থেকেই স্বামীর কাছে ঠকে ঠকে স্বামীর ওপর আস্থা হারিয়েছে। স্বামীর প্রবঞ্চনা, স্বামীর অবহেলা তার দেহে মনে এনে দিয়েছে নিউরোসিস। সেই জন্য বাৎসল্যে ভরপুর হয়েও মা তা প্রকাশ করতে পারে না। তা পারে না বলেই সন্তানদের অনুকম্পার পাত্রী হয়ে থাকে। বোঝেও তা। বুঝে ব্যথাও পায়। কিন্তু অন্তরের রুদ্ধ দ্বার সন্তানদের সামনে খুলে ধরতে পারে না ওই মা। সন্তানরা তাও বোঝে। বুঝেও, মাকে ভালোবেসেও, তারা তৃপ্তি পায় না। বাপের দিকে চেয়ে, মায়ের দিকে চেয়ে, সংসারের দিকে চেয়ে তারা স্থির করতে পারে না এই পরিবেশে তাদের স্থান কোথায়। তারা মনে করে তাদের বাপমায়ের গড়ে তোলা এই সংসারের ভিত প্রবঞ্চনার ওপর গড়া, লোভের ওপর গড়া, প্রভুত্ব-প্রয়াসী ভর্তার ব্যক্তিস্বার্থের ওপর গড়া। মায়া এখানে জাল বুনতে পারে না, স্নেহ এখানে শুকিয়ে যায়, মানুষের সংসার এ নয়, এ নিছক দিন কাটাবার মতো আহারের ও বিহারের আস্তানা, এবং তাও পেতে হয় নানা বিষয়ে নতি স্বীকার করে। সংসারের ওপর, সমাজের ওপর, মানুষের ওপর তাদের বিশ্বাস থাকে না। নিজেদের অস্তিত্বকেই দারুণ পরিহাস বলে মনে করে তারা। তারা

ভাবে তারা কারো বংশধর নয়, কোনো সৃষ্টিধর নয় তারা, তারা ভুঁইফোড়, তারা উলুখাগড়া। নাটকের বিষয়বস্তু এই। শম্ভু মিত্র এই একখানি নাটকই এ পর্যন্ত লিখেছেন। বহুরূপী এর অনবদ্য অভিনয় করেছেন। কিন্তু নাটকখানি শম্ভু মিত্র ছাপতে পারেননি। সাধারণ নাট্যশালায় অভিনীত হয়নি বলে প্রকাশকরা ওর পেছনে অর্থব্যয় করতে সম্মত নন। আমি কয়েকজনকে অনুরোধ করেও রাজী করাতে পারিনি।

সলিল সেন নামক একটি তরুণ নাটক লেখা শুরু করেছেন। তাঁর প্রথম নাটক 'নতুন ইহুদী' সাধারণ নাট্যশালায় স্থান না পেলেও প্রগ্রেসিভ শিল্পীদের দ্বারা অভিনীত হয়ে খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। নাটকখানি সিনেমার পর্দাতেও প্রতিফলিত হয়েছে। বাস্তুহারাদের মর্মন্তুদ কাহিনী এই নাটকের বিষয়-বস্তু। অনাহার, আচ্ছাদনের অভাব, চরিত্রনাশ, মর্যাদা নাশ, আত্ম-বিনাশ, মৃত্যু, সবই এতে দেখানো হয়েছে। ছিন্নমূল একটি পরিবার নামতে নামতে একেবারে পাতালের চিরান্ধকারে চোখের সামনে ডুবে যাচ্ছে। কিন্তু নাট্যকার এই বিলুপ্তির চরম মুহূর্তে পরিত্রাণের একটা পথেরও নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশ নাট্যকারই দিয়েছেন, নাটক দেয়নি। সে নির্দেশ নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু আজকার দুর্যোগ অতিক্রম করবার প্রয়াসের প্রয়োজনীয়তার ইঙ্গিত এই নাটক বহন করছে বলেও এর মূল্য দিতে হয়। সাধারণ নাট্যশালা এ নাটকখানিকেও মঞ্চস্থ করবার আগ্রহ দেখাননি।

জিতেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর একজন নূতন নাট্যকার। তাঁর 'পরিচয়' নামক নাটক নাট্যাচার্য শিশিরকুমার মঞ্চস্থ করেন। সমাজে আজো নারীকে কত রকমে ছোট করে রাখা হচ্ছে, অসহায় করে রাখা হচ্ছে, আজও পুরুষের কত পাপ নারীকে নীরবে বহন করতে হচ্ছে, হজম করতে হচ্ছে পরিচয় নাটকে তার নানা চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। হিন্দুর হিঁদুয়ানির আর মুসলমানের ঐস্লামিক আভিজাত্যের চাপে মানুষ কেমন

করে বিকৃত হয়ে সমাজকে শিথিল করে দিয়ে মানুষের পায়ের তলা থেকে দাঁড়াবার মাটি সরিয়ে নিচ্ছে, তাও এই নাটকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে। সমাজের এরকম চিত্র পরবশতার আমলের কোনো নাটকে দেখেছি বলে মনে হয় না। সকলের দৃষ্টিতে এ চিত্র ধরা পড়ে না। শিলাইদহ কাছারীতে পুণ্যাহের এক উৎসবে হল-ঘরের মেঝেয় কার্পেট খানিকটা গুটিয়ে রাখা হয়েছিল মুসলমান প্রজাদের বসবার জায়গা করে দেবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ তাই দেখে বেদনাহত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন ওই কার্পেট গুটিয়ে রাখার পরিণতি কোথায়? পরিণতি কিন্তু দেশ বিভাগেও চরম রূপ পায়নি। মনে হয় আরো তোলা আছে। পরিচয়ের নাট্যকার ওই পরিণামের কথা মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন কিনা ঠিক করে বলতে পারি না। কিন্তু নাটক দেখতে বসে ও-কথাটাও আমার মনকে আর একবার নাড়া দিয়েছিল।

স্বাধীনতার পরের আলোচ্য এই পাঁচবছরের সাধারণ নাট্যশালায় চারখানি মাত্র নতুন নাটক মঞ্চস্থ হয়। সে চারখানি 'দুঃখীর ইমান', 'কালো টাকা', 'পরিচয়' আর 'এই স্বাধীনতা'। এক দুঃখীর ইমান ছাড়া আর কোন নাটক থিয়েটার চালু রাখবার মতো পয়সা দেয় না। নাট্যশালা তাই কম্বিনেশন অভিনয় আর উপন্যাসের নাট্যরূপ প্রতিফলনে মন দেয়। নতুন লেখকরা নাটক লিখছেন। কিন্তু এতদিন যে ধরনের নাটক এদেশে চলে এসেছে সে ধরনের নাটক কেউ লিখছেন না। নাট্যশালা যে-রকম চায়, নতুন লেখকরা যদি সে-রকম নাটক না লেখেন আর নাট্যশালা যদি নতুন লেখকরা যে-নাটক লেখেন তা মঞ্চস্থ করতে ভরসা না পান, তাহলে নাট্যশালা নাটক পাবে না, উপন্যাসের নাট্যরূপই তাদের ক্রমাগত পরিবেশন করতে হবে। এ রকম অবস্থা সকল দেশেই সময়ে সময়ে হয়েছে। নতুন লেখকদের সমাজ-চেতনা আর জীবন-দর্শন নাট্যশালার মালিক ও দর্শকদের চেতনা আর দর্শনের

সঙ্গে এক হয়ে উঠতে পারছে না বলেই এই বিপর্যয় ঘটেছে। আমেরিকায়ও এই বিপর্যয় ঘটেছে। তাই ও-সব দেশে গ্রুপ-থিয়েটারের সংখ্যা এত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পিপল্‌স রিপাবলিকগুলিতে এ বিপর্যয় নেই। কেননা তাদের রাষ্ট্র স্থির করে নিয়েছে নাটককে কি রূপ দেওয়া হবে। স্বাধীন ভারতে এখনো তা ঠিক করা হয়নি, অদূর ভবিষ্যতে তা করতে হবে। নইলে নাট্যশালা থাকবে না। আমি আশা করি ভারত গবর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত সংগীত নাটক আকাদমী এ দিকে দৃষ্টি দেবেন—যেমন আশা করি আপনারাও সহযোগিতায় অগ্রসর হবেন। সাহিত্যসমাবেশে নাট্যকারদের স্থান হয় না। বিশ্বভারতীর সীমানার মধ্যে সাহিত্যমেলা মিলিয়ে আপনারা যদি নাটককে পরিহার করতেন তাহলে গুরুদেবের একটা বড় প্রয়াসকে অস্বীকার করবার অকৃতজ্ঞতায় অপরাধী হতেন। আমার বিশ্বাস বিশ্বের নাট্যসমালোচকরা নাটক সম্বন্ধে যাই বলুন, বাংলার নাটক রবীন্দ্র-নাট্যাদর্শকে অবলম্বন করেই পরিণতির পথে এগিয়ে যাবে। একই বৈঠকে কাব্য আর নাটককে আলোচনার বিষয় করে আপনারা আমাকে বোঝবার অবসর দিয়েছেন যে আমার মতো আপনারাও মনে মনে মেনে নিয়েছেন যে নাটক কাব্যকে বর্জন করে চলতে পারে না, নাটক জাগ্রত জাতির জীবন-কাব্য।

ভাষণ: কাব্য ও নাটক

প্রবোধচন্দ্র সেন

কাব্যের আলোচনাপ্রসঙ্গে আজকের সভায় বেশ বিতর্কের অবতারণা হয়েছে। আমার মনে হয় এটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ আজকালকার লেখায় পরীক্ষারই প্রাধান্য; এ বিতর্কও তাই অবশ্যম্ভাবী। বক্তাদের মধ্যে অনেকেই নামকরা লিখিয়ে। এঁরা বিশেষ ভাবে সক্রিয় ও সজীব। এঁদের সাধনা সর্বজনস্বীকৃত। সুতরাং এঁদের বক্তব্য শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করে দেখা কর্তব্য। বক্তাদের সকলের সঙ্গে একমত হয়েছি এমন নয়। তবে এঁদের মতামত শুনে নিঃসন্দেহে উপকৃত হয়েছি। একটি-মাত্র কথা আমি বলব। যুগের প্রয়োজনে কাব্যের সৃষ্টি, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে কাব্যও যে যুগকে নিয়ন্ত্রিত করবে, আজকের দিশাহারা অবস্থা থেকে মানুষকে উদ্ধার করবে, এ আশাও অন্যায় নয়।

নাটক জিনিসটা জাতীয় চরিত্রের উপর নির্ভরশীল। কাব্যে প্রতিফলিত হয় জাতির ভাব। সেই কারণেই কাব্যে জাতির ভাবের নিয়ন্ত্রণ,—নাটকে চরিত্রের। ইংরেজি নাটক যে এত শক্তিশালী, সেটা ইংরেজ-চরিত্রেরই গুণে। প্রাচীনকালে আমাদের দেশে নাটকের অভাব ছিল না। মধ্য যুগে নাটকের চর্চা হঠাৎ কমে যায়, তার কারণ জাতি হিসেবে আমরা তখন চরিত্রহীন হয়ে পড়ি। উনবিংশ শতাব্দীতে নাট্যপ্রচেষ্টা আবার দেখা দিল। কিন্তু আজও তা কাব্য ও কথাসাহিত্যের মতো সার্থক হয়ে

উঠতে পারে নি। এতে হতাশ হবার কোনো কারণ নেই। জীবনের বেগ চারিদিকে সঞ্চারিত হবার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। এই জীবনের বেগ যখন পূর্ণরূপে আবির্ভূত হবে নাটক তখনই সার্থক হবে। আমাদের চেষ্টা করতে হবে, সাহিত্য যাতে সংকীর্ণ কোনো গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে আলোর মতো সব দিকে ছড়িয়ে পড়ে। শতকরা নিরানব্বই জন লোক যেখানে সাহিত্যের আস্বাদন থেকে বঞ্চিত, সেখানে সর্বপ্রথম প্রয়োজন সাহিত্যকে জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে সঞ্চারিত করা। সে সাধনার প্রয়াসও আজ সুস্পষ্ট রূপে দেখা দিয়েছে। শুভলক্ষণ দেখা যাচ্ছে বলেই তো মনে হয়। সুতরাং বাংলা নাট্যসাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও কোনো প্রকার নৈরাশ্য পোষণ করা অসংগত হবে॥
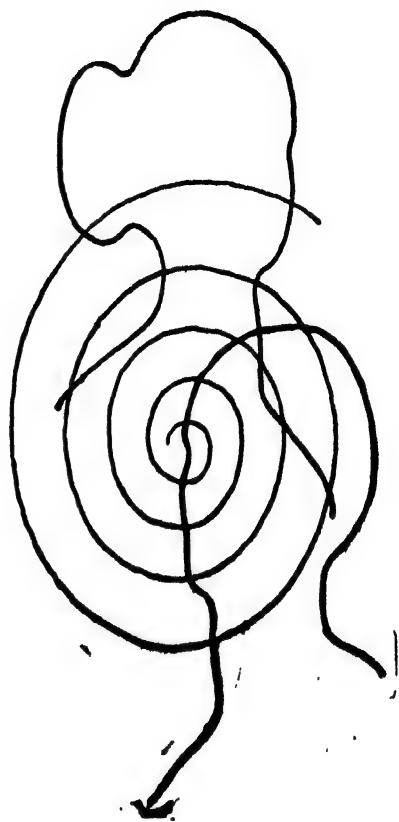
কথাসাহিত্য

সুত্রপাত : কথাসাহিত্য

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

সাহিত্যমেলার আহ্বান বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথেরই আহ্বান। সাহিত্যে তাঁর বিরাট উত্তরাধিকার যাঁরা লাভ করেছেন তাঁরাই আজ এখানে উপস্থিত। তাঁদের কাছেই শুনব, এ উত্তরাধিকারের মর্যাদা কতখানি রক্ষিত হয়েছে গত পাঁচ বছরে। এই ক বছরে আমরা সাহিত্যক্ষেত্রে কী পেয়েছি তা শুধু অপরের জন্যে নয়, তাঁদের নিজেদের জন্যেই জানা ও বিচার করা প্রয়োজন। জানা প্রয়োজন, আমরা রবীন্দ্রনাথের যোগ্য উত্তরাধিকারী হতে পেরেছি কি না।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তি ও দেশবিভাগ উভয় বাংলার জীবনেই একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এ ঐতিহাসিক ঘটনার ছায়া আমাদের জীবনে যেমন পড়েছে গভীরভাবে, তেমনি পড়েছে সাহিত্যেও।

কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে নানা দিক দিয়ে উন্নতি ঘটেছে। বিশেষ করে ছোট গল্পে। বাংলা ছোট গল্প আজ বিস্ময় ও গর্বের বস্তু। উপন্যাসের দিকে অবশ্য অনুরূপ উৎকর্ষ ঐ-পরিমাণে চোখে পড়েনি। যে অবস্থায় মহাভারত রচিত হয়েছিল সে-রকম অবস্থা আজ আবার দেখা দিয়েছে। আর্থিক দুঃখদৈন্য, রাষ্ট্রিক ঝড়ঝাপটা—সবদিক দিয়েই তেমনি একটা পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এ কালেও। একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা অনুভব করছি সকলেই। এ-অনুভূতি থেকে আবার হয়তো মহাভারত লেখা হবে—

এ যুগের মহাভারত। সমকালীন কথাসাহিত্যিকদের কাছে, ঔপন্যাসিকের কাছে এটা আমাদের প্রত্যাশা।

পাঁচ বছরের গল্প-উপন্যাস : বিষয়বস্তু

প্রতিভা বসু

আমার মনে হয় যেটা বর্তমান সেটাকে নিয়ে কিছু লেখা বা বলা সব চাইতে কঠিন কাজ। তা গান ছবি বা সাহিত্য যাই হোক না কেন। তার অসংখ্য অসুবিধের মধ্যে প্রধান এবং প্রথম অসুবিধেটা হল এই যে সেখানে তখনো কালের প্রলেপ না পড়ার দরুন তার কোন মাপকাঠিই তৈরি হয় না, অতএব সেটার কোন সুবিচার করাও সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়তঃ যেটা অতীত সেটার উপর মানুষের একটা স্বাভাবিক মোহ জন্মায়, অতীতকে আমরা উজ্জ্বল করে ভাবতে ভালোবাসি। আর সেই ঔজ্জ্বল্যের কাছে, ভালোবাসার কাছে বর্তমান সর্বদাই অকারণে মলিন হয়ে থাকে। যা ছিল তা-ই বড় ভালো, যা আছে তা নিয়ে আমরা তুষ্ট হতে পারি না। আজকের দিনে যাঁরা ঋষিতুল্য, তাঁদের দিনে তাঁরা কতটুকু স্বীকৃতি পেয়েছিলেন তার খোঁজ নিলে অনেক সময়েই অবাক হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে এ-ও দেখা যায় যে সেই ঋষিত্বের মূল্য কেবলমাত্র তাঁদের অতীতের গৌরব ছাড়া আর কিছু নয়।

বর্তমানে, অন্ততঃ এই গেল-চার পাঁচ-বছরের মধ্যে গল্প বা উপন্যাস কতটা পুষ্ট হয়েছে, আদৌ হয়েছে কিনা কিম্বা সাহিত্যের ভাণ্ডারে চিরন্তন হবার দাবী রাখে কিনা একথা বলে দেয়া তাই অত্যন্ত শক্ত। আমরা সাধারণত গল্প উপন্যাসের মধ্যে কী খুঁজি সেটাই তাহলে সর্বাগ্রে দেখে নিতে হয়।

ইদানীং রাজনৈতিক বিরোধিতা, এবং নানামুনির নানামতের ফলে শুধু ভারতবর্ষ নয়, সারা পৃথিবীই ক্ষত বিক্ষত। ছোটো করে তার মধ্যে যদি আমরা বাঙালীরা একমাত্র বাঙলাদেশকেই দেখি তা হলে তো গভীর অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাওয়া যায় না। সামাজিক বিশৃঙ্খলার প্রভাব কাটিয়ে তার বিপরীত স্রোতে চলা শুধু শক্ত নয়, প্রায় অসম্ভব।

এজন্যেই দেখা যাচ্ছে যে আজকাল অনেক শক্তিমান লেখকই নিজেদের কলমকে প্রায় একটি প্রচার-কার্যের যন্ত্র হিসেবেই ব্যবহার করছেন বেশী। তাঁরা কেন এ কথা ভাবছেন না যে আজকের সমাজের অনুশাসনে লেখা গল্প বা উপন্যাস কালকের সমাজে অতি তুচ্ছ হয়ে ভেসে যাবে, সে কথা ভেবে আশ্চর্য লাগে। কেননা সাহিত্য কখনো দেশগত কালগত বা দলগত হয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। সত্যিকারের নিষ্ঠাবান শিল্পী তাঁর নিজের জগৎ থেকে একচুল নেমে আসেন না, কোনো কারণেই না। তা হলে কলম হয় বল্লম, শালগ্রাম শিলা হয় শিলনোড়া। সেই জন্যেই যে লেখক সমাজের মধ্যেই নিজের চিন্তাধারাকে আবদ্ধ রাখেন তাঁর মৃত্যু ঘটতে দেরি হয় না। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর আয়ুও ফুরিয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে আজকাল হচ্ছেও তাই। সাহিত্যিকরা আমাদের আর গল্প বলছেন না, সংবাদই পরিবেশন করছেন বেশী। সাজাবার কৌশলে খবরকে গল্প বলে যে সব তথ্য তাঁরা শোনাচ্ছেন আমাদের, তা হচ্ছে রক্তারক্তির ইতিহাস। তার মধ্যে দেশ বিভাগ, শ্রমিক আন্দোলন, রক্ত-শোষক প্রভুদের নিষ্ঠুরতা, স্ট্রাইক, সাম্যবাদ, দলীয় কলহ—সব কথাই আছে, নেই শুধু সাহিত্য, সৌন্দর্য। স্ব-স্ব দলের মহিমা কীর্তনেই তাঁরা ব্যস্ত বিব্রত। যে দুঃখ-বেদনার কাহিনী লিখে তাঁরা দুশো পাতা ভরিয়ে ফেলেন সে দুঃখ-বেদনা আমাদের মনকে স্পর্শ করে না। কেননা তাতে আকাশ নেই, বাতাস নেই, অর্থাৎ সীমাবদ্ধ একটি ছোট্ট গণ্ডির মধ্যেই

লেখক পরিভ্রমণ করছেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবসা চলে, প্রচার চলে, কিন্তু সাহিত্য চলে না। মন হচ্ছে মন্দির। মনকে ছুঁতে হলে শুদ্ধ হতে হয়, পবিত্র হতে হয়, নিষ্ঠাবান হতে হয়। তবে তো লেখনীতে দুঃখ-বেদনা আনন্দ প্রেম মালার মতো সংযোজিত হয়ে বেরিয়ে এসে আমাদের ধন্য করবে, ফুল হয়ে ফুটবে। সাহিত্য দলীয় নয়, এমন কি বাঙালীর বা ভারতেরও নয়, একাল, ওকাল সেকালেরও নয়, সব দেশের, সব কালের, সব মতের সব মানুষের সাধারণ সম্পত্তি। যাকে এক দল দুঃখ বলে ঘোষণা করেন, অন্যদল যাকে অন্যায় বলে চিৎকার করেন, আবার রাজা উজিররা যেটাকে ফাঁসির যোগ্য মনে করেন—তার কোনোটিই হয়তো কোনো-একজন লেখকের মনে কোনো আলোড়ন তোলে না। সেটা তাঁর অপরাধ নয়। বরং তাঁর চরিত্রের প্রমাণ। কেন না যিনি শিল্পী তিনি আজকের দিন পেরিয়ে আরো অনেকদূর পর্যন্ত দেখতে পান, যেটা আমরা অনেক পরে বুঝি সেটা তাঁরা অনেক আগে বোঝেন। প্রত্যক্ষ না বুঝলেও পরোক্ষে, তাঁর অবচেতন মনই তাঁকে সেই শক্তি দেয়। তিনি তো শুধু সাময়িক নন—তিনি এসব কালস্রোতে ভাসতে পারেন না। যদি না বুঝে, কোনো রকম প্ররোচনায় একজন শিল্পীর অধঃপতন ঘটে, যদি তিনি সেই অল্পায়ু উত্তেজনায় গা ভাসান তাতে শুধু যে তিনিই বিনষ্ট হন তা নয়, দেশও দরিদ্র হয়।

তাই বলি, সংবাদের জন্য তো সাংবাদিকরাই আছেন, ইতিহাসের জন্য ঐতিহাসিক, তথ্যের পরিবেশনের জন্য খবর কাগজ, কিন্তু লেখকরা যেন সেখানে গিয়ে ধর্মচ্যুত না হন। তাঁরা আপন প্রেরণায় মোহিত হয়ে কাল যাপন করুন, ভালোলাগার, ভালোবাসার আবেগে ভরে থাকুন তাঁরা, আর তাঁদের লেখার মধ্য দিয়ে সেই ভালোলাগা ভালোবাসা সংক্রমিত হোক আমাদের সাংসারিক যন্ত্রণাক্লিষ্ট হৃদয়ে। আমরা স্নাত হই, আমাদের মাথায় শান্তিজল বর্ষিত হোক।

প্রকৃতপক্ষে শিল্পকলাই মনুষ্যজীবনের একমাত্র বিশ্রামাবাস। শিশু সারাদিন খেলাধুলো করে মার বুকের তলায় ফিরে এসে যেমন শান্তি পায়, শিল্পও ঠিক সেই রকমই আমাদের জীবনকে শান্ত করে, আনন্দ দেয়।

অতএব একজন শিল্পীর কাছ থেকে আমরা কী আশা করব? কী চাইব? প্রাণ। প্রাণের বিকাশ। তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে, গানের মধ্য দিয়ে ছবির মধ্যে দিয়ে সেই প্রাণকেই আমরা পেতে চাইব বারে বারে। যে সুখ দুঃখ, আনন্দ বেদনা তিনি অনুভব করে ছড়িয়ে দেবেন তাঁর শিল্পে, সেই সুখ দুঃখ, সেই আনন্দ বেদনা আমাদের হৃদয়েও সংক্রমিত হবে। আর সত্যি বলতে এই সংক্রমিত করার মহৎ গুণটাই হল সাহিত্যের আত্মা। একজন মানুষের যেমন হাজার সুন্দর নাক মুখ চোখও সামান্য একফোঁটা লাবণ্যের অভাবে ব্যর্থ হয়ে যায় তেমনি লেখার মধ্যেও এই গুণের অভাব ঘটলে তার বাক্যবিন্যাস যত পটুই হোক, বাঁধুনি যত সুসমঞ্জসই হোক, তার মধ্যে কোনো প্রাণসঞ্চার হয় না। ঠিক এই প্রাণধর্মিতার গুণেই রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছের মতো গল্প পৃথিবীর সাহিত্যেই বিরল। একটি ছোট মেয়ে তার বাপমার বুক থেকে ছিন্ন হয়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে যখন কাঁদে সেই কান্না আমাদেরও কাঁদায়, আমরাও তখন সেই ছোট বালিকার দুঃখই বহন করি হৃদয়ে। কিম্বা তাঁর গল্পের সেই দুরন্ত মেয়ে যখন নিজের খেলার অন্তরায় স্বামীকে আপদ ভেবে পালিয়ে আসে বাপের বাড়িতে, তারপর স্বামী চলে গেলে পর হঠাৎ আবিষ্কার করে খেলা তো আর ভালো লাগে না। কী যেন নেই, কী যেন হারিয়ে ফেলেছে সে। কোন নাম না জানা ব্যথা গুমরে গুমরে উঠছে তার বুকের মধ্যে—আমরাও তখন সেই বেদনার অংশী হই মনে মনে।

এই যে হৃদয়কে আন্দোলিত করা, পুলকিত করা, মথিত বা মোহিত করা সেটা আজকালকার গল্পে উপন্যাসে বিরল। সবই ভালো সবই ঠিক, হয়তো একথাও বলা সংগত যে গত কয়েক বছরের মধ্যে পাঠযোগ্য ভালো

লেখা অনেক হয়েছে, বুদ্ধিমান লেখার পরিমাণও বেড়েছে, কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে তো আর হৃদয় ছোঁয়া যায় না। প্রাণ কই ?

মোটামুটি বেশ ভালো বলা যায় এমন গল্প উপন্যাস অনেক লেখা হচ্ছে, কিন্তু যে প্রাণধর্মিতার গুণে বই শ্রেষ্ঠ মনে হয় তার অভাব আজকের দিনে সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই চোখে পড়ে। আমি অবিশ্যি অন্নদাশঙ্কর, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার, তারাশঙ্কর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত লেখকের কথা ধরছি না এর মধ্যে, কেননা এঁদের কথা বলতে গেলে এঁদের নিয়েই আলাদা প্রবন্ধ ফাঁদতে হয়। আমি বলছি তরুণতর লেখকদের কথা। তাঁদের লেখা পড়ে মনে হয় হৃদয়কে তাঁরা সন্দেহের চোখে দেখে থাকেন। এটা মারাত্মক, এর মধ্যে বন্ধ্যাতার আশঙ্কা আছে। অবশ্য তরুণতর লেখকদের মধ্যে অন্তত একজনের আমি নাম করতে পারি সানন্দে যাঁর রচনা হৃদয়বান ও জীবন্ত, তিনি নরেন্দ্রনাথ মিত্র। কিন্তু এ বিষয়ে ঠিক তার সধর্মী লেখক আজকের দিনে বেশী নেই, নতুনরা যেন গল্প বলার চাইতে মতবাদ রাষ্ট্র করতেই বেশি ব্যস্ত। হয়তো সম্প্রতি আমরা বুদ্ধির দিকে একটু অগ্রসর হয়েছি। এখন তার সঙ্গে হৃদয়ের যদি পুনর্মিলন ঘটে তা হলেই বাংলা কথাসাহিত্যের ভবিষ্যৎ বিষয়ে আশান্বিত হওয়া যায়॥

বর্তমান কথাসাহিত্যের প্রকৃতি

হরপ্রসাদ মিত্র

শব্দে, শব্দবন্ধে, বাক্য রচনায় যেমন নতুন কালের নতুন ভঙ্গির প্রভাব ছড়াচ্ছে, বাংলা গল্প-উপন্যাসের ধ্যান-ধারণার সর্বত্র তেমনি নতুন অভিব্যক্তির লক্ষণ ফুটে উঠছে। শিল্পীরা নিশ্চেষ্ট নন,—গল্পকার জেগে আছেন,—ঔপন্যাসিক ঘুমিয়ে নেই। বর্তমান বাঙালী জীবনের স্তর ও তরঙ্গের বৈচিত্র্য এবং বাঙালী মনের উল্লাস-অবসাদের বিভিন্নতা সম্পর্কে যাঁরা উদাসীন নন, তাঁদের কাছে একালের বাঙালী কথাসাহিত্যিক-সমাজের দৃষ্টিভেদের সত্য অনায়াসে স্বীকারযোগ্য মনে হবে। খুব সংক্ষেপে এই নব্য সাহিত্যের প্রকৃতি বর্ণনা করতে হলে এই কথাই সর্বাধিক মনে পড়ে যে, আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের মূল-কথা একটি নয়,—দু'টি ; আভ্যন্তরীণ প্রসারণ এবং প্রযুক্তির বিচিত্রতা। জীবনের নদী নয়, নদীর মোহনা নয়,—অশেষ তরঙ্গময় সমুদ্রের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে এ কালের বাংলা গল্পে-উপন্যাসে।

কাজে-কাজেই এ আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক যে, বস্তুরুচির আতিশয্যে একদেশদর্শিতার পরাক্রম থেকে প্রতিপত্তির দিন এখন আসন্ন বা আগত বা প্রতিষ্ঠিত।

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'য় শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্তে' অন্নদাশঙ্কর-দিলীপকুমার-বনফুলের নানান্ লেখায় জীবনের বিস্তারে-গভীরতায়, দু'দিকেই আগ্রহ দেখা গিয়েছিল। গত দশ বছরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের এই বিভাগে

নতুন যে-সব কর্মী ও শিল্পীর কাজ শুরু হয়েছে তাঁরা ঐতিহ্যের দাবী অস্বীকার করেন নি। দেশ-কালের চেহারা বদলের সঙ্গে সঙ্গে উপকরণের প্রভেদ ঘটেছে। বিষয়ের তন্মাত্রতায় নয়, বস্তুপরিবেশের ব্যঞ্জনার দিকেই এঁদের ভিন্ন ভিন্ন প্রয়াসের সমলক্ষ্যতা স্বীকার্য। দেশ-কালের অনিবার্য সীমাবোধ এঁদের রচনার সর্বব্যাপী সাধারণ লক্ষণ। বৃহৎ বিস্তীর্ণ, বিচিত্র বর্তমানের রূপ-নিরীক্ষার আগ্রহই হল বাংলা কথাসাহিত্যের আধুনিক রুচি।

বুদ্ধদেব বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপাল হালদার—একই কালে, একই দেশে ভিন্ন প্রকৃতির এই তিন ব্যক্তির কারও কলম যে অবসন্ন হয়নি, এ থেকে বর্তমান বাঙালীজীবনের মিশ্র-প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। এঁদের উত্তরবর্তী যাঁরা, তাঁরাও বৈচিত্র্যচেতন। সম্প্রতি আমাদের সুখ-দুঃখের নানা রূপের একটি রূপ দেখা গেল প্রতিভা বসুর মনের ময়ূরে। কিন্তু বর্তমান তো একরঙা, একক আবেশ মাত্র নয়। আর নীতিকাব্য প্রণেতার অধিকার হরণ করাও ঔপন্যাসিকের কাজ নয়। ভিন্ন মানুষের ভিন্ন গঠন, ভিন্ন সংস্কার, ভিন্ন রুচি ;—এদিকে, বিজ্ঞানের প্রতাপে বহুকালের আশ্চর্য পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে আসছে ; বিত্তের বিশৃঙ্খলায় মনোরাজ্যের শান্তি বাধা পাচ্ছে ; পুরোনো বিশ্বাস ভাঙছে, নতুন বিশ্বাস গড়ছে—এ অবস্থায় দু'জন কথা-সাহিত্যিকের ঐকমত্য কামনা করা সৎ পাঠকের সুবিবেচনার লক্ষণ নয়। ভিন্নমুখিতা তো বটেই, এমন কি সম্পূর্ণ বিপরীত প্রবণতাও অপ্রত্যাশিত নয়। এইরকম ঘটনাই স্বাভাবিক! শিল্পীর মনঃস্বভাব যাঁদের বিশেষ অন্বেষণের সামগ্রী, সেইসব মনস্তাত্ত্বিকদের মধ্যে কেউ কেউ এ বিষয়ে মাথা ঘামিয়ে স্থির করেছেন যে, শিল্পসৃষ্টির মূলে মনন-অনুভূতি অভিপ্রায়ের যে সমাবেশ ঘটে থাকে তাতে পরস্পর বিপরীত মনোধর্মের যৌগপদ্যও অসম্ভব নয়। কিন্তু চিদ্‌রহস্যের কথা উহ্য থাক। আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে যা দেখা যাচ্ছে অল্প কথায় এই হল তার সূত্রসংকেত :—বস্তু ও প্রযুক্তির বিভিন্নতা, শিল্পীর শ্রম, স্রষ্টার ব্যাকুলতা।

ছোট গল্প কোন্ পথে

আশাপূর্ণা দেবী

গত পাঁচ বছরের মধ্যে বাঙলা কথাসাহিত্যের আবাদে ফসলের পরিমাণ কতখানি, সে বিষয়ে অবহিত হতে পারলে তবেই উৎপন্ন ফসলের গুণাগুণ বিচার সম্ভব। দেখতে হবে—সেই স্তূপীকৃত শস্যের মধ্যে কার ভেতরে কতটুকু শাঁস আছে কে কতখানি খাদ্যপ্রাণসম্পন্ন। কে ঝাড়াই হয়ে উড়ে গিয়ে ধুলোর ওজন বাড়াচ্ছে, আর কে বাছাই হয়ে সসম্মানে গোলায় উঠছে।

অকপটে স্বীকার করছি—পঞ্চবার্ষিকী হিসেব তো দূরের কথা, আজকাল দৈনিক কতটা করে 'সাহিত্য' সৃষ্টি হচ্ছে সে হিসেব রাখাই আমার মতো স্বল্পশক্তিসম্পন্ন লোকের পক্ষে শক্ত। তবে মনে হয়—হয়তো অকস্মাৎ তেমন কোনো আশ্চর্য আবির্ভাব ঘটলে চেষ্টা করে হিসেব রাখতে হয় না। সে খবর কানাকানি হতে হতে জানাজানি হতে দেরী লাগে না। কাছাকাছির মধ্যে তেমন আশ্চর্য আবির্ভাব কই? যা পাঠক সমাজকে সহসা চমকে দেয়, নতুন সম্ভাবনার আশায় আশান্বিত করে তোলে, যে সম্ভাবনার আশা ছিল—"পথে প্রবাসে"তে, ছিল—"পথের পাঁচালীতে", ছিল—"জলসাঘর" অথবা "উপনিবেশের" মধ্যে?

আমার তো—মাঝে মাঝে মনে হয় সাহিত্য-সরস্বতীও বোধ হয় ধনতন্ত্র-বাদের বিরোধী হয়ে উঠেছেন আজকাল। নিজেকে তিনি আর বিশেষ

দু' চারটি পুঁজিপতির ভাঁড়ারে আটকে না রেখে, সুশৃঙ্খল বণ্টনব্যবস্থায় অনেকের কাছে ভাগ করে ফেলতে চাইছেন। তাই বিশেষ কারুর কাছ থেকে বড়ো কিছু একটা পাবার আশা কমে যাচ্ছে। সাহিত্যিকরা সকলেই যেন হৃদয়বিত্তে মধ্যবিত্ত হয়ে পড়েছেন।

তবে অনেকের কাছ থেকে কিছু কিছু পাওয়া যাচ্ছে এই যা। ধারে মা কেটে ভারে কাটছে। বলতে গেলেই কথা বেড়ে যায়—দু'কথা দশ কথায় গিয়ে পৌছতে পারে। সময় সংক্ষিপ্ত তাই আমার সামান্য বক্তব্যটুকু ছোটো গল্প সম্বন্ধেই হবে।

ছোটো গল্প রচনা হচ্ছে অজস্র। তার থেকে মোটা কিছু অংশ ঝড়তি পড়তি বাদ গেলেও—ভাত্তি গল্প অনেক লেখা হয়েছে, হচ্ছে। আশা করছি আরো হবে। ওরই : অল্পবিস্তর যেটুকু পড়তে পেরেছি, তা থেকে একটা জিনিস কিন্তু লক্ষ্যের তু. কিছুকাল থেকে যেন লেখক মহলে একটা জিদ চেপেছে—সুখী হবে এ দুঃখকে কিছুতেই আমল দেবেন না তাঁরা। দৈবক্রমে যে হতভাগ্যদের দুটো ভাত-কাপড়ের সংস্থান আছে তারা অপাঙ্‌ক্তেয়, গল্পজগত থেকে নির্বাসিত। যেন তাদের মধ্যে আশা আনন্দ দুঃখ বেদনা বিরহ মিলনের কোনো দ্বন্দ্ব নেই, যে হেতু তাদের ভাত আছে। বেচারা তাদের জন্যে ভারী মায়া হয় আমার।

বেশীর ভাগ যা লেখা হচ্ছে—তার মধ্যে একটা দুরন্ত জ্বালার তীব্রতা। সাহিত্যিকের লেখনী যেন আজ সাপিনী হয়ে রুদ্ধ আক্রোশে সমাজ জীবনের সমস্ত দুর্নীতির মূলে ছোবল হেনে বেড়াতে চাইছে।

তার কারণ তো অবশ্যই আছে। সাহিত্য তো জীবন ছাড়া নয়; সে জীবনেরই সহযাত্রী। সেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যখন বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহ দেখা দেয়, বঞ্চিত মানুষের মন রুক্ষ হয়ে ওঠে, তখন সাহিত্যে তার ছাপ না পড়ে উপায় কোথা? সাহিত্যিক তো আকাশ থেকে পড়া জীব নয়। সে বিক্ষোভ তো তাকেও বিপর্যস্ত করে তোলে।

তাই মন্বন্তর আর যুদ্ধোত্তর কালের গ্লানিকর আবহাওয়ায় বিষাক্ত অধঃপতিত সমাজের বহু দুর্নীতির ইতিহাস পাকা খাতায় উঠে জমা হয়ে রইল ভাবীকালের জন্যে। অনেক দুর্নিরীক্ষ্য ছবি ধরা পড়ে রইল, সন্ধানী দৃষ্টির ক্যামেরার লেনসে। সেই লেনসে চিনে নেওয়া গেছে অনেক বিভীষণ দুঃশাসনকে! এরও প্রয়োজন রয়েছে, কিন্তু সেইটাই কি একমাত্র সত্য হয়ে উঠবে? যে কোনো শিল্পই, যদি বিশেষ একটা উদ্দেশ্যের জন্যে সৃষ্টি হয়, একটা প্ল্যান অনুযায়ী গড়ে উঠতে চায়, তার গণ্ডি ছোটো হয়ে আসে। দেশ কাল অতিক্রম করে যাবার যে সম্ভাবনা সে সম্ভাবনার শক্তি পঙ্গু হয়ে আসে।

শিল্পী আকাশ থেকে [illegible] [illegible]হিভূত নিজেকে সে মাটির বন্ধনের নাগপাশেই বা আ[illegible] হবে[illegible]তে চাইবে কেন? আকাশের কোথাও কোনোখানে থাক[illegible]কে কতটুকু আশ্রয়? তার কলমের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হবে লড়াই কর[illegible] বাড়াচ্ছে আর কিছু নয়? গল্পকারদের ভেবে দেখতে হবে—এই লড়াই করাটাই [illegible]র শেষ দায়িত্ব কি না। দায়িত্ব এড়াবার ক্ষমতা তো তাঁর নেই। সমাজ তাঁর মুখ চেয়ে বসে থাকে।

কথাশিল্পীকে লক্ষ্য করতে হবে—তাঁর কথা কেবলমাত্র রূঢ় সত্য কথা না হয়ে ওঠে। তার মধ্যে যেন কিছু পরিমাণ মধুর মিথ্যার ভেজাল থাকে। যেন কেবলমাত্র হতাশার ছবি না আঁকেন তাঁরা, একটা বলিষ্ঠ আশাবাদের আদর্শ তাঁর সামনে থাকে।

তা ছাড়া—নিতান্ত নির্জলা সত্যও অবিরত বলতে বলতে জোলো হয়ে ওঠে, আর অবিরাম শুনতে শুনতে নেহাত অনুভূতিশীল মনও অসাড় হয়ে আসে।

তখন বড়ো দুঃখেই প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করে—

ফুটপাথে বসে ফ্যান চায় যারা
তাদের কথাই ভাববো?

তাদের হুতাশে নীল হয়ে যাবে
নীল আকাশের কাব্য ?
বাতায়নে বসে কাঁদিছে যে, গেঁথে
খোঁপায় রজনীগন্ধা,
তার তরে হায় দুনিয়ার যত
দয়ার বাজার মন্দা ?

এ প্রশ্ন যদি হৃদয়হীনতার লক্ষণ হয় তাহলে নিরুপায়। সেই হৃদয়-হীনতার বদনাম স্বীকার করেই বলতে হবে—অন্নবস্ত্রবিরহীর মর্মবেদনা যত নির্লজ্জ যত মর্মান্তিক হোক, তাকে আমরা এক সময় ভুলি কিন্তু প্রিয়া-বিরহী যক্ষের হৃদয়বেদনা কালের গতি অতিক্রম করে চিরদিন অমর হয়ে আছে, চিরকাল অমর হয়ে থাকবে।

আজকের দিনে হয়তো বিরহী যক্ষের তুলনা হাস্যকর সেকেলে, কিন্তু এটাও তো খেয়াল করে দেখতে হবে এ যুগের কথাশিল্পীরা, কোন কথা শোনাচ্ছেন আজকের দিনকে ? কোন কথা রেখে যাচ্ছেন ভাবীদিনের জন্যে ?

কথাসাহিত্যিকের সন্ধানী দৃষ্টি

বাণী রায়

বর্তমানে কথাসাহিত্যের পশ্চাতে কী বিশেষ মনোভাব বিগুমান এবং নিকট ভবিষ্যতে সম্ভবপর স্থূল ধারা কী হতে পারে, আমার নিজস্ব উপলব্ধি দিয়ে একটু বিশ্লেষণের চেষ্টা করব।

বিগত পাঁচ বৎসরের কথাসাহিত্য লক্ষ্য করলে দৃষ্ট হবে যে, কল্পনাগ্রাহ্য সাহিত্য, যথা গল্প—উপন্যাস, ইত্যাদির অপেক্ষা প্রবন্ধজাতীয় রচনার, যথা রম্যরচনা, স্মৃতিকথা, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ইত্যাদির আদর কম নয়। সকল দেশের সাহিত্যেই স্মৃতিকথা বা আত্মচরিত (memoirs)-জাতীয় রচনার সৃষ্টি হচ্ছে প্রচুর।

প্রধান কারণ কী? এযুগের কথাসাহিত্যের পশ্চাতে আছে একটি বিপ্লবাত্মক মনোবৃত্তি। অধুনাতম সাহিত্য নিঃসন্দেহে দুই ভাগে বিভক্ত: প্রাক্-যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর। দু'য়ের মধ্যে সাগরপ্রমাণ ব্যবধান। বর্তমান জগৎ ভাঙাগড়ার জগৎ, অস্থিরতার জগৎ। কিছুই স্থির নয় এখানে। সুতরাং মূল্য আরোপের মানদণ্ডও বদলে যায়। মানুষ অনেক কিছু পার হয়ে এল,—মৃত্যু, দুর্ভিক্ষ, হত্যা। যুদ্ধের ঘটনা ও পরের হতাশা নিয়ে সাহিত্য রচিত হল আলোকচিত্রের ধর্মে। পাঁচ বৎসর পুর্বের কথাসাহিত্যের আশ্রয় ছিল প্রধানতঃ সাংবাদিকতা। সাময়িক ঘটনাস্রোতের উত্তেজনা সাহিত্যকে

আচ্ছন্ন করে ছিল। সেই যুগ শেষ হয়ে গেছে। দৃশ্যমান সাম্প্রতিক জগতের আবেদন আজ প্রায় নিঃশেষিত।

স্বাধীনতাও বাস্তব ভাবে এসে গেছে। সুতরাং সে আন্দোলনও আর সাহিত্যিক মনে ইঙ্গিত আনে না। এখনকার সাহিত্য কোন্ পথে?

আমাদের বিশ্বে যুদ্ধোত্তর যুগের চাবিকাঠি—বিজ্ঞান ও শিল্প। স্থান ও কালকে আমরা বহু আয়ত্তে আনতে পেরেছি। তাই আমরা হাতের মুঠোয় সব ধরতে চাই। যার প্রকট প্রমাণ আমরা পাই না, তার তথ্য আমাদের কাছে সন্দেহজনক। আমাদের যুগ scepticism-এর, সন্দেহবাদের যুগ। আমরা পার হয়ে এসেছি অনেক তিমির রাত্রি। যুদ্ধ-কবির মতো নিজেদেরও কণ্ঠে শুনেছি: "And God never said a word!" এত হতাশা, মানবতার অপমৃত্যু দেখেও যে-ঈশ্বর নির্বাক, তিনি কেমন ঈশ্বর? সত্যই কি তাঁর অস্তিত্ব আছে? তাহলে কেনই বা তাঁকে ধরতে পারি না? বিজ্ঞান আজ আমাদের অনেক বস্তুর অধিকার দিয়েছে। তবে কেনই বা ঈশ্বরকে এই মাইক্‌টার মতোই ধরতে বা ছুঁতে পারব না? মৃত্যু কি অমরত্ব? আমি তো দেখছি মানুষ আমার সম্মুখে ভস্ম হয়ে গেল—তার পরে তার পৃথক সত্তা কোথায়? ভালোবাসা কতখানি বিশ্বাসযোগ্য? আমাদের সমগ্র মানসিকতা আজ এই সব প্রশ্নে জর্জরিত। আমরা কোনো সত্য বিনা পরীক্ষায় গ্রহণে প্রস্তুত নই। ধর্ম আজ আর অন্ধ আরাম নয়।

এইজন্য আমরা বুদ্ধি দিয়ে, যুক্তি দিয়ে তবে বিশ্বাস করতে চাই। আমাদের অনুসন্ধানী মন নিজেকে, পরকে বিশ্লেষণ করে চলেছে। দৃষ্টির অতীত, ইন্দ্রিয়ের অতীত যে-বস্তু সে তো বুদ্ধির অগোচর। তবু আমাদের সন্ধানের শেষ নেই। নিজের প্রজ্ঞার মধ্যে আমরা আশ্রয় চাই।

এই সন্ধান, এই প্রশ্ন এযুগের রূপ; এটা হল Age of Interrogation। এ সন্ধান কোথায় যাত্রা করে? বার বার উর্ধ্বে প্রতিহত হয়ে অবশেষে নিজের মধ্যেই সে ফিরে আসছে। যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, সে কি সত্য? আমার

চারপাশে যদি অস্থির পারিপার্শ্বিক, তাহলে একমাত্র স্থির আমিই সত্য। নিজেকে বারে বারে দেখ, নিজেকে আবিষ্কার করো। তাই এত বেশি স্মৃতিকথা বা আত্মচরিতজাতীয় রচনা। মানুষ স্মৃতির আশ্রয়ে ক্রমাগত আত্ম-দর্শন করছে। আমি কে? কতবার আমি ভাঙাগড়ার ছকে পড়েছি। বাইরের উত্তেজনা শেষ হয়ে যাচ্ছে—এখন তবে মনন আমাদের ধর্ম। Retro-spection যদি অবসিত হয়, introspection আসুক। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ তাই এত সমৃদ্ধ ও প্রিয়। কথাসাহিত্য কিয়ৎপরিমাণে দীন। আলোকচিত্র-ধর্মী রচনা বর্তমানে জীবনদর্শন খুঁজে মরছে।

বর্তমান ও অদূর ভবিষ্যৎ নিশ্চিত New Romanticism-এর যুগ। সর্বত্র মানবমনের নূতন জাগরণ—ধর্মে, প্রেমে, জীবনে। নূতন ঈশ্বর সৃষ্টির উদ্যম, জগতের নূতন রূপ-সৃজন। নিজের উপলব্ধি দিয়ে সত্যকে আবিষ্কার করা। নিজেকে নূতন করে দেখা।

নূতনরূপে সত্যকে আবিষ্কারের পূর্বমুহূর্ত অবশ্য গভীর অতৃপ্তি ও অবিশ্বাসে আচ্ছন্ন। পূর্বেই বলেছি আমরা যুদ্ধ দেখেছি, হত্যা দেখেছি, মন্বন্তরের মধ্য দিয়ে এসেছি। সৈনিক না হলেও আমাদের মনে প্রশ্ন জেগেছে: "And God never said a word!" তবে এই দুঃখবেদনা—হতাশাই কি সত্য? সন্ধান কর—

Infant crying in the night,
Infant crying for the light,
With no language but a cry!

সত্যের বিষ পান করেও আরো সত্য আমরা চাই। তাই সন্ধান ও প্রশ্ন সাহিত্যিক সংগ্রামের জন্ম দিয়েছে। যুক্তিবাদী মন একদিকে বিষ, অন্যদিকে অমৃত বিলিয়ে যায়। একদিকে অতৃপ্তি-অবিশ্বাস যেমন বিষ ফলায়, অন্যদিকে সন্ধান বিশ্লেষণী-মনোবৃত্তির উদ্ভব ঘটায়; সৃজনের অমৃত সেখানে নূতন জগতের জন্মক্ষণ চিহ্নিত করে। গতযুগে বিশ্বাসকে গ্রহণ করে আত্মা গভীর-

ন্তর বিশ্বাসে প্রস্তুত ছিল। এযুগে আর আমরা সর্বতোভাবে গ্রহণে প্রস্তুত নই—আমরা যাচাই করে নিতে চাই সব কিছুই। এযুগে যদি আমরা বিশ্বাসকে পাই তবে প্রশ্নের মধ্য দিয়েই পাব। সন্ধানী দৃষ্টিই আমাদের এক-মাত্র সম্বল।

আমি বিশ্বাস করতে প্রস্তুত, কিন্তু আমাকে বুঝিয়ে দাও। এযুগের সাহিত্যিক তাই সত্যের বিষপান করেও সত্যকে আরও নিবিড় করে চান। আমরা স্বর্গকেও বিশ্বাস করতে চাই, ভারতের আত্মিক সাধনাকেও স্বীকার করতে চাই। কিন্তু চাই পরীক্ষা করে নিতে। এ পরীক্ষার অনেক বিপদ আছে। নির্বিচার বিশ্বাসের অমৃত যুগবিবর্তনে আজ হলাহল হয়ে উঠেছে।

মানুষের পূর্ব অভিজ্ঞতা ও শিক্ষা আজ কোনো কাজে লাগছে না। সে আজ পূর্বের ঈশ্বর, ধর্ম, প্রেম কিছুতেই আশ্রয় পাচ্ছে না। সে আশ্রয় চাইছে নিজের বুদ্ধি-বিচারের কাছে। যে জগৎ পরিবর্তনশীল, সেখানে আশ্রয় পূর্বতন সত্যের তথ্যে থাকে না। আমরা তাই এক নূতন বিপ্লব সাহিত্যে প্রতিফলিত হতে দেখছি। নিজেকে স্বপ্রতিষ্ঠিত রেখে যুক্তি ও বুদ্ধির আলোতে পূর্বতন সত্যের নূতন তথ্য অন্বেষণ।

তাই এই সন্দেহবাদ ও সন্ধান আমাদের যুগলক্ষণ। যা আমাদের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, নির্বিচারে তা যেন আমরা গ্রহণ না করে যাই। প্রশ্ন ও পরীক্ষার মধ্যে নূতন আশার উপকূল দেখা দিয়েছে। আমাদের অনুসন্ধান নূতন সত্যের জন্ম দিক। অমৃত যদি বিষ হয়েই ওঠে—নীলকণ্ঠের মতো সে বিষ পান করার সাহস আমাদের যেন থাকে। আগত বা অনাগত যুগের সাহিত্যিকদের কাছে আমার এই অনুরোধ, যেন আমাদের সাহস থাকে ॥

পাঁচ বছরের উপন্যাস : আঙ্গিক

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

গত পাঁচ বছরের বাংলা উপন্যাসে রোমাঞ্চকর কিছুই পাওয়া যাবে না—তা সে ভাববস্তুর দিক থেকেই হোক, আর বহিরঙ্গের বিচারেই হোক। এ কথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে বাংলা সাহিত্যের এই পঞ্চবার্ষিকী মৃত্তিকায় উপাদেয় কোনো ফসল ফলেনি। আসলে এই পাঁচ বছর বাংলা উপন্যাসের ক্রমবিকাশে একটি অনুচ্ছেদমাত্র, অধ্যায় নয়। এই সময়টাকে বিবর্তনের একটি পর্যায়রূপে সংজ্ঞা দেওয়া যায়, কিন্তু কোনো বৈপ্লবিক পরিবর্তন যে এই কালের মধ্যে চিহ্নিত হয়নি—এটা নিঃসংশয় সত্য।

তবু এই আলোচনায় কালবিভাগের কিছু সার্থকতা আছে। অনির্দেশের ভেতরে প্রসঙ্গ বিন্যাস করলে শেষ পর্যন্ত দিশাহারা হয়ে যেতে চায়—বৃত্ত সম্পূর্ণ করে তার ওপর গতিপাত করা সম্ভব হয়ে ওঠে। অতএব এই গণ্ডি-রেখা আলোচনায় অন্তত স্পষ্ট একটা রূপরেখা পাওয়া যাবে এবং বক্তব্যকেও একটা ঋজু রেখায় উপস্থিত করা সম্ভব হবে।

এই পাঁচবছরকে অনুচ্ছেদ বলছি বটে, কিন্তু গভীর ক্ষোভের সঙ্গে মনে হচ্ছে—এ সময়ে বাংলা উপন্যাসে সত্যিই একটা বৈপ্লবিক পদক্ষেপের সম্ভাবনা ছিল। আমরা সবাই জানি আমাদের আজকের আলোচনা উত্তর-স্বাধীনতা সাহিত্যের হিসাব-নিকাশ। প্রায় ষাট বছরের বহু হিংস ও অহিংস আন্দোলন, বহু কারাবরণ এবং আত্মদান শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার যে

স্বর্গলোকে আমাদের পৌঁছে দিয়েছে—সেখানে এসে বাঙালি লেখকের কলম আর কল্পনা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হবে—এ আশা অসংগত ছিল না। কিন্তু আশ্চর্য এই, অতীতে যে আবেগ এবং উত্তাপ বাঙালি লেখকের কলমকে খরশান করে রাখত, এই পাঁচ বছরে তা স্তিমিত হয়ে এসেছে, একটা ক্লান্ত নির্বেদ এসে অধিকাংশকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এমন কি উদ্বাস্তু সমস্যার মতো সুকঠিন জিজ্ঞাসাও লেখকের স্বভাব-সংবেদনাকে যথোচিত চঞ্চল করে তোলেনি—সামান্য যা কিছু লেখা হয়েছে তা হয় দুঃখবর্ণনার বহুচর্বিত ন্যাচারালিজম, নয়তো অভিজ্ঞতাহীন হৃদয়হীন এক ধরনের রূপকথা। এর পেছনে প্রচ্ছন্ন রয়েছে পরাজয়ের সকরুণ বেদনা। সাহিত্যে সাম্যবাদী সিদ্ধান্তে যাঁরা বিশ্বাসী এবং যাঁদের কাছে এই স্বাধীনতার মূল্য নগণ্য, তাঁরাও নানা কারণে বিকেন্দ্রিত এবং দ্বিধাগ্রস্ত। ফল সুখের হয় নি, বলাই বাহুল্য।

অথচ সংগঠনের আদর্শে উদ্দীপ্ত, জীবন-বিশ্বাসে প্রাণিত এবং গণ-নেতৃত্বে নির্ভরশীল অনেক মহৎ সাহিত্য এ সময়ে গঠিত হতে পারত; আরো ঐশ্বর্যবান হত প্রেম—প্রীতি আরো ব্যাপ্তি লাভ করত। কিন্তু তা হয়নি।

কথাবস্তু যেখানে নিরুদ্যম, সেখানে আঙ্গিক দুটি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। হয় সে অন্তরের বেদনায় মৌন-ম্লান হয়ে পড়ে থাকবে, নতুবা এই গ্লানিকে আড়াল করবার জন্যে সে প্রাণপণে আত্মঘোষণা করতে চাইবে। তার দ্বৈত রূপের এই দ্বিতীয়টি হল একান্ত আঙ্গিক-সর্বস্বতা—formalism। অনুরূপ কারণে পৃথিবীর সাহিত্যে এ বস্তুর অভাব নেই—হালের মার্কিনী সাহিত্যের কিছু কিছু নজীর নিলেই হবে। ড্রেইসার-সিন্‌ক্লেয়ার লুইসের সাহিত্য আজ যে নিছক আঙ্গিকপ্রাণ হয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে, সেটা একটা মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি!

আঙ্গিকের উজ্জ্বলতা না থাকলে সাহিত্য নিশ্চয়ই বর্ণহীন। পরিবেশ এবং পরিবেশন আনুকূল্য না করলে সুখাদ্যও অখাদ্য হয়ে ওঠে। তা ছাড়া

দেশকালের সঙ্গে মননের যে অগ্রগতি, বহিরঙ্গও তার সঙ্গে সম পদক্ষেপে অগ্রসর হতে বাধ্য। আঙ্গিকের মাধ্যমে লেখকের ব্যক্তিস্বরূপ আভাসিত হয়, তাঁর বিশিষ্টতার স্বাক্ষর মেলে। সেহেতু আঙ্গিক এবং অনুভূতির যুক্তবেণী রচিত হলেই শিল্প সার্থক, সাহিত্য উত্তীর্ণ। একটি অপরটির অনুপূরক—কেউ কাউকে ছাপিয়ে উঠলেই সাহিত্যের ভারসাম্য নষ্ট হয়।

বাংলা সাহিত্যের সীমাবদ্ধতার কথা মনে রেখেও বলা যায়, মোটের ওপর আমাদের ফর্ম আর কন্‌টেন্টে এখনো বিচ্ছেদ হয়নি—বস্তুর দীনতাকে এখনো উক্তি দিয়ে ভরাট করতে হয় না। আমাদের উপন্যাসে একটা যতির পালা চলছে বটে, কিন্তু সেটা বিরামযতি নয়। একান্তভাবে আঙ্গিকবাদী বাংলা উপন্যাস দু একখানা হয়তো আছে, কিন্তু সাংপ্রতিক সাহিত্যের সাধারণ লক্ষণের মধ্যে তারা পড়ে না। তা থেকে প্রমাণ হয়—বাংলা সাহিত্যের সাময়িক স্থিতি নতুন গতি সংগ্রহের জন্যেই বিশ্রামের মধ্যসম। তাই তার আঙ্গিক এখন পর্যন্ত তার দীপায়ন—আবরণ নয়।

উত্তর-স্বাধীনতা বাংলা উপন্যাসে আঙ্গিক ও মানসিকতার সর্বপ্রাথমিক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বোধ হয় পাওয়া যাবে সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে'। মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষে এক ধর্মসংঘ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন—সে হল রামরাজ্য; প্রতিটি মানুষের মধ্যেই রামশক্তির বোধন করতে চেয়েছিলেন তিনি। সেই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে—আগস্ট-আন্দোলনের ভিত্তিতে লেখক এই উপন্যাস রচনা করেছেন। নায়ক ঢোঁড়াই তাৎমাটুলীর একজন সাধারণ মানুষ—তার সুখ-দুঃখ, আশা-কল্পনা, আন্দোলনের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং পরিণাম—একটা অপূর্ব রীতির মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে। এ রীতির ভিত্তি হল সন্ত্ তুলসীদাসের 'রাম-চরিত মানস'। রামায়ণ-মহাভারতের যে আঙ্গিক ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের রক্তার্জিত সংস্কার, নতুন কালের সমস্যাগুলিকে লেখক তারই মধ্যে স্থাপিত করতে চেয়েছেন। কিন্তু কয়েকটি কারণে এই পরীক্ষা সম্পূর্ণ হতে পারেনি। প্রতি পাতায় পাতায় আঞ্চলিক

শব্দের টীকা-ভাষ্য কিছুক্ষণ পরেই বিকর্ষণে পরিণত হয়। এই রীতির জন্যে যে আত্মলোপী সরলতার দরকার, লেখকের আধুনিক মন এবং সমকালিক সমস্যা তার মধ্যে ব্যঙ্গ আর বৈদগ্ধ্যের তির্যকতা এনে দিয়েছে। আর এই স্ব-বিরোধের জন্যেই এর মন্দ-মন্থর গতি রসসম্ভোগের পথে বিঘ্ন ঘটায়। তবু এর নতুনত্ব অনস্বীকার্য—গান্ধীবাদের মনোভঙ্গি-প্রকাশে এ উপন্যাস অভিনব।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একটা বিশিষ্ট রীতিতে প্রচুর সাফল্য লাভ করেছিলেন তাঁর "হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়।" এর বক্তব্য যাই-ই হোক, বাণীভঙ্গির বিচারে এই বই বাংলা সাহিত্যে স্মরণীয়। এ উপন্যাসে লেখক নিজে অনুপস্থিত থেকে রাঢ়ের কুসংস্কারগ্রস্ত বন্য কাহারদের একেবারে সম্পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। এই নৈর্ব্যক্তিকতা একটা দুর্লভ গুণ—এবং তারাশঙ্কর এই গুণকে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর আধুনিক 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'তেও এরই অনুসৃতি। কিন্তু 'নাগিনী কন্যায়' যে অতীত-বিলাস এবং রোমান্সের গাঢ়-আমেজ—তাতে এই নৈর্ব্যক্তিক মনন ব্যাহত হয়েছে—লেখকের ব্যক্তিত্ব নিজেকে যেন সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করতে পারেনি।

তবু, যাঁরা দেশের গণ-মন নিয়ে সাহিত্য রচনা করবেন 'হাঁসুলী বাঁকের' আঙ্গিক নানা দিক থেকে তাঁদের লক্ষ্যনীয়। মধ্যবিত্তের বুদ্ধি ও সহানুভূতির সাহায্যে বাঙালী লেখক কৃষক-শ্রমিকের জীবন-সমস্যাকে স্পর্শ করতে পারেন, কিন্তু সেই সঙ্গে উপযুক্ত বাণী-সংযোগ না ঘটলে তার আবেদন সীমিত হবেই। টল্‌স্টয়-সম্বন্ধে গল্প আছে, কৃষকদের নিয়ে যা কিছু তিনি লিখতেন আগে তাদের তা শুনিয়ে পরে তাদের চিন্তা এবং ভাবাপদ্ধতি অনুসারে তার পরিবর্তন করে নিতেন। একালের লেখকের পক্ষে এতটা সম্ভব না হলেও শিক্ষাটা সাধ্যমতো গ্রহণীয়। বস্তযোগ্য এই আঙ্গিকের ব্যবহারে ইদানিং অল্প-বিস্তর সাফল্য লাভ করছেন 'চরকাশেমে'র অমরেন্দ্র ঘোষ, 'লখীন্দর দিগারের' তরুণ

লেখক গুণময় মান্না। সুন্দরবনের আরণ্যক পটভূমিতে এই রীতিতে অন্তরঙ্গ মনোজ বসুর 'জলজঙ্গল'ও স্মরণীয়।

আঙ্গিকের নৈর্ব্যক্তিকতায় আরো একজন লেখক কৃতিত্ব দাবি করবেন—তিনি 'কুরপালা'র স্রষ্টা রমেশচন্দ্র সেন। তাঁর অধুনাতন 'গৌরীগ্রাম' পূর্ববাংলার মধ্য ও নিম্নবিত্ত মানুষকে অনাড়ম্বর আন্তরিকতায় স্বয়ং-প্রকট করে তুলেছে। এই কৃতিত্ব প্রায় তারাশঙ্করের সমপর্যায়ের। তারাশঙ্করের মধ্যে যদি বা কখনো কখনো সজ্ঞান প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়—রমেশচন্দ্র সেন আপনিই উদ্ভাসিত। এই প্রসঙ্গে স্বভাবতই অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'একটি গ্রাম্য প্রেমের কাহিনী'কে মনে পড়বে। কিন্তু গ্রাম্য-মানুষের মনোরম উদ্ঘাটন সত্ত্বেও লেখক অচিন্ত্যকুমার এখানে সব সময়ে উপস্থিত—স্থানিক-পরিভাষার সূক্ষ্ম যবনিকার নেপথ্যে তাঁর নাগরিক উপস্থিতি।

এই নাগরিক কথাটার প্রয়োজন আছে। ইতিপূর্বে যে সমস্ত আঙ্গিকের কথা বলা গেল, মর্মবস্তুর দিক থেকে তা পল্লীবাংলাকেন্দ্রিত। আমার মনে হয়, স্থূলভাবে বাংলা উপন্যাসকে গ্রামিক ও নাগরিক—এই দুটি আঙ্গিক রীতিতে বিভক্ত করা যায়। কলকাতার প্রাণ-প্রবাহের যে দ্রুতগতি, তার খরস্রোতের আবর্ত, তার খণ্ড-ছিন্নতার যে ক্ষণ-দীপ্তি, 'ঢোঁড়াই চরিত' কিংবা 'হাঁসুলী বাঁকে'র মন্দাক্রান্তায় তাকে ধরা যাবে না। অতএব নাগরিক মানস অনুযায়ী নাগরিক আঙ্গিকও বাংলা সাহিত্যে গড়ে উঠেছে।

এই পর্যায়ে পড়েন একদিকে যেমন নাতি-আধুনিক অন্নদাশঙ্কর-বুদ্ধদেব-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, তেমনি সাংপ্রতিক নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সন্তোষকুমার ঘোষ, সুনীল জানা, সমরেশ বসু। অন্নদাশঙ্করের বুদ্ধিমার্জিত 'না' একটা বিদগ্ধ জনের আসরকে স্মরণ করিয়ে দেয়; তার কাটা ছাঁটা সংযত রীতি একটা পরিশীলিত পরিবেশ রচনা করে। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সোনার চেয়ে দামী' 'সর্বজনীন' কিংবা 'পাশাপাশি'তে মধ্য ও নিম্নবিত্তের যে জীবন-চিত্র আঁকতে চেয়েছেন, সেখানে সমস্যা এবং প্রয়োজন এত প্রবল যে কোনো আবেগ বা

উচ্ছ্বাস তাঁর রচনা থেকে নির্বাসিত ; তাঁর আঙ্গিক বৈধব্যের শূন্যতায় প্রায় স্বভাবোক্তি অলংকারের পর্যায়ে পৌঁছেছে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের 'দেহমন' এবং 'দূরভাষিণী'ও এই মধ্যবিত্ত মনেরই রসায়ন—ঘরোয়া এবং আন্তরিক ; কিন্তু রোম্যান্টিক্ মনের একটি সুকুমার প্রলেপে তাঁর আঙ্গিকে আকর্ষণীয় স্নিগ্ধতা সঞ্চারিত হয়েছে। সুশীল জানার 'মহানগর' নাগরিক ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত এবং বেগবান্—তাঁর সংগ্রামী দৃষ্টিভঙ্গি রচনায় প্রত্যয়শীল দৃঢ়তা এনে দিয়েছে। সন্তোষ ঘোষের 'কিনু গোয়ালার গলি' এই নাগরিকতার আর-এক দিক। ধারালো ব্যঙ্গের সঙ্গে সুমার্জিত শব্দ প্রয়োগ, বাণী-রীতিতে বাণ-ফলকের ধার—তাঁকে স্পষ্টোচ্চারিত নাগরিক করে তুলেছে। সমরেশ বসু এদিক থেকে ভিন্ন পাড়ার বাসিন্দা। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'উত্তরঙ্গের' শেষ পর্যায়ে এবং পরবর্তী 'বি টি রোডের ধারে'তে তিনি যে শ্রমিক ও নিম্নবিত্তকে আশ্রয় করেছেন, তাদের ক্লিষ্ট দীনতার সঙ্গে তাঁর আঙ্গিকেরও সহধর্মিতা রয়েছে। তাঁর স্বাভাবিক সারল্য কখনো অতি স্থূল, কখনো অতিব্যক্ত। সমরেশ বসুর রচনারীতির আর-একটি বৈশিষ্ট্য এই—দেহাতী থেকে যে লোকটি শ্রমিকে রূপান্তরিত হয়, তার চেতনার নেপথ্যমঞ্চে কিছু গ্রাম্যতার সঞ্চার থাকেই ; তাই তাঁর রীতির মধ্যে 'হাঁসুলী বাঁকে'র আমেজ আছে ; কিন্তু 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' যেখানে শেষ হয়, সেখান থেকেই তাঁর উত্তরঙ্গ কল্পনা বি-টি রোডের ধারে এসে আছড়ে পড়ে। রচনাভঙ্গির বিচারে সমরেশ তারাশঙ্করের পরের অধ্যায়।

রোম্যান্টিক্ লেখক বুদ্ধদেব তাঁর 'তিথিডোরে' একটা নতুন তটে উত্তীর্ণ হয়েছেন। উপন্যাসে তিনি আনতে চেয়েছেন গীতি-কবিতার ঝংকার—একটা কোমল ছায়ামগ্নতা ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর 'তিথিডোরে'—তাঁর শেষতম 'মৌলিনাথে'। 'তিথিডোরের' 'যবনিকা কম্পমান' অধ্যায়ের সমাপ্তিতে স্বাতী ও সত্যেনের বাসর—অসমাপ্ত কথা, দূরলগ্ন ধ্বনি আর টুকরো টুকরো অনুভূতির রঙের ছিটেয় একটা চমৎকার ভাবমণ্ডল রচনা করে। নিতান্ত

সাধারণ এই প্রেমের উপন্যাসটি আঙ্গিকের গুণেই রোমান্স্-রসিকের কাছে অত্যন্ত উপাদেয় মনে হবে। বলা দরকার, আধুনিক কালে বুদ্ধদেব তাঁর এই পথের প্রায় একক যাত্রী। কিছুটা সহযাত্রিনী হয়েছেন 'মনের ময়ূরে'র প্রতিভা বসু।

মধ্যবিত্ত বাঙালির অন্তঃপুরের কথা অন্তরের ভাষায় বলতে পেরেছেন আশাপূর্ণা দেবী—তাঁর 'বলয়গ্রাস' উপন্যাসে। এ কৃতিত্ব ঈর্ষ্যা করার মতো। বাণী রায়ের 'প্রেম' উচ্চবিত্ত অভিজাত-সমাজের উদ্ঘাটনে একটা নিষ্ঠুর তীক্ষ্নতা পেয়েছে। রোম্যান্টিক্ সৌন্দর্যে দীপিত, অথচ বুদ্ধিবাদ এবং রাজনৈতিক বিশ্বাসে আত্মস্থ গোপাল হালদারের 'অন্য দিন,' 'আর একদিন' একটা গম্ভীর-মধুর বাণীভঙ্গিকে আশ্রয় করেছে। এ রীতি একাধারে আধুনিক এবং ক্লাসিক।

আঙ্গিকে বৈচিত্র্যের স্বাদ যাঁরা এনেছেন, তাঁদের মধ্যে আরো দুজনের উল্লেখ প্রয়োজন। তাঁরা যথাক্রমে বনফুল এবং নবেন্দু ঘোষ।

বনফুলের 'ডানা' বিষয়বস্তুতে যেমন অভিনব, আঙ্গিকেও তেমনি। পক্ষী-জীবনকে আশ্রয় করে গদ্যে-পদ্যে চম্পূ রচনার এ এক বিচিত্র প্রয়াস। এ রীতিকে পরীক্ষামূলক বা experimental বলাই সংগত। তাঁর 'স্থাবর' আদিযুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানবসত্তার ক্রম-বিবর্তনের কাহিনী,—একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে সাহিত্যান্বিত করার সাধনা। 'ডানা' যেমন কবিতার মতো শূন্যচারী—'স্থাবর' তেমনি প্রবন্ধের মতোই তত্ত্বমন্থর। বুদ্ধদেবের মতো বনফুলও তাঁর নিজস্ব আঙ্গিকে অনন্য।

নবেন্দু ঘোষের 'আজব নগরের কাহিনী' এবং 'দ্বীপ' বাংলা সাহিত্যে সাংকেতিক উপন্যাসের প্রথম প্রয়াস। প্রথম বইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বর্গের মানুষকে মর্ত্যের দুঃখ-বেদনা-মনুষ্যত্বে দীক্ষাদানই এর প্রতিপাদ্য। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি হিউম্যানিটারিয়ান, সমস্যা সমকালীন এবং প্রেরণা স্পষ্টত আনাতোল্ ফ্রাঁসের। 'আজব নগর' পড়তে গিয়ে বারে বারেই 'পেঙ্গুয়িন

আয়র্ল্যাণ্ড্'কে মনে পড়বে। কিন্তু প্রথম প্রচেষ্টা বলেই হয়তো অতি-বিবৃতি এবং details-এর প্রতি আসক্তিতে উপন্যাসের সাংকেতিকতাকে বারে বারে আঘাত করেছে। অত্যন্ত সুরচিত 'দ্বীপ' উপন্যাসেও হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গার নগ্নতা আরো একটু আবৃত হলেই আঙ্গিকের সার্থকতা বজায় থাকত।

গত পাঁচ বছরের বাংলা উপন্যাসের মোটামুটি একটা আঙ্গিকগত তালিকা দেওয়া গেল। এ তালিকা সম্পূর্ণ নয়, আলোচনা সংক্ষিপ্ত এবং বিশ্লেষণ প্রায় অনুপস্থিত। আমার নির্দিষ্ট সময়ের সংক্ষিপ্ত গণ্ডির মধ্যে তা সম্ভবও নয়। অতএব এ শুধু বিস্তৃত আলোচনার মুখবন্ধ মাত্র।

তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে. গত পাঁচ বছরে বাংলা উপন্যাস ফর্ম এবং কনটেণ্টে বৈপ্লবিক কিছু করতে না পারলেও একটা ধারাকে অন্ততঃ রক্ষা করে এসেছে। আপাতত যাকে নিষ্ক্রিয়প্রায় মনে হচ্ছে, তা শক্তি সঞ্চয়েরই একটা পূর্বাধ্যায় মাত্র। বিদেশী উপন্যাসে আঙ্গিকের যে লোভনীয় বৈচিত্র্য আমরা পাই, বাংলা উপন্যাসের বস্তু-স্বরূপকে উপেক্ষা করে তার জন্যে দাবি জানাতে গেলে অহেতুকভাবে formalismকেই টেনে আনা হবে। সার্ত্-এর The Reprieve বই-খানাকে স্মরণ করা যায়। একালে টেকনিকের চরম পরীক্ষা বোধ হয় এই উপন্যাসেই হয়েছে ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পূর্বক্ষণের ঘড়ির কাঁটার মতো চলছে এর কাহিনী : একটি বাক্যের মধ্য দিয়েই পাত্র এবং স্থান পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে : সুদেতেন-মরোক্কো-বের্লিন-প্যারী। এ রীতি যেন তৎকালিক ইয়োরোপ—প্রধানত ফ্রান্সের কম্পমান স্নায়ু—হতাশা আর আশঙ্কায় সহস্রদীর্ণ। আবার The Reprieve এবং Iron in the Soul এর মতো একই পটভূমিতে এরেনবুর্গের Fall of Paris ফরাসী মানসের বিশ্বাসী পরিচয়। সার্ত্-এর স্নায়বিক চঞ্চলতার বিপরীত এরেনবুর্গ কঠিন এবং প্রত্যয়শীল—তাঁর আঙ্গিকে ইস্পাতী কঠিনতা।

বাংলা উপন্যাসে জোর করে সার্ত্‌কে আনা যাবে না—এরেনবুর্গকেও না। জীবনের অকপট উপলব্ধির ওপরেই কথাবস্তুর ভিত্তি গড়ে উঠবে, তাকে বিশিষ্টতায় রেখায়িত করবে তার আঙ্গিক। বাংলা উপন্যাসে এই উপলব্ধি আসছে নানাদিক থেকে—জিজ্ঞাসায়, সংগ্রামে, গণবোধে। ভবিষ্যতের মহৎ উপন্যাসগুলিও অন্তরঙ্গের মতো তার বহিরঙ্গকে গড়ে নেবে—গ্রেট ফর্ম তৈরী হবে গ্রেট কন্‌টেন্টের সহযোগে॥

পূর্ববাংলার কথাসাহিত্য

কাজী মোতাহার হোসেন

পূর্ববাংলার কথাসাহিত্য সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলবার ভার পড়েছে ঘটনাচক্রে আমার উপর। এ-কে একটা বড়ো রকমের প্রকৃতির পরিহাস বলেই মনে করতে হবে। তার কারণ, একখানা মাসিকপত্র বা ম্যাগাজিন হাতে পড়লে আমি সচরাচর প্রবন্ধগুলোই পড়ি; বিশেষ কারণ না ঘটলে কবিতা বা গল্পের দিকে মন দিই না। বিশেষ কারণের মধ্যে প্রধান হচ্ছে বন্ধুবান্ধবের অনুরোধ আর সুপারিশ।

ছেলেবেলা থেকেই 'সদা সত্য কথা কহিবে' গুরুজনের এই উপদেশটা মনের মধ্যে এমন গুরুতরভাবে শিকড় গেড়ে বসেছিল যে মিছিমিছি গল্প বানিয়ে বলাকে রীতিমতো কুবাক্য আর কুকার্য বলেই মনে করতাম। অনেক পরে অবশ্য বুঝতে পেরেছি, সব মিথ্যা কথাই মিছে নয়, আর কোনো সত্য কথাই একেবারে সত্যি নয়। এ পরিবর্তন হয়তো বিশেষভাবে রবীন্দ্র-প্রভাবেই হয়েছে।

যাই হোক, মানুষেরও যে সৃষ্টির অধিকার আছে, একথা এখন বিনা দ্বিধায় স্বীকার করি। মানুষের এ সৃষ্টি কতকটা খোদার উপর খোদকারী বটে। অর্থাৎ মানুষ যা হতে চায় কিন্তু হতে পারে না, বা করতে চায় অথচ বাধা পায়, সেই ইচ্ছার ছাপ পড়ে সাহিত্যে। বিশেষ করে কথাসাহিত্য মানুষের অপুর্ণ ইচ্ছা বা অপুরণীয় আদর্শের ছাপ স্বচ্ছন্দে বহন করে বলেই তা এত

আকর্ষণীয় হয়। কিন্তু খোদার নিয়মকানুনগুলো এমন অনড় যে তার উপর খোদকারী করতে হলে খোদার সৃষ্টিটা আগে ভালো করে মনের মধ্যে পরিপাক খাইয়ে নিতে হবে; তারপর তার থেকেই উপাদান নিয়ে পরস্পর সংগতি রেখে সেগুলো মনোরম করে সাজাতে হবে। যার-তার দ্বারা একাজ সম্ভব নয়—তবে যে-সে-ই এ কাজে হাত দেয়। কেউ বা সদা সত্য কথা বলতে গিয়ে এক নৈরাশ্যজনক ব্যর্থ সৃষ্টি করে বসে, যার মধ্যে খোদার সৃষ্টির রস-বোধটারই অভাব। আবার কেউবা খোদকারী করতে গিয়ে এমন গাঁজাখুরী গল্প বানায়, যা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য, আর চটকদার বলেই বেশী করে উদ্ভট! সত্য কথা বলতে গেলে, 'আদিখ্যেতা' নেই এমন সার্থক গল্প বা উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে দুর্লভ। তবে সব দিক দিয়ে বিচার করলে মাঝারীর চেয়ে উঁচু দরের জিনিস—যা সর্বসাধারণের পাতে দেওয়া চলে—তার অভাবও নেই। যাক, আমার মতো গল্প-বেরসিকের পক্ষে সুকুমার আর্টের সূক্ষ্ম বিচার শোভা পায় না। তাই পূর্ববাংলার কথাসাহিত্য সম্বন্ধে দুয়েকটা স্থূল কথা বলেই ক্ষান্ত হব।

কথা-সাহিত্য বলতে সচরাচর কথিকা, ছোটগল্প, বড় গল্প, উপন্যাস আর নাটকই বোঝায়। কথা ও কাহিনী পদ্যে লিখলেও তাকে কথা-সাহিত্যের মধ্যে ধরা যেতে পারে। এই হিসেবে পল্লীগাথা বা পালাগানও বোধ হয় কথা-সাহিত্য। কিন্তু ইতিহাস, ভ্রমণবৃত্তান্ত আত্মচরিত প্রভৃতি এত দূরের কুটুম্ব যে ওগুলোকে ধর্তব্যের মধ্যে না আনলেও ক্ষতি নেই।

কথা-সাহিত্য-জাতীয় বই বের করেছেন অল্প কয়েকজন মাত্র। তবে মাসিক পত্রিকা বা বিশেষ সংখ্যার দৈনিক পত্রিকাগুলো ঘাঁটলে অনেক চলন-সই গল্প চোখে পড়ে। সকলের সব বইএর সঙ্গে পরিচিত হওয়া বোধ হয় "পাঁড় গল্প-খোরের" পক্ষেও সুকঠিন, আমার পক্ষে ত একেবারেই অসম্ভব। ভাগ্যিস, কিছুদিন এক পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম, সেই সূত্রে

কয়েকখানা বই "সমালোচনার জন্য" বিনামূল্যে পেয়েছিলাম, এখনও মাঝে মাঝে পাই। ভদ্রতার খাতিরে আর কর্তব্যের খাতিরে সেগুলো আগাগোড়া পড়তেই হয়। এর বাইরেও বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে দুই এক-খানা বই নিয়ে সময় সময় পড়বার সুযোগ হয়। তা ছাড়া পাঠ্য বইএর বাইরে অপাঠ্য বই নিজের পয়সায় কিনে পড়া যে প্রায়ই ঘটে উঠে না, এ-কথা খাঁটি বাঙালী মাত্রেই স্বীকার করেন। এ-ব্যাপারে আমি অবশ্যই খাঁটি বাঙালীত্বের জোর দাবী করতে পারি! যা হোক যে দুই একজন ভদ্রলোক তাঁদের বই পড়বার সুযোগ দিয়েছেন, তাঁদের বই সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখ না করলে অভদ্রতা হবে। কিন্তু যাঁরা তা করেন নি, অর্থাৎ যাঁদের সমূহ রচনা আমার হস্তগত হয়নি, তাঁদের বই সম্বন্ধে দুয়েক কথা বলতে না পারায় তাঁরা কিন্তু আমাকে দুষতে পারবেন না।

উপন্যাস আর বড় গল্পকে এক পর্যায়ে ফেলাই সুবিধা—কারণ, তাতে বন্ধুবিচ্ছেদের ভয় একটু কমে। পাকিস্তান হওয়ার পরে প্রকাশিত কথা-সাহিত্যের মোটামুটি তালিকা এই:

উপন্যাস বা বড় গল্প: (১) সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ—লাল শালু; (২) হামেদ আহমদ—অপূরণীয়; (৩) আশরাফুজ্জামান—(ক) মনজিল, (খ) আকাশ পর্বত, নদী ও সমুদ্র; (৪) আকবর উদ্দীন—(ক) অবাঞ্ছিত, (খ) কি পাইনি; (৫) মাহবুবউল আলম—মফিজন; (৬) কাজী আফসার উদ্দীন —চরভাঙ্গা চর; (৭) এস, এ, হাশেম খাঁ—আলোর পরশ।

গল্প: (১) শাহেদ আলী—জিবরাইলের ডানা; (২) আহমদ ফজলুর রহমান—এক টুকরো জমি; (৩) আলাউদ্দীন আল আজাদ—(ক) জেগে আছি, (খ) ধান কন্যা; (৪) শওকত ওসমান—জুনু আপা ও অন্যান্য গল্প; (৫) হামেদ আহমদ—(ক) মানুষ ও পৃথিবী, (খ) তিল ও তাল; (৬) সর্দার জয়েন উদ্দীন—নয়ানঢুলি; (৭) আবুলকালাম শামসুদ্দীন (২য়) পথ জানা নাই; (৮) অবনী নন্দী—বিভ্রান্ত বসন্ত; (৯) নূরুন্নাহার—বোবা

মাটি; (১০) নূরজাহান বেগম—সোনার কাঠি; (১১) মোহাম্মদ ইসহাক চাখারী—মায়ের কলঙ্ক।

এ ছাড়া আরো এই কয়েকজনের নাম উল্লেখ করবার মতো: মবীন উদ্দীন আহমদ; এরশাদ হোসেন; আব্দুল গাফ্‌ফার চৌধুরী; হাসান হাফিজুর রহমান; আঃ মুঃ মির্জা আবদুল হাই; অকিঞ্চন দাস; আতোয়ার রহমান; খলিলুর রহমান চৌধুরী; মিন্নত আলী; আজিজুল হক; কাজী ফজলুর রহমান; ইব্রাহীম খাঁ।

নাটক: (১) আজীম উদ্দীন—মহুয়া; (২) এম, আকবর উদ্দীন—নাদীর শাহ; (৩) শওকত ওসমান—(ক) আমলার মামলা, (খ) কাঁকর মণি, (গ) তস্কর ও লস্কর; (৪) আস্‌কার ইব্‌নে শাইখ (ওবায়েদ আসকার)—(ক) বিরোধ, (খ) পদক্ষেপ, (গ) বিদ্রোহী পদ্মা, (ঘ) দুরন্ত ঢেউ; (৫) আবু জাফর শামসুদ্দীন—শনিগ্রহ; (৬) ওবায়দুল হক—(ক) এই পার্কে, (খ) দিগ্বিজয়ী চোরাবাজার; (৭) মুফাখ্‌খারুল ইসলাম—মুর্শীদ; (৮) নুরুল মোমেন—নেমেসিস।

পালাগান: (১) রওশন ইজদানী—(ক) চিনুবিবি (খ) রঙিলা বন্ধু (২) মফিজউদ্দীন আহমদ—পাকিস্তানের নতুন জারী; (৩) জসীমউদ্দীন—বেদের মেয়ে (গীতিনাট্য)।

রসরচনা: (১) আবুল মনসুর আহামদ—সত্যমিথ্যা, (২) আসহাব উদ্দীন আহমদ—ধার, (৩) নূরুল মোমেন।

অবশ্য সকলেই স্বীকার করবেন এই বারোয়ারী লিষ্টের সবগুলো বই-ই সুসাহিত্য হবে, তার সম্ভাবনা খুবই কম। আর আমিও অনায়াসে স্বীকার করে নিতে পারি,—আপনারা মনে মনে প্রার্থনা করছেন, আমি যেন আবার এ সবের সমালোচনা জুড়ে না দিই। আরও একটি কথা এই যে, লিষ্টগুলো সময় অনুসারে বা গুণ-অনুসারে সাজানো হয়নি। গুণাগুণ বিচার করতে হলে কৌতূহলী পাঠক অবশ্য নিজের মুখেই ঝাল খেয়ে দেখবেন।

তবে পূর্ববাংলার কথা-সাহিত্য কী মনোভাবের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। সাহিত্যের দল স্বীকার না করলেও সাহিত্যিকদের প্রায়ই দল থাকে। অর্থাৎ সম-ভাবুকেরা কেমন করে যেন সুযোগ পেলেই এক সঙ্গে জুটে যান, এবং নিজেদের ধ্যানধারণার অনুরূপ সাহিত্য গড়ে তুলতে পরস্পরের সহায়ক বা অন্ততঃ পক্ষে উৎসাহদাতা হয়ে পড়েন। সাহিত্যকদের এই রকম জোট বা দল থাকা ভালই, কিন্তু দলাদলি থাকাটাই ক্ষতিকর। পূর্ব বাংলায় দেখতে পাই, দলও আছে, দলাদলিও আছে। বোধ হয় পশ্চিম বাংলায় বা পৃথিবীর অন্যত্রও এ-ব্যাপারটা অল্পবিস্তর আছেই। আমি তিনটে প্রধান দলের কথা জানি—পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ, তমদ্দুন মজলিশ আর রেনেসাঁস সোসাইটি। দলগুলোর নাম থেকেই এদের মনোভাবের খানিকটা পরিচয় হয়ত পাওয়া যাচ্ছে।

সাহিত্য সংসদের তরুণরা আমার মতো একজন বৃদ্ধকে সভাপতি করেছেন। এতে খানিকটা আশ্চর্য হবার কারণ আছে বৈ কি। কারণ অন্য দলের কাছ থেকে অনেকবার শুনেছি এই দলের ছেলেরা নাকি একদম গোল্লায় গেছে—প্রবীণদের পাত্তাই দিতে চায় না। আমার বিশ্বাস অধিকাংশ প্রবীণই নিজেদের পুরানো মূলধন ভাঙিয়ে বা চোখ রাঙিয়েই সাহিত্য দরবারে রাজত্ব চালাতে চান। তরুণদের নতুন আইডিয়া তাঁদের চোখে বেঁধে, তার মধ্যেও যে কোন সার পদার্থ থাকতে পারে, এ-ধারণাই তাঁদের হয় না।

জীবনের সবক্ষেত্রেই এই ত চিরন্তন ঘটনা। কোনোও দিকে অতি-প্রবণতা দেখা দিলেই আর সবদিক সহজে চোখে পড়তে চায় না। আমার প্রথম প্রথম মনে হত তরুণেরা বড্ড বেশী স্লোগানের পক্ষপাতী, তার মানে তাঁরা রুশো ভল্টেয়ার শোপেনহাওয়ার-মার্কস লেনিন প্রভৃতির মতামত কপচাতেই বেশী মজবুত, সেগুলো তলিয়ে বুঝবার প্রবৃত্তি তাঁদের

মোটেই নেই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখলাম এঁদের অন্ততঃ শতকরা ৩০ জন বেশ স্থিরবুদ্ধি এবং বাইরের জগতের সঙ্গে যেমন পরিচয়, ঘরের কাছের পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধেও তেমনি বেশ সচেতন। এঁরা সাহিত্য-ক্ষেত্রে রাজনীতি বা ধর্মের বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না। এই দলের কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে আলাউদ্দীন আল আজাদ, সর্দার জয়েন উদ্দীন আর হাসান হাফিজুর রহমানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাব্য, প্রবন্ধ প্রভৃতি অন্যান্য শাখায়ও অনেকেই আছেন। কোনো বিশেষ দলভুক্ত নন, অথচ এই তরুণ সাহিত্যিকগোষ্ঠীর সঙ্গে মনের মিল আছে বলে ধারণা জন্মে এমন কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে সৈয়দ ওয়ালী উল্লাহ, মুনীর চৌধুরী, আবুল মনসুর আহমদ, আসহাব উদ্দীন আহমদ এবং নুরুল মোমেন বেশ খ্যাতি লাভ করেছেন। অবশ্য, কোনো বিশেষ দলের সবগুলো লোকেরই যে ধারণা ঠিক একই রকম, তা হতেই পারে না। যাঁদের নাম করলাম, তাঁরাও হয়ত সাহিত্যসংসদের কোনো কোনো আদর্শের সঙ্গে একমত নন। এই সংসদের যদি কোনো অতি-মাত্রিক ঝোঁক থাকে, সে বোধহয় সাম্যবাদের আদর্শের দিকে—ইসলাম যার প্রবর্তক আর বর্তমান যুগে পার্থিব দিক দিয়ে কম্যুনিজম যার ধারক। এঁরা আসলে সুষ্ঠু জীবনের স্বাপ্নিক, তাই বাস্তবপন্থী। তমদ্দুন মজলিসেও অনেক উৎসাহী তরুণ সাহিত্যিক আছেন। এঁদের সংগঠন-কুশলতাই বেশী উল্লেখযোগ্য। মফঃস্বলেও অনেক জায়গায় এঁদের শাখা আছে। রাষ্ট্রভাষা, ইসলামের আদর্শ এবং ঐতিহ্য প্রভৃতি অনেক বিষয়ে এঁরা পুস্তিকা প্রণয়ন করেছেন। সামাজিক দিকের চেয়ে রাজনৈতিক দিকেই এঁদের দৃষ্টি বেশী পড়েছে। এঁদের মুখপত্র 'সাপ্তাহিক সৈনিকের' মতামতগুলো ভালই, কিন্তু আমার মনে হয় ভাষায় যেন সংযমের অভাব রয়েছে—কোনো বিষয়ে অতিমাত্রিক ঝোঁক হলে যা হয়ে থাকে। তমদ্দুন মজলিসের সাহিত্য শাখার আর একটি মুখপাত্র আছে, 'দ্যুতি'। 'দ্যুতিতে' উপরোক্ত রাজনৈতিক ঝোঁক তেমন প্রকট নয়। এঁদের

মধ্যে পালাগানে রওশন ইজদানী, নাটকে আসকার ইবনে শাইখ (ওবায়েদ আসকার) এবং গল্পে শাহেদ আলী ও নূরুন্নাহার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। আমার মনে হয় রাজনৈতিক পরিবেশ আর একটু স্থিরভাব ধারণ করলে, কিম্বা এঁরা রাজনীতিপ্রবণতা আর একটু কমিয়ে দিলে এঁদের দ্বারা অনেক উপাদেয় সৃষ্টি সম্ভব হবে।

পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের বাংলা নাম, আর তমদ্দুন মজলিসের আরবী নামের পাশে রেনেসাঁস সোসাইটির ইঙ্গ-ফরাসী নাম দেখে মনে হয়, এঁরা যেন সাধারণ বাঙালী বা সাধারণ মুসলমানদের থেকে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার জন্য বেশ খানিকটা ব্যগ্র। কিন্তু এঁদের সাহিত্য বা সমালোচনার যে ধারা দেখেছি, তাতে মনে হয়, এরা যেন তমদ্দুন মজলিসকে তমদ্দুন শিখাতে চান, আর পাকিস্তান সাহিত্য সংসদকে 'বি-পাক' অর্থাৎ বিশেষ ভাবে 'পাক' করতে চান। এই উক্তির হেতু এই যে এঁদের মুরুব্বীয়ানা কথায় ঝাঁঝ অনেক বেশী—যে ঝাঁঝে তমদ্দুনের 'তাহজীব' রক্ষাও হয় না আর পাকিস্তানের সাহিত্যিক আদর্শেরও মর্যাদা বোঝা যায় না। এঁদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাই যে ঐ এক ধরনের তা-ও বলা যায় না। এঁদের অনেকের মনেই দ্বিধা দ্বন্দ্ব এত বেশী যে ঠিক টাল সামলাতে পারছেন না। তবু সাধারণ ভাবে সবার মনেই যেন একটা ধারণা জন্মেছে যে বাংলা সাহিত্যে সুপ্রচুর আরবী ফার্সি শব্দ বসালেই বা খোর্মা খেজুর ফোরাত ফজলা, শিরী ফরহাদ আমদানী করলেই ইসলামী ভাবধারা পূর্ববাংলার লোকদের গলার ভিতর দিয়ে মর্মস্থলে পৌছবে। সম্ভবতঃ কবি ফররুখ আহমদ, সৈয়দ আলী আহসান, আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১ম) এবং তাঁর সহকর্মীরাও এই দলের অগ্রণী। ফররুখ আহমদ প্রতিভাবান কবি; তাঁর আগেকার লেখা 'সাত সাগরের মাঝি' বিখ্যাত কাব্য, তাঁর গীতিকবিতার হাতও মন্দ নয়। কিন্তু অতি-ঝোঁকে সাহিত্যের অপমৃত্যু হয়, একথাটা ভুলে গিয়ে তিনি হয়ত নিজের প্রতিভার প্রতি অবিচার করছেন।

এই তিনটি দল ছাড়া আরও ছোটখাট দল আছে। কেউ কেউ দ্বিদল, ত্রিদল বা সর্বদলীয়, আবার কেউ বা একদম অদলীয়ও আছেন। শেষ পর্যায়ে বোধ হয় আবুল কালাম শামসুদ্দীন (২য়), মাহবুবল আলম, মঃ আকবর উদ্দীন, ইব্রাহীম খাঁ, শওকত ওসমান, আবু জাফর শামসুদ্দীন প্রভৃতি আছেন। তা ছাড়া নাম উল্লেখ করতে গিয়ে কারো কারো দল বদল করে ফেলেছি কি না, সে সম্বন্ধেও সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হতে পারছি না বিশেষতঃ বহু-দলীয়দের ক্ষেত্রে এ সম্ভাবনা খুবই বেশী।

আর একটা কথা বলেই শেষ করব। কথাটি এই যে আমি কথাসাহিত্যে গুণাগুণ বিচার করবার পুরোপুরি অধিকারী নই। তবে যে চেষ্টা করলাম, তাতে আমার আন্তরিকতার অভাব না থাকলেও সব ক্ষেত্রে ন্যায় নিষ্ঠা বজায় রাখতে পেরেছি কি না বলতে পারিনে। কাজে কাজেই আপনারা একদানা নিমক দিয়ে বক্তব্যটা গ্রহণ করবেন।

কয়েকটি স্মরণীয় রচনা

জগদীশ ভট্টাচার্য

প্রথমেই স্মরণ করি সম্প্রতি লোকান্তরিত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কল্লোল-এর লেখকবৃন্দ যখন নতুন পরীক্ষা নিরীক্ষায় ব্যাপৃত, তখন দু'চোখে শিশুর বিস্ময় নিয়ে, সরল কৌতূহল নিয়ে, কথাসাহিত্যে জীবনের হারানো সৌন্দর্য-দৃষ্টিকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে বহুবিচিত্র সুখদুঃখ ও ঘাতপ্রতিঘাতের যোগাযোগ ঘটেছিল; তাঁর সাহিত্য-সাধনার মধ্যে সেই জীবনকে আমরা অনুভব করি। তাঁর সর্বশেষ দান 'দেবযান' বিশ্বাসীর দান অবিশ্বাসীর পৃথিবীতে। 'ইছামতী' তাঁর অসমাপ্ত সাধনা।

যে পাঁচ বছর-কে আমরা বোঝবার চেষ্টা করছি তার মধ্যে বহু ঘটনা ঘটছে যা আমাদের মনকে বারবার বিপর্যস্ত করে তুলেছে। আমাদের দেশে স্বায়ত্তশাসন এসেছে, সেইসঙ্গে এসেছে ভ্রাতৃবিরোধও। রাজনৈতিক সমুদ্র-মন্থনের হলাহলে সমগ্র জাতি আজ বিষগ্রস্ত। প্রতিবেশী চীন এগিয়ে চলেছে অপ্রতিহত গতিতে; কিন্তু আমাদের অবস্থা কী? ওদিকে আবার দেখতে পাচ্ছি তৃতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি।

এই কয়েক বছরের মধ্যে বহু প্রতিষ্ঠাবান্ কথাসাহিত্যিকের কণ্ঠ নীরব হয়ে গেছে; বহু নতুনের কণ্ঠস্বর শোনা গেছে; বহু পুরাতন কণ্ঠ আবার নতুন করে শোনা যাচ্ছে। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠ নীরব হয়েছে; প্রেমেন্দ্র

মিত্রের কণ্ঠ কদাচিৎ শোনা যায়। তেমনি রাজশেখর বসু আবার বহুদিন পর নতুন করে লিখতে শুরু করেছেন; 'গল্পকল্প', 'ধুস্তুরী মায়া' তাঁর অপূর্ব রচনা। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর আশ্চর্যসুন্দর রচনা 'মহাস্থবির জাতক' আত্মজীবনী-মূলক হলেও কথাসাহিত্যের পর্যায়েই এর স্থান। সাহিত্যক্ষেত্রে শশিশেখর বসুর আবির্ভাবও আমাদের বিস্মিত করেছে; একজন উঁচুদরের সাহিত্যিক এতদিন আত্মগোপন করে ছিলেন। রমেশচন্দ্র সেন অনেকদিন যাবৎ লিখছেন, কিন্তু তাঁর সাম্প্রতিক রচনা যেন নতুন করে দানা বেঁধেছে; তাঁর উপন্যাসে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর নূতনত্ব আমাদের আশান্বিত করেছে। কল্লোল-যুগের অমরেন্দ্র ঘোষ দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে আবার ফিরে এসেছেন নতুন শক্তি নিয়ে; 'চরকাশেম' প্রভৃতি রচনা তাঁর সার্থক সৃষ্টি। গত পাঁচ বছরে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। তাঁর বিখ্যাত এপিক উপন্যাসে ব্রিটিশশাসিত ভারতের জীবনকথা বর্ণিত হয়েছে, ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ছবি ফুটে উঠেছে। তাছাড়া তাঁর 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা' ও 'নাগিনী কন্যার কাহিনী'-র তো তুলনা নেই। কিন্তু আমার মতে তাঁর 'পদচিহ্ন' এইপর্বের সার্থকতম উপন্যাস; এর মধ্যে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক নতুন রূপ। বনফুল মানবসত্তার ক্রমবিকাশকে ধরেছেন 'স্থাবর' উপন্যাসে। তাঁর এই সৃষ্টি বাংলা উপন্যাস জগতে এক নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত লিখেছেন অত্যন্ত সাধারণ মানুষের কথা, বিশেষ করে অনুন্নত মুসলমান সম্প্রদায়ের কথা, তাদেরই নিজের ভাষায়। উপলব্ধি ও বর্ণনায় তারাশঙ্করকেও তিনি অতিক্রম করে গেছেন॥

ভাষণ : কথা-সাহিত্য

অন্নদাশঙ্কর রায়

আমার নিজেকে কথাসাহিত্যিক বলে স্বীকার করতে বাধা আছে। আমি যা কিছু লিখেছি তা ভিতর থেকে একটা নির্দেশ পাই বলে লিখেছি। যেটা আমি না বললে আর কেউ বলবে না বলে মনে করি সেইটেই বলি। আমার জীবনে যা ঘটেছে তা তো আর কেউ বলতে পারবে না। আমি ঠিক করেছি বানিয়ে লিখব না। উদ্ভাবন করব না। তা বলে দুনিয়ায় যত কিছু ঘটছে তার রিপোর্ট লেখা আমার কাজ নয়। যে ঘটনাটা আমাকে বিশেষভাবে দোলা দেয় সেইটের কথা লিখি। সেইজন্যে আমাকে ঔপন্যাসিকের পর্যায়ে ফেলাটা ঠিক হবে না।

আমাদের এই সাহিত্যমেলা শুধু পাঁচ বছরের সাহিত্যেরই হিসাবনিকাশ নয়। এর আরেকটা ইঙ্গিত রয়েছে। দেশ এখন দু'ভাগ হয়েছে। আগের অখণ্ড রূপ আর নেই। অনেক বক্তাই পূর্ব বাংলাকে এক রকম ভুলে গেছেন বলে মনে হল। অনেকে এমন ভাবে কথা বলেছেন যে শুনে মনে হয় বাংলা কথাটার মানে শুধু পশ্চিম বাংলা। আমরা একটা খণ্ড বেছে নিয়ে বলছি, এই হচ্ছে বাংলা দেশ, এই হচ্ছে বাংলা সাহিত্য। এ যেন অন্ধের হাতী দেখার মতো। আমরা পরস্পরকে দেখতে পাচ্ছিনে। ভুল বুঝছি। আমাদের মাঝখানের এই দুস্তর ব্যবধান কী করে দূর হবে। সে কথা চিন্তা করেই এ মেলার সৃষ্টি। একেবারে দূর না হোক, পরস্পরকে কিছুটা জানব,

কয়েক পা পায়ে পা মিলিয়ে চলব, এটা তো হওয়া চাই। নইলে পরে ছ'জনে এত দূরে চলে যাব যে মিলতে পারব না। এই মেলায় আমরা জানতে পারব পুব বাংলা কোন দিকে যাচ্ছে পশ্চিম বাংলা কোন দিকে যাচ্ছে, দুইয়ের মধ্যে মিল আছে কি না, বা মিল ঘটবে কি না। এই যে কাজী মোতাহার হোসেন সাহেব বললেন পূর্ববঙ্গের তিনটে সাহিত্যিক দলের কথা, এসব তো জানতুম না। আজকের সভায় একটা পটভূমিকা পাওয়া গেল।

কী পরিমাণে সাহিত্যিকরা অগ্রগামী বা পশ্চাদ্‌গামী সেটাও হিসাব করা দরকার। সাহিত্যিকদের কেউ কেউ অভিযোগ করেন যে তাঁরা একটা গোলকধাঁধার মধ্যে পড়ে আছেন। কথাটা সত্য। যদিও আমরা অবিরাম সাহিত্যসৃষ্টি করে যাচ্ছি তবু এই গোলকধাঁধার কথা কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। এই মেলায় আলাপ আলোচনা করে হয়তো একটা পথ পেয়ে যেতে পারি! হয়তো একটা দিক্‌নির্ণয় হয়ে যেতে পারে।

বাংলাদেশের জীবনে একটা বিরাট পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি। একটা পল্লীপ্রাণ জাতি হঠাৎ নগরপ্রাণ হয়ে উঠছে। ইউরোপেও এই ব্যাপার ঘটেছিল উনবিংশ শতকে। এখন একটামাত্র নগর প্রায় প্রদেশের সমান হয়ে দাঁড়াচ্ছে। পশ্চিম বঙ্গ বলতে কলকাতা বোঝাচ্ছে। পূর্ববঙ্গের অধিবাসী তাঁরাও নাগরিক হয়ে উঠতে চাইছেন। সে কথা শামসুর রহমান্ বললেন। গোটা বাংলাদেশ ও বাঙালী জাতি নাগরিক হয়ে যাচ্ছে। আমরা গ্রামের জন্যে মায়াকান্নাও কাঁদছি, কিন্তু হাজার বললেও আমরা কেউ গ্রামে ফিরে যাব না। ভালো হোক, মন্দ হোক এটা সত্য। সাহিত্যে তাই এটা প্রতিফলিত হচ্ছে। বছর পাঁচেকের মধ্যে এই পরিবর্তন বিপুল আকার নিয়েছে। আর একটা পরিবর্তন হল ইণ্ডাষ্ট্রিয়ালাইজেশন। আমাদের জনসাধারণও বড় বড় ইণ্ডাস্ট্রি চাইছে। তারাও আর গ্রাম্য হয়ে থাকতে নারাজ। সাহিত্যেও এর ছাপ পড়েছে।

কোনো বিখ্যাত সমালোচক একবার বলেছিলেন বাংলা ভাষায় অনেক ভালো গল্প উপন্যাস লেখা হয়েছে বটে, কিন্তু টলস্টয়ের "ওঅর য়্যাণ্ড পীস" এর মতো এপিক উপন্যাস লেখার উপকরণ তৈরি হয়নি। হীরেনবাবু বলছেন, আজ বাংলাভাষায় মহাভারত রচনার সময় এসেছে। টলস্টয়ের মতো কোনো প্রতিভা যদি জন্মান তিনি "ওঅর য়্যাণ্ড পীস" রচনার অনেক উপাদান পাবেন। আমি এটা স্বীকার করি। যেসব ঘটনা এর মধ্যে ঘটে গেছে সেসব এপিক উপন্যাস রচনার উপযোগী বটে। আমি নীরোর মতো হলে আনন্দে বেহালা বাজাতুম। বলতুম, দেশটাকে ভেঙেছ, দেশের লোকগুলোকে করেছ ইহুদী, উপন্যাস রচনার অনেক উপাদান দিয়েছ। এবার তা নিয়ে উপন্যাস লিখব। কিন্তু মানুষের দুঃখের বিনিময়ে আমি উপন্যাসের আনন্দ চাইনে। তার চেয়ে আমি চাই দেশ আনন্দে থাকুক। তবু নিয়তি মহাশিল্পীর জন্যে ঘটনার পর ঘটনা সরবরাহ করে চলেছে। এই দুর্যোগে এইটেই একমাত্র সান্ত্বনা যে মহাশিল্পের জন্যে উপাদান তৈরি হয়ে থাকছে। লেখকের সাধনা এর সঙ্গে যোগ দিলে মহাশিল্প সৃষ্ট হবে।

উপন্যাস ও ছোট গল্প এ দু'য়ের টেকনিক আলাদা। একই লেখকের হাতে দুটোই সমান ওতরায় না। রবীন্দ্রনাথ ব্যতিক্রম। গোরা ও গল্পগুচ্ছ দু-ই তাঁর হাত দিয়ে উতরেছে। বড় উপন্যাস হলেই ভালো উপন্যাস হয় না। বড় উপন্যাস ভালো হলে সত্তর বছর পরেও সেটা সমান আগ্রহের সঙ্গে পড়া হবে। ঐতিহাসিক বিচারে যে বই ভালো সাহিত্যিক বিচারে সে বই ক্লাসিক বলে গণ্য না-ও হতে পারে। গত পাঁচ বছরের কীর্তি আগামী পঞ্চাশ বছর স্থায়ী হবে কি না সে বিষয়ে কোনো পাকা রায় দেব না। শুধু দেখব কী কী সৃষ্টি হয়েছে॥
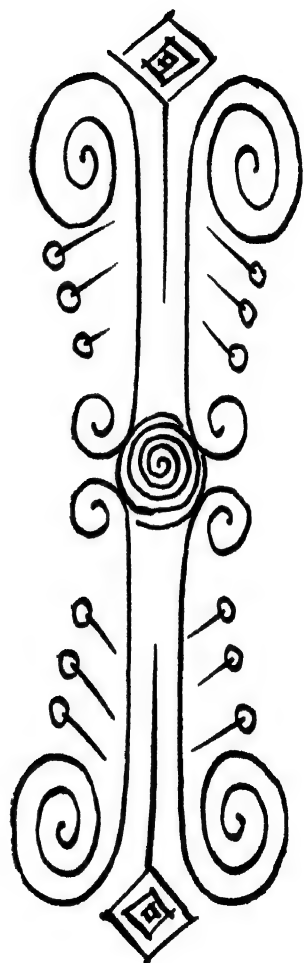
প্রবন্ধসাহিত্য

সূত্রপাত : প্রবন্ধ

সুনীলচন্দ্র সরকার

অতি অল্পদিনের মধ্যেই আধুনিক বাংলা গদ্য এবং প্রবন্ধসাহিত্য নানা ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে বাংলাসাহিত্যের নবযুগ সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই কেমন করে বঙ্কিম লিখলেন তাঁর প্রবন্ধগুলি। তারপরে এল রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ। গত পাঁচ বছরের প্রবন্ধ সাহিত্যের খোঁজ-খবর করতে গিয়ে দেখা গেল প্রবন্ধ আর অনাদৃত নয়। পাঠকসাধারণের মধ্যেও যেমন তার আদর বেড়েছে, তেমনি বহু নতুন প্রবন্ধকার রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্যও যেমন বিচিত্র, তাঁদের মধ্যে অনেকের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীও তেমনি নিজস্বতায় বিশিষ্ট। প্রবন্ধসাহিত্যে আমাদের গত এক শ বছরের উত্তরাধিকার নিয়ে আমরা গৌরব বোধ করতে পারি। আজ সেই উত্তরাধিকারের সার্থক ব্যবহার ও বিস্তৃতির লক্ষণ দেখে আশা হয় আমাদের কাব্যসাহিত্যের মত প্রবন্ধসাহিত্যও অল্পকাল মধ্যেই সৌন্দর্যে ও কলানৈপুণ্যে বিশ্বসাহিত্যে একটা স্থানলাভ করবে।

কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার যে এখনো বাধা অনেক। এক হল শিল্পগত—মাধ্যমের আড়ষ্টতা, অবাধ্যতা, অক্ষমতা দূর করে তাকে সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন করে নেওয়া। দ্বিতীয় হল আভ্যন্তরিক, অর্থাৎ লেখকের নিজের ভিতরকার বাধা দূর করে বিক্ষেপ বিচ্ছিন্নতাগুলিকে কোনো একটি মূল

ভূমিকার অন্তর্বর্তী করে নেওয়া ; তার জন্যে চাই চেতনার বিস্তৃতি, কোনো লক্ষ্যের দিকে চেতনার প্রবহমানতা। সাহিত্যের প্রবন্ধ-বিভাগ তখনই প্রাধান্য লাভ করে যখন ব্যক্তি ও সমাজের চেতনা প্রসারলাভ করতে থাকে। ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে উপমা দিয়ে বলা যায় কাব্যে যদি দেখি হ্লাদিনীশক্তি বা আনন্দের লীলাক্ষেত্র, প্রবন্ধসাহিত্যে আমরা পাই চিৎ-শক্তির প্রকাশ।

বর্তমান প্রবন্ধকারদের কাছে দেখছি একটি বৃহত্তর চেতনার তাগিদ এসে পৌঁছেচে। নীরস পাণ্ডিত্য ও চিরাগত মতামতের পুনরাবৃত্তিতে তাঁদের আর মন নেই। বাইরের জগৎটা তার সমাজ, রাজনীতি, কেনাবেচার বাজার, সভাসমিতি, যানবাহন, আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি সমস্ত বৈচিত্র্য নিয়ে আকর্ষণ করেছে অনেক লেখকের মনোযোগ। এই অভিজ্ঞতার প্রকাশ কখনো বা একেবারে বস্তুতান্ত্রিক, কখনো বা তাতে বাস্তবতার সঙ্গে মিশেছে কিছুটা কল্পনার আমেজ। ফোটোগ্রাফিক রীতিতে চিত্র সংকলন থেকে আরম্ভ করে মানসদৃষ্টিতে দেশকালপাত্রের ব্যাপকতর দৃশ্য উন্মোচনের প্রচেষ্টা আছে। একদিকে চলেছে দেশবিদেশের অভিজ্ঞতা আহরণ, নানাবিচিত্র মানুষ, অবস্থা ঘটনার স্ন্যাপ্‌শট্‌ সংগ্রহ, এবং মন্তব্য ও চিন্তার সূত্রে তাদের একত্র করবার চেষ্টা। অন্যদিকে নানাধরনের স্মৃতিকথা, আত্মজীবনী, জীবনী প্রভৃতির মধ্যে যুগজীবনের একটা কোনো দিককে প্রতিফলিত করবার আকাঙ্ক্ষা। জীবনের দ্রুতপরিবর্তনশীল রূপকে চেনবার জানবার এই চেষ্টা প্রশংসার্হ। কারণ আমরা জাতিগতভাবে কালের সম্মুখযাত্রা সম্বন্ধে নিশ্চেতন। আজ এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যে এসেও আমাদের অনেক অভ্যাস ও অনুষ্ঠান থেকে গেছে অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দীর। আমরা শাশ্বতের যোগ্যতা অর্জন করি নি, এবং বর্তমান থেকেও আমরা চ্যুত। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজে'র পর থেকে আজ পর্যন্ত আমাদের জীবনে বারবার যে আশ্চর্য পটপরিবর্তন ঘটেছে, বৃহৎ ক্যানভাসে তার গতি ও প্রকৃতিকে ধরবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা এখনো হয় নি।

আর একটি দিকেও বেশ কিছু সার্থকতার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে। নিজের মনোরাজ্যে বিচরণ, নিজের মধ্যে যা ছড়িয়ে আছে তাই একত্রে গেঁথে তোলা। এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত মেজাজ, রুচি ও রসবোধের সহায়তায় তাকে পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করা। ব্যক্তিগত রচনা আগেও যে বাংলা-সাহিত্যে ছিল না তা নয়, কিন্তু সাহিত্যের মোট উৎপাদনের তুলনায় তার পরিমাণ ছিল যৎসামান্য। এবং তার পাঠকও ছিল সংখ্যায় অল্প। এখন লেখক ও পাঠক দু-তরফের থেকেই এই ধরনের রচনার উপর যে অনুরাগের নিদর্শন পাওয়া যাচ্ছে তা আমাদের গদ্যসাহিত্যের পক্ষে একটা শুভ লক্ষণ বলতে হবে।

চিন্তামূলক প্রবন্ধ—সাময়িকপত্রে বা গ্রন্থাকারে তাও লেখা হয়েছে অনেক। বাংলার সাধারণ পাঠকও এখন একটু মস্তিষ্ক ব্যবহার করতে চায়। বিনা বিচারে সব কিছু গলাধঃকরণ করতে আর তারা রাজি নয়। তাই সাহিত্য-সমালোচনার, রাজনীতি সমাজনীতি আলোচনার যেন একটা মরশুম এসেছে। এবিষয়ে আগ্রহ যে পরিমাণে দেখা যায় সেই পরিমাণেই যে উৎকৃষ্ট নতুন চিন্তার আবির্ভাব হয়েছে এমন নয়। তবে ভাবতে শুরু করলেই কোনো একখানে আর থেমে থাকা যাবে না, অগ্রসর হতেই হবে। বর্তমান বিরোধগুলিকে এগিয়ে যেতে হবেই একটা সমন্বয়ের দিকে।

অনেক প্রবন্ধ আছে, তা বাংলা গদ্যে লিখিত হলেও বাংলা সাহিত্য নয়। কোন্ গদ্যরচনা সাহিত্য পদবাচ্য আর কোনটাই বা নয় তাই নিয়ে আলোচনা করা ভালো। শুধু কোনো মতবাদকে সতেজে ঘোষণা করলেই সাহিত্য সৃষ্টি করা হয় না একথা বললে দোষ নেই। কিন্তু কাজের সময় দেখা যায় যে লেখক কোনো বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর আজ্ঞা বহন করে আসরে নেমেছেন, তাঁর উগ্র মতবাদদুষ্ট লেখার মধ্যেও কখন সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ করেছে, আবার যিনি শুধু সাহিত্যের জন্যেই সাহিত্যচর্চা করেন তাঁর মধ্যে সাহিত্য বা সাহিত্যের অতিরিক্ত কিছুই নেই! রং বা সুর নিয়ে খেলা করতে করতেও

কখনো কখনো শিল্পী আবিষ্কার করেন তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাকে। ভাষা যেখানে ব্যবহারিক, সেখানে সে অনেক নিয়মে বাঁধা, কিন্তু যেখানে তা শিল্প, সেখানে তার বৃহৎ স্বাধীনতা। আজ সারা পৃথিবীতেই দেখছি এক ধরনের স্বাধীনতা অপর ধরনের স্বাধীনতাগুলিকে দমন করে রাখতে চাইছে। আমরা ভেবে দেখি নি যে গানের গলার স্বাধীনতা আর সহজ গলার কথা কওয়ার স্বাধীনতা এই দুয়ের মধ্যে বিরোধ আবশ্যিক নয়, দুই-ই পরস্পরকে আঘাত না করে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারে। মোটর চাপার স্বাধীনতা পথচারীর স্বাধীনতাকে অপঘাতের দ্বারা দণ্ডিত করবার দরকার নেই, মোটর চড়াকেও বে-আইনি ঘোষণা করা নিষ্প্রয়োজন। মতবাদ কিছু থাকুক না থাকুক, রচনার স্টাইল নানা অজ্ঞাত প্রক্রিয়া ও প্রথার অনুসরণ করুক, আমাদের কাজ সাহিত্যের সার্থক প্রকাশের জন্যে অপেক্ষা করা। এক হিসাবে কাব্য রচনার স্বাধীনতার চেয়েও গদ্য সাহিত্য রচনার স্বাধীনতা ব্যাপকতর। লোকজীবনের বহু বিস্তৃত অঞ্চলকে সে আয়ত্তাধীন করতে পারে। যখনই দেখা যায় সাহিত্যে এসেছে এই স্বাধীনতার স্ফূর্তি, এই বাধানিষেধহীন প্রকাশের আবেগ তখনই বুঝি ভালো সাহিত্যের জন্মলগ্ন আসন্ন। গত পাঁচ বছরের প্রবন্ধসাহিত্যের যতদূর পড়ে দেখতে পেরেছি তাতে মনে হয়েছে রবীন্দ্রোত্তর যুগের গদ্যে সেই নবজন্মের আর দেরি নেই।

বিংশ শতাব্দীর অর্ধেক অতীত হয়েছে। এমন ঘটনা-বহুল, বহু মহত্ত্বের পদপাতে রোমাঞ্চিত, সাধনা ও সংশয়ে বিচিত্র সময় ইতিহাসে দুর্লভ। এখন সময় এসেছে এই অর্ধ শতাব্দীর সমস্ত ক্রিয়াকর্ম, চরিত্র ও আখ্যান, অন্বেষণ ও প্রাপ্তির মর্মোপলব্ধি করার। আমাদের প্রবন্ধ-লেখকদের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে হবে। এই বড় কাজের উপযুক্ত হতে হলে প্রথমতঃ তাঁদের বৃদ্ধি করতে হবে নিজেদের চেতনার পরিসর। তারপর চাই একনিষ্ঠ সাধনা। মহতের জীবনী রচনা শুরু হয়েছে। তার মধ্যে কিছু কিছু যথেষ্ট প্রশংসনীয়। তবু বলতে হবে রচনার মহত্ত্ব এখনো অনেক পিছিয়ে আছে বর্ণিত জীবনের

মহত্ত্বের চেয়ে। যুগজীবনের সঙ্গে যোগরক্ষা করে কর্ম ও চিন্তা-নেতাদের জীবনী লেখার এখনো যথেষ্ট প্রয়োজন ও সম্ভাবনা আছে। এই যুগের মর্মবাণীর সঙ্গে পরিচয় সাধন তার স্মরণীয় মুহূর্ত ও চরিত্রগুলির চিত্ররূপ রচনা—এই দুঃসাধ্য কাজ করবার যোগ্য প্রস্তুতি আজ প্রবন্ধ-সাহিত্যে হয়েছে বলে স্বীকার করি। সমালোচনা-সাহিত্যেরও পক্ষে আজ শুভলগ্ন। দেশী ও বিদেশী চিন্তাধারার সংমিশ্রণে নূতন চিন্তা ও সংশ্লেষণ চেষ্টার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। আজ যাঁরা এই সমস্ত দুঃসাধ্য ও জীবনব্যাপী তপস্যা স্বীকার করবেন সেই উদীয়মান প্রবন্ধকারদের আমার শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

পাঁচ বছরের রম্য-রচনা
বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

দু জনে একত্র হলে উৎপত্তি হয় সমাজের। দু জনে এক সঙ্গে মিলিত হলে সূত্রপাত হয় সাহিত্যের। সমাজবদ্ধ মানুষের নানাবিধ মনোবৃত্তি, সম্বন্ধ আর ব্যঞ্জনাই হল সাহিত্যসৃষ্টির উপকরণ। সাহিত্যের জন্মের মধ্যে এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সমাজবৃত্তির পরিপুষ্টি এবং সমাজধর্মের সরস চিত্রণ। একটির বিবর্তন হয়েছে প্রয়োজন-সাহিত্যের মারফত, দ্বিতীয়টির কল্পনা-সাহিত্যের মাধ্যমে। উভয়েরই বাহন হল এক বিশিষ্ট ভাষা যার ঘটকতায় নিজের কথা ও চিন্তা অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। মনের অন্বয় থেকে জন্মায় প্রণয় আর সাহিত্য হল প্রণয়জ সৃষ্টি। সার্থক স্পর্শে উজ্জীবিত রস গ্রহণ আর রস বিতরণ—এইটুকুই মিলন ও ভাষণের মূল কথা।

প্রবন্ধ-সাহিত্য হল এমন এক বিশিষ্ট শ্রেণীর সাহিত্য, যার মধ্যে শুধু স্তরবিভাগ নেই। আছে রসভেদ। প্রবন্ধের অর্থ যদি হয় প্রকৃষ্ট বন্ধ, তা হলে সেই গ্রন্থি বা সংশ্লেষের দুটো দিক্ থাকাই স্বাভাবিক। একটি বিষয়গত, অপরটি হৃদয়গত। তাই নিবন্ধ হতে পারে তত্ত্বপ্রধান আবার রসপ্রধান। যেখানে বস্তুজগতের তথ্য বহন ও ব্যাখ্যা করাই মূল উদ্দেশ্য, সেখানে প্রবন্ধ হচ্ছে যুক্তিবাদী, মননশীল্ তথ্য-সাহিত্য। এ ধরনের প্রবন্ধকেও অকারণ পাণ্ডিত্যে আর পাদটীকায় কণ্টকিত না করে সুপাঠ্য ও সরস করা যায়, যদি থাকে সামঞ্জস্য-জ্ঞান, ভাব ও ভাষার প্রসাদ। আর যে প্রবন্ধ শুধু সংবাদ

বহন করে না, নিজস্ব আবেগ ও চঞ্চলতা অপরের হৃদয়ে সংক্রামিত করে, আপনার রস-চেতনায় পাঠকমনের সঙ্গে গূঢ় ও গাঢ় বন্ধ স্থাপনা করে, সেটাই হল রসসাহিত্য। এই ধরনের সাহিত্যিক আলাপ-বিস্তারকেই প্রকৃত রম্য-রচনা আখ্যা দেওয়া যায়। এর মধ্যে কোথায় যেন একটি সংগীত-ধর্ম রয়েছে। রম্য-রচনা নানাভাবে ও ভঙ্গীতে রসপরিবেশন করে, ভিন্ন-রুচি পাঠককেও বিভিন্ন উপায়ে তৃপ্তি দিতে পারে। তাই এ জাতীয় সাহিত্যের একটা নিখুঁত মাপকাঠি অথবা তার প্রকাশ-পদ্ধতির মধ্যে বিশেষ কোনও রীতিবদ্ধ নীতি সন্ধান করা বোধ হয় সংগত হবে না। রম্য-রচনার যথার্থ সংজ্ঞা নিরূপণ করা, তাকে একটি বিশিষ্ট 'ফরমূলার' মধ্যে বেঁধে ফেলা চলে না। কারণ, রসান্বিত, সাহিত্য-লক্ষণাক্রান্ত প্রবন্ধ কখন যে রম্যরচনায় গিয়ে রূপায়িত হচ্ছে, তা ঠিক দেখানো যায় না। উভয়ের অলক্ষিত সীমারেখা সুস্পষ্ট নয়।

মোটের উপর বলা চলে—কি থাকলে পড়া সার্থক হয়, মন ভরে ওঠে আর কি না থাকলে অভাব-বোধ বা অতৃপ্তি মনকে পীড়িত করে। যেমন বলা যেতে পারে, রম্য-রচনা বা রসনিবন্ধের মধ্যে একটি যুক্তির শৃঙ্খলা থাকবে, তা সে বাস্তবই হোক আর মন-গড়াই হোক। কিন্তু তত্ত্বসর্বস্ব হবে না। ভাবনা যতই বিস্তৃত বা প্রক্ষিপ্ত হোক, সকল কথার একটা মূলধারা যেন থাকে। নানামুখী চিন্তার সূক্ষ্ম জাল-বুননের ভিতর থেকেও দেখা যাবে লেখক-মনের প্রসন্ন নির্মুক্তি। স্মৃতি ও রসের বিন্যাসে, লঘু-গুরু ভাষার যথাযথ ব্যবহারে থাকবে জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা ও মমত্বের স্মিত স্বীকৃতি। থাকবে আপনাকে প্রকাশ করবার দায়িত্ব-বোধ এবং একটি অনতিরঞ্জিত শিল্পমার্গ। এক কথায়—স্বয়ম্ভূ আনন্দ এবং ব্যক্তিত্বধর্মী প্রকাশ। যুক্তির সারবত্তা থাকুক, কিন্তু মনের ও লেখার গতি উভয়ে মিলে যেন তার বিশিষ্ট আবেদনকে একাধিক চিত্তে সঞ্চারিত করতে পারে। আবার এ জাতীয় রচনায় আতিশয্য আর পুনরুক্তি এসে যাবার আশঙ্কা ষোল আনা। রসিকতা

যেখানে দীপ্তিহীন, বক্তব্য সেখানে কষ্টকল্পিত। অভিজ্ঞতা যখন নিঃশেষিত-প্রায়, প্রিয়বচন তখন বাগ্‌বাহুল্য। 'আমিত্বে'র খোঁচা যেখানে উগ্র আর পাণ্ডিত্য হয় প্রকট, আত্মপ্রকাশ সেখানে ধূমায়িত বহ্নি, আত্মম্ভরিতারই নামান্তর। এক কথায়, রসজ্ঞানের হয় সমাধি। আবার লেখক যদি অবাঞ্ছিত স্থূলত্বের কোঠায় নেমে আসেন, তাঁর বিরূপ বিদ্রূপ হয়ে যায় 'চুটকি', আঞ্চলিক গ্রাম্যতা। দৃষ্টি তির্যক হলে সেটা মজার ব্যাপার, কিন্তু চোখ বাঁকা হয়ে থাকলে সেটা কটাক্ষ নয়, কটু দৃষ্টি। কথার শাণিত খেলা আনে রচনায় ধার, যেমন বীরবলী ভঙ্গী। কিন্তু সেটা যেন চোরাবাজারের সান্ধ্য জৌলুস না হয়, কিংবা সস্তা অলংকারের গিল্‌টি পালিশ। রম্য নৃত্যে ভঙ্গী যদি হয় ভঙ্গিমা, মুদ্রা হয় দোষ, তাহলে সে নৃত্যের মর্মবাণী কেবল বোল্‌-সর্বস্ব চটুলতা। উর্ধ্বায়িত শিল্প-গতি তখন পদে পদেই ব্যাহত হয়। রম্যরচনার ধারণা-শক্তি আছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়, উপলব্ধি ও রসানুভূতির মর্মমূলে। কিন্তু সেই ব্যক্তিগত অবকাশের অপপ্রয়োগ অহমিকায় দাঁড়ালে সেটা সুন্দর, শোভন হয় না এবং সর্বমানবিক স্তরে পৌঁছয় না।

'রম্য-রচনা' পদটির হালফিল ব্যবহার। কথাটির মধ্যে বেশ অর্থসংগতি রয়েছে এবং ফরাসী 'বেল্‌ লেত্যর' শব্দটির অভিসংকেত বহন করছে। বাংলায় রম্য-রচনা বলতে এখন যা বুঝি, মানে বিজ্ঞাপনে যা বোঝানো হয়, তাকে পুরোপুরি মেনে নিতে সংকোচ লাগে। কেননা, তাহলে অনেক উচ্চাঙ্গের সাহিত্য বাদ পড়ে যায়। এখানে বলে রাখি, এ জাতীয় সাহিত্য সংবাদপত্রের 'কলম'-মাফিক ফরমায়েশী রচনা নয়। সাংবাদিকতার তাগিদে সৃষ্ট হলেও সাংবাদিকতার উর্ধ্বেই তার স্থান। তাই রম্যরচনা কথাটি শুনতে ও বলতে যতটা রম্য লাগে, আসলে তা অতটা লঘু বা সহজ নয়। অনেকেরই একটা ধারণা আছে যে কিছুটা ভাষার কারিকুরি, কিছুটা কথাচিত্রের গতি ও আকর্ষণ, আর তার সঙ্গে খানিকটা রোমান্সের আমেজ ঢেলে দিলেই তাকে অনায়াসে রম্য-রচনা বলে চালানো যায়। তা যদি হয়, আপত্তি করব

না নামকরণে। কিন্তু তার অনুমতিপত্র লাগবে সাহিত্যের আসরে। অলিম্পিক খেলাধুলায় বিদেশী তো নয়ই, খাঁটি হেলেনিক পরিচয়-পত্র দাখিল করার রেওয়াজ ছিল এককালে। রম্যরচনায় তেমনি রেখাচিত্রের আভাস থাকুক, গল্পের মতন একটানা গতি থাকুক, গাল-গল্প, সরস আখ্যানও থাকুক। এ সবই ভালো চলবে। কিন্তু যেন নিছক স্বদেশী অথবা বিদেশী 'কেচ্ছা-কাহিনী' না হয়। সৎ-সাহিত্যের সগোত্র বলেই তাতে কিছু খাঁটি ভাববস্তু থাকা দরকার। এর ঐতিহ্য নিতান্ত অর্বাচীন নয়। অতএব রচনা-কৌশলেও থাকা উচিত কিছু আভিজাত্য। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, রম্যরচনা হল সাহিত্যে দুঃস্থ অন্তঃপুরিকা। কিন্তু তারও একটা স্বকীয় ঐশ্বর্য আছে। লঘু চালে গুরু চিন্তা অথবা গম্ভীর চালে লঘু কৌতুক এ সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। প্রমাণ—রবীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের রচনাবলী; প্রমথ চৌধুরী, অতুল গুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ ও অন্নদাশঙ্কর রায়ের লেখা। এঁরা যদি 'বেল্ লেত্যর' লিখে না থাকেন, তাহলে ওটা নিতান্তই 'বেলে' খেলা।

বাংলা সাহিত্যে রম্যরচনার প্রথম সুসজ্জিত নিদর্শন পেয়েছি বঙ্কিমের রসরচনায় ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দু-একটি প্রবন্ধে। তারপর তার সার্থক সংস্কৃত রূপ দেখেছি কবি-গুরুর রসোৎসারী অজস্র রচনায় আর বলেন্দ্রনাথের একান্ত নিজস্ব রস-প্রবন্ধে। এর পর আসরে নামলেন সশিষ্য বীরবল। সরস হবার ক্ষমতার সঙ্গে স্থিরতা ও দৃঢ়তা, স্বচ্ছতা ও চিন্তারসের আশ্চর্য সমন্বয় হল এই গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য। সকলেই সচেতন যত্নবান শিল্পী; রসসৃষ্টির কাজে সাহিত্য-বুদ্ধি, সমাজ-জিজ্ঞাসা ও সমালোচনা-প্রবৃত্তি তাঁদের ক্ষুণ্ণ হয় নি। কেউ বা গল্পধর্মী প্রবন্ধ লিখেছেন, কেউ বা ভাবের ও ভাষার রসায়নে রস-সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাই মনে হয়, বিদেশী 'বেল লেত্যর' শব্দটিকে বর্তমানের হাল্কা চালে বেশি লঘু করার দরকার নেই। গোমড়া মুখ নিয়ে অবশ্য এ জাতীয় রচনা লেখা সম্ভব

নয়, পড়াও যায় না। কিন্তু উপভোগের শুদ্ধতা ও গাম্ভীর্য থাকতে আপত্তি কি? ইংরেজি সাহিত্যে হল্‌ক্রফ্‌ট, হেডন, হ্যাজলিট-প্রমুখ লেখকের স্মৃতিমূলক রচনা: বিংশ শতকে বেনেট, গল্‌স্‌ওয়ার্দি, এইচ-জি-ওয়েল্‌স ও লরেন্স; তারপর আধুনিক কালে হক্‌স্‌লি, হার্বার্ট রীড, অডেন, স্পেণ্ডর, ম্যাক্‌নীস্‌, অ্যাগেট ও নেভিল কার্ডস্‌ প্রভৃতি অনেক লেখকের একাধিক ব্যক্তিগত অর্ধগম্ভীর রচনা, স্বগত উক্তি এবং পত্র আলোচনা রম্য রচনার সার্থক উদাহরণ। ভ্রমণ-সাহিত্য অথবা শিল্পসম্পর্কিত লেখাও রস-সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে—যেমন সিট্‌ওয়েল ভ্রাতৃদ্বয়ের রচনা। প্রবাস-জীবন অথবা তীর্থযাত্রাই হোক্‌, আর বিশুদ্ধ রসচর্চা কিংবা আত্মকথনই হোক, রসসাহিত্যের জাত-লিখিয়ে যে কোনও বিষয়বস্তুকেই রম্যরচনায় উন্নীত করতে পারেন। আমাদের দেশীয় সাহিত্যেও প্রমাণাভাব ঘটবে না, যথা—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মকথা; রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী ও উপেন গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতি-প্রসঙ্গ, সঞ্জীবচন্দ্র ও জলধর সেনের ভ্রমণ-চিত্র; চারু দত্তের পুরানো কথা ও মহাস্থবির-জাতক, অন্নদাশঙ্করের বিদেশ-প্রসঙ্গ, বুদ্ধদেব বসুর সরস ভ্রমণ জল্পনা, অচিন্ত্য-কুমারের কল্লোলযুগ সম্পর্কিত স্মৃতিচিত্র, আর প্রবোধ সান্যালের 'জলকল্লোল' ও রানী চন্দের তীর্থ-পরিক্রমা। স্বদেশী ও বিদেশী সাহিত্যের নমুনা দেখিয়ে তা হলে বলা চলে, রম্য রচনার পরিধি আরও বিস্তৃত করা দরকার।

বাংলা সাহিত্যের বর্তমান আসরে প্রবেশ করলে দেখতে পাই, গত পাঁচ-সাত বছরের মধ্যে রম্য-রচনা-জাতীয় অনেকগুলি বই প্রকাশিত হয়েছে। লেখক ও পাঠক, উভয় তরফের মনের মিল প্রকাশ্য না হয়ে উঠলে, প্রকাশক বড় একটা আসরে নামেন না। তাঁরা যখন চাহিদা বুঝে বই ছাপাতে শুরু করেছেন কিছু-কিছু, তখন সেটা আশা ও

আনন্দের কথা নিশ্চয়ই। এই সূত্রে লক্ষ্য করবার জিনিস যে হাল আমলে এই স্নিগ্ধ ও রম্য-রচনার মরশুম পড়েছে। ফসলও জমে উঠেছে মন্দ নয়। এ যেন শেষ যুদ্ধের ক্ষেত্রে এক রবি শস্যের উদ্ভেদ। কারণটা কি, জিজ্ঞাসা জাগে মনে। লোকের সময় নেই, অন্নসংস্থানের অপরিচ্ছন্ন অবসরে ধৈর্য কম—এগুলো কাজের কথা নয়। ছোট গল্প তো আরও ছোট এবং একটি সার্থক ছোট গল্প পড়েও কিছু কম তৃপ্ত হয় না পাঠকের মন। একটি পরিপূর্ণ নিটোল কবিতা, যাতে বিষয় ও আঙ্গিকের অতিরিক্ত কবিসত্তার প্রকাশ, তাও মনকে কম মুগ্ধ করে না। উপন্যাসের একমুখী বেগ এবং আখ্যানবস্তুর দুর্নিবার আকর্ষণের পাশে রম্য-রচনার আকর্ষণ কি আরও বেশি? নাটকের সংঘাত ও তুঙ্গ পাঠকচিত্তকে রীতিমত মোহাবিষ্ট করে রাখে, যদিও উল্লেখযোগ্য নাটকের নমুনা বর্তমান বাংলা সাহিত্যে বিশেষ নেই। তবু রম্য-রচনার যে চাহিদা আজকাল বেড়েছে, তার মূল কারণ বোধ হয় আমাদেরই দৃষ্টি ও রসবোধের রূপান্তর, কিছুটা অন্যান্য সাহিত্য-শাখার আপেক্ষিক মানবিভ্রম অথবা সফলতার অভাব। গত পাঁচ বছরে যুগান্তকারী বই কোনও বিভাগেই বেরোয় নি, এ কথা সত্য। কথা-সাহিত্যে ও কাব্য সাহিত্যে সম্প্রতি প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য বইয়ের সংখ্যাও কম। সে তুলনায় রম্যরচনায় বেশ কিছু কাজ হয়েছে, দেখা যাচ্ছে। হয়তো এর পিছনে সামাজিক, অর্থনীতিক অথবা অন্য কোনও কারণ আছে। তবে এ কথা ঠিক যে বর্তমানে গল্পলেখক, কবি এবং ঔপন্যাসিক এমন কিছু জিনিস পাঠকদের ধরে দিতে পারছেন না যাতে তাদের মন পূর্ণ হয়, আন্তরিক তৃপ্তি হয়। বোধ হয়, এই কারণেই তারা রম্য-রচনায় খানিকটা মনের খোরাক সন্ধান করে। অন্ততঃ এমন একটি জিনিস খুঁজছে অথবা পাচ্ছে যাতে কথা, কবিতা, আলাপ, চিন্তা ও স্মৃতির 'সমস্ত' রসের আস্বাদ ফুটে ওঠে। গদ্য এবং গদ্যকবিতার মাঝামাঝি একটা ভাষা সাহিত্যের বর্তমান-উপযোগী বাহন বিশেষ। মনে হয়, সমরোত্তর যুগকে

যদি নিতান্তই ফক্কিকারি বলে বাতিল করে না দিই, যদি তাকে 'প্লাষ্টিকের যুগ' বলেই ধরে নিই, তা হলে বলা যায় রম্য-রচনা হল নমনীয় সাহিত্যশিল্পের একটি মনোরম দৃষ্টান্ত! আর এই লঘুপদ, ব্যক্তিত্বধর্মী রস-সাহিত্যের একটা অন্ততঃ ভদ্রগোছের সঞ্চয় জমে উঠেছে বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে।

রবীন্দ্রোত্তর সাহিত্যে যিনি প্রথম এই পথ তৈরি করে নিলেন এবং আপনার ব্যক্তিগত, মৌলিক প্রকাশের স্বাক্ষরে তাকে চিহ্নিত করলেন, তিনি বুদ্ধদেব বসু। তাঁর অনবদ্য-সুন্দর প্রথম গ্রন্থ 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি' বিস্ময়ের দীপ্তি নিয়ে হাজির হল। পরবর্তী রচনা 'উত্তরতিরিশ' সমানুপাতে সার্থক না হলেও, দুখানি বইয়েই তাঁর মনের ও কলমের ধারা যে বিশিষ্ট পথ খুঁজে নিয়েছে, তা বুঝতে দেরি হয় না; তাঁর রচনার গুণ হল বিস্ময় ও সৌন্দর্য-বোধ। চোখ মেলে দেখার প্রথম আনন্দ ও অনুভূতি ভাষার শিল্পসম্মত প্রয়োগে 'লিরিক'-এর সুষমা অর্জন করেছে। ভাবের সম্প্রসারণে, প্রকাশাবেগের উপযোগী বৈচিত্র্যে পথিকৃৎ-এর কৃতিত্ব তাঁর নিশ্চয়ই প্রাপ্য, যদিও কৈশোরসুলভ আত্মপ্রীতি ও উচ্ছলতা কোনও কোনও রচনার মর্যাদাকে ঈষৎ ম্লান করেছে। প্রবোধ সান্যালের রম্য-রচনা ঠিক সমগোত্র নয়। কিন্তু তার আবেদনও অনেকটা আবেগপ্রবণ, সরস ও কোমল। জ্যোতির্ময় রায়ের রচনা কৌশল ভিন্ন জাতের। তিনি সর্বপ্রকার তরলতা বর্জন করে, আপনার ব্যক্তিত্বকে সুপরিস্ফুট করে তুলেছেন। তাঁর দৃষ্টির স্বাতন্ত্র্য আছে এবং কোণ বিশিষ্ট বলেই অনেকটা তির্যক্! কথার খেলা, চতুর শ্লেষ এবং নিপুণ মোচড়ে তাঁর বক্তব্য হয়েছে সতেজ ও তীক্ষ্ণ, যদিও কোনও কোনও প্রবন্ধে, যেমন 'অন্যান্য' বইখানিতে, বক্তব্যের চেয়ে বলার চেষ্টাটাই যেন বেশি ইচ্ছাকৃত। প্রমথ বিশী অনেক দিন যাবৎ নানা জাতীয় রসরচনায় হাত পাকিয়েছেন; অসংগত বাক্-চাতুর্যে এবং আপাত-বিরোধী উক্তিতে অনেক ক্ষেত্রে কিছুটা উদ্ভট রসের অবতারণা করেছেন। তীব্র শ্লেষ-বিদ্রূপে তিনি যথার্থ নিপুণ। কিন্তু তাঁর আত্ম-সংলাপ এবং দৃশ্যতঃ নেপথ্য উক্তি কিছু পরিমাণে নাটকীয়।

কখনও তিনি উচ্ছল অতিশয়োক্তি দিয়ে 'বার্লেস্‌ক্' রচনা করেন, কখনও বা নক্‌শা আবার কখনও বা চিত্র-চরিত্র। তাঁর লেখায় তথা ব্যক্তিত্বে এই আকর্ষণ বিকর্ষণের পালা বুঝি সাঙ্গ হয়নি। পরিমল রায়ের হাত ছিল বড় মিষ্টি। বিশুদ্ধ কাব্যের মতই বিশুদ্ধ কৌতুক তিনি পরিবেশন করতে চেয়েছিলেন এবং এক একটি সুন্দর কথাচিত্রের রেখায় তিনি তাঁর সরস চিন্তা ও মন্তব্য সাজিয়ে গেছেন। 'ইদানীং' গ্রন্থ-প্রকাশের পর তিনি অকালে গত হয়েছেন।

সমকালীন বাংলা সাহিত্যে রসপ্রবন্ধকারের মধ্যে ইন্দ্রজিৎ, রৈবত আর কালপেঁচা ভিন্ন ভিন্ন মার্গ অনুসরণ করে সুখ্যাতি লাভ করেছেন। সমপ্রকৃতির লেখক এঁরা নন, তবু এঁদের মননশক্তির স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ নেই। ইন্দ্রজিতের রচনা আপাতদৃষ্টিতে মৃদু ও নিরীহ। কিন্তু তাঁর কথার চকমকির পিছনে রয়েছে চিন্তার স্ফুলিঙ্গ। এক-একটি অগ্নিকণায় চোখ-ঝলসানো দীপ্তি নেই, আছে বাহার। তাঁর বিষয় এবং প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে ভাব ও ভাষাগত এমন একটি সংগতি আছে, যেটি অপরদের রচনায় অতটা পাই না। রস-নিষ্কাষনই হল তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। তাই তাঁর রচনায় আছে অবলীলা এবং স্বচ্ছ সরলতা, যা রীতিমত আয়াস-সাধ্য। 'রৈবত'র লেখা শান্ত এবং তাতে চমৎকার প্রসাদগুণ আছে। 'মন পবনের নাও' গ্রন্থে তিনি সাহিত্য ও জীবন সম্বন্ধে অনেক কথাই খোলাখুলি আলোচনা করেছেন, যদিও রসিকতার অভাবে তাঁর কোনও কোনও রচনা কেমন যেন নিষ্প্রভ ঠেকে। জ্যোতির্ময় রায়ের ব্যক্তিত্বের ঠিক বিপরীত হল তাঁর সুভদ্র ও সংযত কবিসত্তা। 'জনান্তিক' বইখানি সে তুলনায় সুন্দর ও সরস। অবশ্য এইটেই স্বাভাবিক। শিক্ষা, রুচি ও স্টাইলের স্বাতন্ত্র্য থাকবেই।

ব্যক্তিগত রসরচনায় মোটামুটি দুই ধরনের লেখক দেখা যায়। প্রথম শ্রেণীর লেখক ইঙ্গিত ও সংকেতের পক্ষপাতী। অল্প আভাসে ও ব্যঞ্জনায় তাঁরা অনেক কথা জানান, হালকা তুলির লঘু স্পর্শে অনেক ছবি রেখান্বিত

করে তোলেন। এঁদের সূক্ষ্মানুভূতি মনের প্রকাশও সূক্ষ্ম ও সূচ্যগ্র। অপর শ্রেণীর লেখক হলেন কথক-বিশেষ। কথার পর কথা সাজিয়ে গল্প বলার সাবলীল ভঙ্গীতে যেন পাঠকের কাঁধে হাত রেখে তাঁরা এগিয়ে চলেন। উদার ও বিশদ বক্তব্যে ও বর্ণনে পাঠকের বিরক্তি উদ্রেক না করে তাঁদের সঙ্গে মধুর সতীর্থ-ভাব সৃষ্টি করেন। দুই শ্রেণীর রচনা, দুই স্তরের আবেদন। উভয়ই শিল্প; আকর্ষণ কোনোটাতেই কম নয়। যাঁর যে রকম স্বভাব ও মেজাজ, তাঁর সে রকম খুশি ও খেয়ালের রচনা। কেউ বা মৃদু হেসে অর্থ ভরে দেন, কেউ বা উষ্ণ করমর্দনে আন্তরিক আপ্যায়ন জানান। আমার কাছে অবশ্য এই দুই ভঙ্গীর ও রসকৌশলের মিশ্রণটাই উচ্চ আদর্শ। মনে হয় অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থার প্রয়োজন, অর্থাৎ উহ্য এবং উক্ত, রেখায়িত অথচ ব্যক্ত, এ দুটিকে যিনি চিন্তার জারক রসে ও প্রকাশের স্বাদুতায় লোভনীয় করতে পারেন প্রসঙ্গের প্রয়োজনক্রমে, তিনিই ওস্তাদ শিল্পী।

'কাল পেঁচার নক্সা'য় দুটি সুরেরই আনাগোনা দেখি। বাংলা সাহিত্যে অপেক্ষাকৃত নবীন হলেও তাঁর রচনায় প্রবীণ চিন্তার ছাপ রয়েছে। হুতোম পেঁচার বংশধরের নামই কালপেঁচা! জাতি ও গোত্র প্রায় একই। কেবল যুগধর্ম ও সমাজ-গতির খাতিরে প্রশ্ন-সমাকুল জীবনের দাবি মেনে নিয়ে বেশ পরিবর্তন করা হয়েছে। এঁর লেখনীতে আছে সরস প্রাজ্ঞতা, মগজে আছে বিদ্যাবুদ্ধি, ঠোকরে আছে নির্ভুল টিপ। 'কালপেঁচার নক্সা' আর 'কালপেঁচার দু কলম'—এই দুই কিস্তিতে তিনি 'স্কেচ' ও 'স্টাডি' পরিবেশন করেছেন এবং উভয়ের মধ্যে আছে তীক্ষ্ণ চমৎকারিত্ব। আর একটি কথা। সমাজ-সম্বন্ধে ইনি যথেষ্ট সচেতন। উদ্বাস্তু, গ্লানিময় বাংলার বিকলিত সাহিত্য-ভিটায় তিনি সেই প্রাচীন বাস্তরই আধুনিক সংস্করণ।

রম্য-রচনার এক বিশেষ ধরনের সুর লেগেছে যাযাবরের 'দৃষ্টিপাতে'। এর জনপ্রিয়তা সম্পর্কে সংশয় নেই, বিশ্লেষণের হয়তো অবকাশ আছে।

ভাবে ও ভাষায়, একটা সুনির্দিষ্ট সমাজ-শ্রেণীর চিত্রণে, উন্নাসিক আভি-জাত্যের 'গসিপ' ও গল্প-পরিবেশনে, আর সর্বোপরি একটি রোমান্টিক কাহিনীর শান্ত ও মিষ্ট কূজনে সমগ্র পরিবেশটিকে যত্নভরে উপভোগ্য করে তোলা হয়েছে। সকল শ্রেণীর পাঠকের কৌতূহল তাই মেটে, আপনাদের অবদমিত বাসনা চরিতার্থ হয়। তাঁর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'জনান্তিক' ঠিক্ কোন্ জাতীয় রস বিতরণ করছে, তার বিচার করবেন রসজ্ঞ পাঠক। এ বইয়ের শ্রেণী-নির্ণয় গোলমেলে ব্যাপার। তবে কৃত্রিম শোভায় ঝলমল করলেও, গ্রন্থকারের পূর্ব-খ্যাতি অক্ষুন্ন রাখতে পারে নি এই শেষ প্রচেষ্টা।

রঞ্জনের 'শীতে উপেক্ষিতা'র সঙ্গে যাযাবরের 'দৃষ্টিপাতে'র আপাত-সাদৃশ্য পাঠকরা নাকি লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, গরমিলই বেশি। রঞ্জনের লেখায় উত্তাপ ও তীব্রতা বেশি, স্নিগ্ধতা কম। ধীশক্তি ও তার নিরাভরণ প্রকাশে তিনি যেন বেশি আস্থাবান্, যদিও আনুষঙ্গিক অলংকারে তাঁর অরুচি নেই। তাঁর আত্মপ্রত্যয় উগ্র এবং অকুণ্ঠ। সংগীতের উপমা দিয়ে বলা চলে, তিনি ভালোবাসেন কালোয়াতি। ঠুংরির মিশ্ররস তাঁর কাছে অবাঞ্ছনীয় কৃত্তিত্ব। ব্যক্তিগত ভাবে বলতে পারি, তাঁর প্রথম গ্রন্থে সম্পূর্ণতার অভাব। তার চেয়ে 'বইয়ের বদলে' এবং প্রকাশ্যমান 'বিকল্পে' ও 'প্রতিধ্বনি'-জাতীয় কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বেশি উপভোগ্য মনে হয়েছে। রম্যরচনার চেয়ে ব্যক্তিত্বধর্মী ও যুক্তিবাদী গদ্যরচনায় তাঁর প্রকৃত শক্তির পরিচয়।

সৈয়দ মুজতবা আলি তাঁর নিজস্ব আসন আপনি দখল করে নিয়েছেন এবং অনায়াসে। 'দেশে বিদেশে' 'চাচা-কাহিনী' ও 'পঞ্চতন্ত্র'—এ সবই হচ্ছে মজলিশি লেখা, খোশ গল্পের নামান্তর। আর মজলিশের যেটা সারবস্তু অর্থাৎ গল্প রসিয়ে বলার ক্ষমতা এবং বলিষ্ঠ প্রাণ-ধর্ম—তা তাঁর লেখাতে ষোল আনাই বর্তমান। তাঁর হাসি দরাজ, চাহনি সোজা। দৃষ্টিতে অনুকম্পা

নেই, আছে সহানুভূতি। মনোভাবে অবজ্ঞা বা ঔদ্ধত্যের স্পর্শ নেই। আর সব চেয়ে বড় কথা, অর্জিত অভিজ্ঞতার সুব্যবহারে তিনি রসজ্ঞ শ্রোতাকে খুব কাছে টানতে পারেন। তাঁর ভাষায় একটা দৃপ্ত পৌরুষ আছে কিন্তু পরুষতা নেই। শব্দপ্রয়োগে তিনি সযত্ন ও পরীক্ষার পক্ষপাতী। তার ওপর, বিদেশী বহু শব্দ ও পদের লাগসই ব্যবহার তিনি করতে জানেন। এগুলি মহাগুণ। তবে এই ধরনের রচনায় একটা প্রাথমিক বিপদ্ আছে যেটা 'পিকারেস্‌ক্', রোমাণ্টিক এবং অভিজ্ঞতার মূলধনী সাহিত্য-কারবারে প্রায় অনিবার্য। লেখার প্রথম দীপ্তি বা চমক অম্লান রাখা, তাকে পুনরুক্তি বা অতিব্যবহারের গ্লানি থেকে মুক্ত রাখা নিতান্ত সহজ নয়। সুপাঠ্য রচনার মৌলিকত্ব উপসংহারের জেরে ক্রমশঃ অপাঠ্য হয়ে উঠতে পারে, অন্ততঃ সে সম্ভাবনা থাকে।

'রূপদর্শী'র-নামে সম্প্রতি যে নকশাগুলি বেরুচ্ছে, তা পড়লে মনে হয় রূপদর্শী সৈয়দ মুজতবা আলির মানসশিষ্য। সাহিত্যে স্থায়িত্বলাভ অবশ্য সাধনার ব্যাপার। তবে ইতিমধ্যে তিনি সরস ভাষার জোরালো ব্যবহার শিখে নিয়েছেন। তাঁর হালকা তামাশার মধ্যে মধ্যে হঠাৎ সীরিয়স কথা খুব মজার এবং চটকদার।

রম্যরচনার যে সব নমুনার উল্লেখ করেছি, তা ছাড়াও অন্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেগুলির সুর আলাদা হলেও কম রম্য নয়। হরপ্রসাদ মিত্রের 'সাহিত্য-পাঠকের ডায়েরি' একটি ভালো নমুনা। এ বইখানিতে তিনি অধীত বিদ্যা ও সমালোচনার ব্যাপারটি মনোরমভাবে সাজিয়েছেন, যাতে পাঠকদের পক্ষে সাহিত্য-পরিচিতি জিনিসটা, সহজ ও উপভোগ্য হয়। পুরোপুরি সুবিন্যস্ত না হলেও, এ রচনা অনায়াসেই 'বেল্ লেত্যরের' পর্যায়ে পড়তে পারে। এখন বাংলা সাহিত্যের রম্য-রচনার শুধু একটি স্পষ্ট অভাবের উল্লেখ করে প্রসঙ্গ শেষ করি। আমাদের সাহিত্যে উৎকৃষ্ট ভ্রমণ-কাহিনী আর সেই সূত্রে সরস ও সংস্কৃতিমান

মননের পরিচয় পর্যাপ্ত নয়। 'দেশে বিদেশে' অবশ্য খানিকটা অভাব পূরণ করেছে সম্প্রতি। কিন্তু এমন একটি 'ট্র্যাভেলোগ'—যেখানে সজাগ চিত্ত বিশ্লেষণ-বুদ্ধিতে যাচাই করে নেয়, নিজে প্রথম দেখে এবং পরকেও নতুন করে দেখায়, নিজে শেখে ও পরকে শেখায় গুরুমশাইগিরি না করে, আপনার বিচার-বোধ অভিজ্ঞতা ও সৌন্দর্য-জ্ঞানের প্রলেপ ছড়িয়ে দেয় ও রং ধরায় উৎসুক চিত্তে, এমন গ্রন্থ কবি ছাড়া লিখেছেন বোধ হয় শুধুই অন্নদাশঙ্কর। বুদ্ধদেব বসু ও প্রবোধ সান্যাল অবশ্য ভ্রমণ-সাহিত্য রচনা করেছেন। কিন্তু তাতে উচ্ছ্বাসের যেন বাহুল্য আছে। কলম্বসের কুমারী মৃত্তিকার সন্ধান অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু মোহাধিক্য ঘটলে দৃষ্টির স্বচ্ছতা কমতে বাধ্য। সম্প্রতি বেরুল আর একখানি সুন্দর ও শোভন ভ্রমণ-চিত্র, রানীচন্দের 'পূর্ণকুম্ভ'। মনোভাব অথবা দৃষ্টিভঙ্গী যতই সমালোচিত হোক্, এ বইয়ে তীর্থ আর যাত্রা, দুটোরই সাক্ষাৎ পরিচয় পাই। কেন না, খণ্ড খণ্ড দৃশ্য আর হরেক রকমের মানুষ একটি অখণ্ড দৃষ্টির উজ্জ্বল সূত্রে বাঁধা পড়েছে, অন্তর-সংবেদনায় যুক্ত হয়েছে। তবু বড় একটা ফাঁক এখনও রয়ে গেল রম্যসাহিত্যের এই বিভাগে। কোনও শক্তিমান্ দৃষ্টিবান্ লেখক এ দিকে নজর দিলে আমাদের ঘরকুনো অপবাদ দূর হয়, সাহিত্যেরও পুষ্টিসাধন হয়।

রম্য-রচনার আলোচনা-প্রসঙ্গে যে মতামত ব্যক্ত হল, তার ত্রুটি-বিচ্যুতি মার্জনীয়। যেহেতু আমরা সকলেই সাহিত্যপিপাসু, বিশেষ করে রস-সাহিত্যের। আমাদের রস-সাহিত্যে যে বিশেষ ধরনের শক্তি সঞ্চয় হয়েছে, এটা প্রমাণ করেছেন ক্ষমতাবান্ কয়েক জন লেখক তাঁদের সাধনা ও সৃষ্টি দিয়ে। তাই এই সাহিত্যবিভাগে বেশ একটি উচ্চ দরের মান নির্ণীত ও গৃহীত হয়েছে। সেই মানের বিচারে যদি প্রত্যাশা হয় তীব্র এবং দাবি হয় কিছুটা কঠোর, তাহলে সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাই হল একমাত্র কৈফিয়ত। রসসাহিত্যের বিশ্লেষণ ও মাননির্ণয় প্রসঙ্গে মনে পড়ছে নবেন্দু বসুর দু খানি গ্রন্থ—'কবিতার প্রকৃতি' ও 'রস সাহিত্য'। সম্প্রতি পরলোকগত এই

লেখকের অনুপ্রবিষ্ট দৃষ্টি ও সমালোচনার ধারা বোধ হয় এ জাতীয় রচনায় প্রথম প্রবর্তন। তাঁর প্রক্ষিপ্ত রচনাগুলি, বিশেষ করে, রস-বিচার আর ব্যক্তিগত প্রবন্ধগুলি যদি একত্র প্রকাশিত হয়, তাহলে দেখা যাবে—সাহিত্যিক দায়িত্ব সম্পর্কে তাঁর চেয়ে সচেতন বোধ হয় বেশি লেখক নেই। তিনি বরাবরই প্রচ্ছন্ন ভাবে সাহিত্য-সাধনা করেছেন, তাই তাঁর পরিচয় বিস্তৃত নয়। কিন্তু গুণজ্ঞ পাঠক জানেন, রম্যরচনায় তাঁর হাত কত মিষ্টি, আঙ্গিকের নিষ্ঠাবান চর্চা কত কৌশলী আর কাব্যের প্রসন্নতা ও উন্মীলিত দৃষ্টির আমেজটুকু কেমন সুন্দর ফুটে উঠেছে তাঁর লেখায়। আমার মনে হয়, একমাত্র তাঁরই রচনায় প্রকৃত বলেন্দ্র-ঐতিহ্য ও সুর পেয়েছে।

সাহিত্যের সালতামামি পেশ করা প্রীতিকর কাজ নয়, বিশেষ করে পাঁচশালা বন্দোবস্তের দিনে। তাই গত পাঁচ বছরের রম্য-রচনার হিসেব-নিকেশ করতে গিয়ে অনবধানতা এসে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। উল্লেখযোগ্য রচনারই উল্লেখ করতে হয় আর আপনাকে বাদ দিয়ে। তবু যদি কোনও বই বা লেখা নজরে না পড়ে থাকে, তাহলে সেগুলি তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। সাময়িক ও সাংবাদিক সাহিত্যে চপলতা ও মুখরতাই থাকে বেশি, আর তথাকথিত রস-রচনা অধিকাংশ সময়ে ধার-করা বেশভূষায় আসর মাত করতে চায়। এ সব জিনিস খিচুড়ি-জাতীয় এবং নকলিয়ানা। পাড়ার বৈঠকী রসিকতা যতই মারাত্মক অট্টহাসির রোল তুলুক, ওটা একেবারেই স্থূল। অতএব সাহিত্যে আমদানি না করাই ভালো। অবশ্য মানুষের অনেক চিন্তা, অনেক কর্মই স্থূল। সাংসারিক তুচ্ছতা আর দৈনন্দিন গ্লানি নিয়েই মানুষের জীবন এবং সে জীবন বাস্তব। তবু বিষয়ের স্থূলত্ব নিয়েও সূক্ষ্ম রসের কারবারী হওয়া যায়। কেবল প্রকাশে অথবা প্রয়োগে যেন স্থূলতা বা মালিন্য-দোষ না আসে—এটুকু দাবি সাহিত্যরসিক মাত্রই করতে পারেন।

সমালোচনা-সাহিত্যও রস-সৃষ্টি করতে পারে, যদি তাতে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে একটা গঠনমূলক প্রয়াস থাকে। অতএব রস-সাহিত্যের অঙ্গীভূত হতে তার কোনও বাধা নেই। মন্তব্যের চেয়ে মানুষ ও তার জীবন অবশ্য ঢের বড়। কিন্তু সেই মানুষ ও জীবনকে নিয়ে যে সাহিত্যের বিকাশ ও রূপায়ন, সেটাও নিতান্ত গৌণ নয়। সমালোচনায় রস-বিশ্লেষণ অনেক প্রকার হতে পারে,—শব্দ, ধ্বনি ও ভাষার ব্যবহার, প্রতীক-চিত্রের উদ্ভাবন, মনন ও কল্পনার সুমিত প্রয়োগ,—প্রভৃতি নানাদিক থেকে। কিন্তু যে বিবেচনা মুখ্য, তা হল এই-যে রসসৃষ্টির কাজে একটা সুনিশ্চিত মান ও স্তর বিশেষে আমরা এসে পৌঁছুতে পেরেছি কি না। তাই সকল আলোচনা ব্যক্তিনিরপেক্ষ একটা প্রকৃত সাহিত্যিক তথা সামাজিক মূল্য-বোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যে সব রচনা ব্যক্তিগত হয়েও সর্বজনীন রসের ভাণ্ডারী হয়ে রইল, তাদের সাধু প্রশস্তি জানাই। যেগুলি রসোত্তীর্ণ হতে চাইল কিন্তু অক্ষমতায় পারল না, সেগুলি সম্বন্ধে নীরব থাকাই উচিত। সাহিত্যে সত্যবস্তু সকলেরই কাম্য। বলা বাহুল্য, সত্য একটা বিভীষণ বিশেষণ নয়, নিরীহ বিশেষ্য মাত্র।

পাঁচ বৎসরের প্রবন্ধ-সাহিত্য

গোপাল হালদার

গত পাঁচ বৎসরের সাহিত্যের একটা হিসাব নেবার জন্য আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। কিন্তু 'পাঁচ বৎসর' এই অঙ্কটা কেন আমাদের নিকট এত সহজ-গ্রাহ্য হয়ে উঠল? এই কয় বৎসরে যা ঘটেছে তা ঘটেছে জাতির জীবনক্ষেত্রে—শাসনের পরিবর্তনে এবং বাঙালী সমাজের বিভাগে বিপর্যয়ে। যে কোনো জিনিসের হিসাব নিতে গেলেই কাল-বিভাগ করতে হয়। কিন্তু এই বিশেষ ধরনের কাল-বিভাগের মধ্য দিয়ে আমরা সহজ ভাবেই একটা কথা স্বীকার করি:—জাতীয় জীবনের পর্বান্তরে সাহিত্যক্ষেত্রেও কিছু না কিছু রূপান্তর ঘটে; অন্তত তা ঘটবার কথা।

সামাজিক জীবনের ছায়া সাহিত্যে পড়ে, এটা নতুন কথা নয়। বরং কোন্ বিশেষ সামাজিক সত্য সাহিত্য স্বীকার করে ও প্রকাশ করে, আর কি বিশেষরূপে তা সাহিত্যে প্রকাশিত হয়, এইটাই সাহিত্যের নতুন জিজ্ঞাসা। বাঙলা প্রবন্ধ-সাহিত্যেও এই পাঁচ বৎসরে এ জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছে। তার সংক্ষিপ্ত একটা হিসাব আজকে এখানে নিতে চাইলে আশা করি অসংগত হবে না। কারণ, প্রবন্ধ-সাহিত্যের বারো আনারই জন্ম সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে, সামাজিক প্রয়োজনে। অবশ্য এর বেশীর ভাগটাই সাংবাদিকতা। আরও ছ আনার উদ্দেশ্য শিক্ষকতা—যা রস-সাহিত্য নয়; কিন্তু তা বলে নিরর্থকও নয়। এই

ধরনের দান—বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, লোকশিক্ষা পরিষৎ, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষৎ ও বিজ্ঞান বিচিত্রার গ্রন্থমালা ; এবং স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার সুকুমার সেন, শশিভূষণ দাশগুপ্ত প্রমুখ অধ্যাপক ও গবেষকদের নানা গবেষণা। সরস, নীরস, নাতিসরস, নাতিনীরস জ্ঞানচর্চার এইসব ছোট বড় বিবিধ আয়োজনে সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ক্ষেত্র যে এই পাঁচ বৎসরে একটু বেশী আলোকিত হয়েছে তাতে কি সন্দেহ আছে ?

তা ছাড়া, এই পাঁচ বৎসরে আমাদের প্রবন্ধ-প্রান্তরের দুই প্রান্তে যে স্মৃতিকথার নহরের ও রম্যরচনার মরশুমী ফুলের বাহার দেখা দিয়েছে তাতে প্রবন্ধ সাহিত্যের রুক্ষতাও খানিকটা বিদূরিত হয়েছে। বিশেষ করে 'যাযাবর' সৈয়দ মুজতবা আলি প্রভৃতি লঘুহস্ত রসিকদের রচনার নতুন বর্ণচাতুর্য ও বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বাঙালী পাঠকের প্রবন্ধ-ভারপীড়িত মনকে অনুরঞ্জিত করেছে। অন্য পার্শ্বে অচিন্ত্যকুমারের পুরাতন বাগ্‌বিভ্রম ও নতুন ভক্তি-বিলাস পরাজিত আশাহত বাঙালী পাঠকের অশ্রুর সহজ উদ্বেলিত উৎসকে উচ্ছ্বসিত করে দিয়েছে। এর কোনো ধারাই নতুন নয়, কিন্তু নতুন করে এই লেখকেরা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, লেখাটাই যথেষ্ট নয় ; সাহিত্য হতে হলে প্রবন্ধেরও চাই—লিপিকুশলতা ও সরসতা। তথাপি প্রবন্ধ-সাহিত্য ফুলের বাগান নয়, ফলের বাগিচা, ফসলের ক্ষেত। প্রবন্ধে সর্বাগ্রে চাই বুদ্ধির ধার ও বিষয়ের ভার,—এ কথাটি বিস্মৃত হবার উপায় নেই। কারণ, বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরী বিস্মৃত হবার মত গ্রন্থকার নন। তাঁরা বাঙলা সাহিত্যকে বুদ্ধি-মণ্ডিত শ্রীতে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন।

এই বুদ্ধির আলোক অবশ্য বাঙলা সাহিত্যে নিবে যায়নি, যেতে পারে না। উল্টো বরং দেখা যায় যে কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বুদ্ধির দাবি একালে বর্ধিত, এমন কি স্পর্ধিতও। গত পাঁচ বছরের সাহিত্য-জিজ্ঞাসায়ও বুদ্ধিকে ছাপিয়ে বুদ্ধির ঔদ্ধত্য কম আত্মপ্রকাশ করেনি।

তা অবাঞ্ছিত হলেও একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়। কারণ, আমাদের সাহিত্য-জিজ্ঞাসা এতদিন ছিল বড় বেশী রকমের ভাববাদী। আমাদের পশ্চাতে আছে সংস্কৃত আলংকারিকদের সাহিত্য ব্যাখ্যা, বৈষ্ণব রসিকদের রসতত্ত্ব। তা পশ্চাতে রেখেই বাঙালীর সাহিত্য-জিজ্ঞাসা আধুনিক কালেও দুটি যুগ ইতিপূর্বেই উত্তীর্ণ হয়েছে। প্রথমটি ছিল বঙ্কিমের যুগ। এ যুগকে সাধারণ ভাবে বলতে পারি—'নীতিবাদী-ভাববাদের যুগ'। 'উত্তর চরিতে'র আলোচনায় বঙ্কিম অবশ্য বলেছেন—সাহিত্যের উদ্দেশ্য স্বভাবানুবর্তিতাও নয়, নীতিশিক্ষাও নয়, সাহিত্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্য সৃষ্টি। অর্থাৎ সাহিত্য স্বরাট, রিলিজিয়ন ও নীতির তাঁবেদার নয়। কিন্তু বঙ্কিমের সাধনা ছিল সংহিতাকারের সাধনা, নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শ স্থাপনের সাধনা। বঙ্কিমের প্রভাবে তাই সে যুগের সাহিত্য-জিজ্ঞাসা ও সাহিত্য-বিচার এই নীতিবাদী ভাববাদের পথে চলেছে।

তারপরে এলেন রবীন্দ্রনাথ। সাহিত্য-বিচারে ও সাহিত্য-জিজ্ঞাসায় তাঁর পরিচালনায় যে যুগ এল, তাকে সাধারণ ভাবে বলতে পারি রসবাদী ভাববাদের যুগ, সংক্ষেপে রসবাদের যুগ। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য সত্য শিব সুন্দরকে এক বই দুই বলে মানতেন না। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে তিনি জানতেন সুন্দরই শিব, সুন্দরই সত্য। সাহিত্য সেই সুন্দরের রাজ্য, সুন্দর সেখানে স্বরাট্। সৌন্দর্য-সৃষ্টির সেই জটিল রহস্যকে কবি নানা সময়ে নানা দিক থেকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তার বৈচিত্র্য ও গভীরত্ব বিস্ময়কর। তাই একটা মাত্র কথার লেবেল এঁটে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-জিজ্ঞাসাকে চিহ্নিত করা যায় না। তা সত্ত্বেও বলা চলে তাঁর মতে রসই কাব্যের আত্মা, রসের নিরিখই কাব্যের আসল নিরিখ। এই মূল কথাটি বাঙালীর চেতনায়ও কবি গেঁথে দিয়ে গিয়েছেন বললে ভুল হবে না। এর সঙ্গে সঙ্গে তাঁরই আলোচনা সূত্রে বাঙালীর সাহিত্য-চেতনায় আরও কয়েকটি ধারণাও গাঁথা হয়ে যায়—

আর্ট একটা হার্মোনি; সৃষ্টি একটা 'ক্রিয়েটিভ ইউনিটি', তা ব্যক্তি-স্বরূপের আত্ম-প্রকাশ, তা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আবিষ্কার, অদরকারের লীলা। ইত্যাদি।

এরূপ রসবাদের সঙ্গে অবশ্য 'আর্ট ফর আর্টস সেক'-এর মিল যেমন ছিল, অ-মিলও ছিল তেমনি গুরুতর। কারণ, 'আর্ট ফর আর্টস সেক' মূলত রূপ-সর্বস্বতাবাদ; আর রূপ ও রস এক জিনিস নয়। তা সত্ত্বেও বাঙলা-সাহিত্যক্ষেত্রে রসবাদের সঙ্গে সাধারণভাবে বিস্তার লাভ। করে 'আর্টের জন্য আর্ট' এই মতবাদও। রবীন্দ্রনাথের জীবন-নিষ্ঠা ও জীবন-বোধের পক্ষে এরূপ মতবাদ যথেষ্ট ছিল না, তাঁর সৃষ্টিতে ও সাহিত্য-জিজ্ঞাসাতেও স্থির জীবন-নিষ্ঠার ও গভীর জীবন-বোধের প্রমাণ সুস্পষ্ট। কিন্তু সে যুগের সাহিত্য-বিচার মোটের উপর এই স্পষ্ট প্রমাণও তত স্পষ্ট করে দেখে নি। জীবনের কোন্ অভিজ্ঞতা সাহিত্যে প্রকাশ পেল, সেই অভিজ্ঞতার মূল্য কী দিয়ে স্থির হবে, মূল্যই বা তার কী,—এ সব কথা নিয়ে বিশেষ আলোচনা তখন হত না। বড় জোর হত লেখার মধ্যে ব্যক্তিস্বরূপের সন্ধান ও বিচার। জীবন যেন সাহিত্যে গৌণ, অভিজ্ঞতা যেন উপলক্ষ, আর ব্যক্তিসত্তার বাইরেকার সমাজ-জীবন যেন একটা অবান্তর খোলস।

অন্যধারার সাহিত্য-বিচার যে তখনো ছিল না, তা নয়। শশাঙ্কমোহন সেনের একটি নিজস্ব ধারা ছিল; তার চেয়ে বেশি ছিল তাঁর নিজস্ব বাচন-ভঙ্গি। মোহিতলাল মজুমদার 'অবজেক্‌টিভিটি' বা তাদ্গত্যকে সাহিত্য-লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছেন; তাঁর বাচন-ভঙ্গিও ছিল ধূম-জ্যোতিঃসমাকুল। বিপিনচন্দ্র পাল ও রাধাকমল মুখোপাধ্যায় 'বস্তুতন্ত্রের' নামে হয় চেয়েছেন বঙ্কিমী বাঙালীয়ানা (ঐতিহ্যের দোহাই), নয় 'ন্যাচারালিজম্' বা বহিঃ-সাদৃশ্যবাদী বাস্তবতা। প্রমথ চৌধুরী ও কাজী আবদুল ওদুদ রবীন্দ্রচিন্তাধারার মানুষ হলেও সে যুগকে সমৃদ্ধতর করেছেন—তাঁদের বিশিষ্টতায় ও বৈদগ্ধ্যে। তথাপি মোটের উপর সে যুগকে রসবাদের যুগ বললে অন্যায় হবে না।

'আর্ট ফর আর্টস সেক্‌' তত্ত্ব হিসাবে আজ একটু বিগত-মহিমা। কিন্তু রসবাদ গত পাঁচ বৎসরের সমালোচনা-সাহিত্যে তার রাজত্ব খোয়ায় নি। কাজী আবদুল ওদুদ সৃষ্টিধর্মের ও ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যেরই বিকাশ সন্ধানে সন্তুষ্ট। 'কবিতা' পত্রে বুদ্ধদেব বসু রসবাদী দৃষ্টিতেই সাহিত্য-বিচার করেন। যাঁদের সমালোচনা ক্ষেত্রে কোনো মানদণ্ড নেই, তাঁরাও সহজভাবে এখনো রায় দেন রসের নামে,—কোনো লেখা 'রসোত্তীর্ণ' বা 'রসোত্তীর্ণ নয়' বলে। বরং সংস্কৃত রসবাদের নতুন করে প্রবর্তনও হয়েছে। 'সবুজ পত্রে' অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের 'কাব্য-জিজ্ঞাসা'তেই বাঙলায় তার প্রথম সূত্রপাত হয়। বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্যে, বক্তব্যের স্বচ্ছতায় 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' বাঙালী পাঠকের মন তখনই জয় করে নেয়। সম্প্রতি অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালীপদ ভট্টাচার্য 'ধ্বন্যালোক ও লোচনের' বাঙলায় অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। তাতে বাঙালীর পক্ষে রসবাদের সঙ্গে পরিচয় আরও সহজসাধ্য হচ্ছে। অধ্যাপক সুধীর দাশগুপ্ত 'কাব্যালোকে'ও আনন্দ-বর্ধনাচার্য ও অভিনব গুপ্তের কথাই চূড়ান্ত বিচার বলে স্থির করেছেন। 'কাব্যালোক' বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতম পরীক্ষায় ছাত্রদের পাঠ্যগ্রন্থ; রসবাদের সঙ্গে তাই সাহিত্যের ছাত্ররা পরিচিত হয়ে উঠবার কথা। অবশ্য ইতিমধ্যে নূতন সাহিত্য-জিজ্ঞাসা যে বাঙলা দেশেও উদিত হয়েছে 'কাব্যালোকে'র গ্রন্থকার তা লক্ষ্য করেছেন। এবং তা গ্রহণ করতে না পারলেও তার পরিচয়-গ্রহণে উদাসীন থাকেন নি।

বাঙলার এই তৃতীয় পর্বের সাহিত্য-জিজ্ঞাসাকে বলা হয়—বাস্তববাদী সাহিত্য-বিচারের যুগ, বা সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক বিচারের যুগ। বিজ্ঞান ব্যক্তিনিরপেক্ষ কিন্তু সাহিত্য-বিচার এতদিন পর্যন্ত ছিল নিতান্তই ব্যক্তিগত রসবোধের ব্যাপার। রসবাদী বিচারের শেষ কথা হচ্ছে এই যে, কাব্য 'সহৃদয়হৃদয়বেদ্য।' যে 'সহৃদয়' তার ভালো লাগে, যে 'সহৃদয়' নয় তার ভালো লাগে না। অর্থাৎ সাহিত্য ব্যক্তিগত ভালো লাগা-না-লাগার

ব্যাপার, ব্যক্তিগত শক্তি ও রুচির কথা। নৈর্ব্যক্তিক কোনো মানদণ্ড তাই সাহিত্যে থাকতে পারে না।

আধুনিক কালের সাহিত্য-জিজ্ঞাসু এই সংজ্ঞায় তৃপ্ত হবে কেন? এটা বিজ্ঞানের যুগ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মানুষ এখন শুধু বাহ্য বস্তুরই বিশ্লেষণ করে না, সামাজিক তথ্যেরও বিচার করে, মানসিক ব্যাপারেরও তত্ত্ব-সন্ধান করে। অন্যান্য মানব বিদ্যার ('হিউম্যানিটিজ') বেলায় যদি বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিক মানদণ্ড স্থির করা যায়, সাহিত্য-বিচারেই বা তবে সর্বজনস্বীকৃত মানদণ্ড পাওয়া যাবে না কেন—যদি সে জিজ্ঞাসা সত্যসত্যই চলে বিজ্ঞান-সম্মত খাতে? সাহিত্য-জিজ্ঞাসা ও সাহিত্য-বিচার তাই এ যুগে ফিরে এল নতুন বাস্তববাদী খাতে।

'ফিরে এল' বলছি; কারণ, বাঙলায় বাস্তববাদী সাহিত্য-চিন্তা নতুন হলেও পৃথিবীতে তা নতুন নয়। আসলে বাঙলায়ও একেবারে নতুন নয়। পাশ্চাত্ত্য জগতের সাহিত্য-চিন্তা-গুরু আরিস্টোটল। তাঁর মানদণ্ড তাঁর কালের, তাঁর সমাজের; তাকে নিছক ভাববাদী বলা চলে না। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জগতে তো রিনাইসেন্সের পর থেকে বাস্তববাদই প্রধানতম চিন্তারূপে গ্রাহ্য হয়েছে, অবশ্য ভাববাদের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব শেষ হয় নি এখনো। রিনাইসেন্সের পূর্বেও দেখি ইতিহাসে বাস্তববাদের সঙ্গে ভাববাদের দ্বন্দ্ব বরাবর চলছে। তখনকার যুগে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান প্রসার লাভ করে নি বিশেষ। মানুষ সর্বদিকে কল্পনা করত অলৌকিকের রাজত্ব। কিন্তু এই মানুষও জীবনের দায়েই বাস্তববাদী না হোক, ছিল বাস্তবপন্থী। কারণ, জীবন একান্তই বাস্তব। রিনাইসেন্সের পর থেকে সেই বাস্তবপন্থী মানুষ ক্রমশই হয়ে উঠেছে বাস্তববাদীও। তাতেই বিজ্ঞানেরও বিকাশ ঘটল। কিন্তু তখনো এই বাস্তববাদ ছিল প্রধানত 'জড়বাদ' বা 'যান্ত্রিক বস্তুবাদ'। (মিকানিষ্টিক মেটিরিয়ালিজম)। শিল্পে সাহিত্যে তার প্রকাশ দেখা যেত স্থূল, পঙ্কিল জীবন-যাত্রা বর্ণনায়, কিংবা বহিঃসাদৃশ্যবাদী বৈজ্ঞানিকতার ('ন্যাচারিলিজম)-এ

—যেমন দেখা গিয়েছিল জোলায়। নতুন বাস্তববাদ কিন্তু এই যান্ত্রিক পদ্ধতিকে মানে না।

এই নতুন বাস্তববাদ এল সমাজে একটি নতুন শ্রেণীর উদ্ভবে। সেই শ্রেণী হল শ্রমিক শ্রেণী। তাদের উদ্ভব, তাদের প্রসার ও তাদের পরিণতি তারা বুঝতে পারল ইতিহাসকে বাস্তব দৃষ্টিতে দেখে। তারা আবিষ্কার করলে সমাজ-বিবর্তনের বিজ্ঞান ও বিদ্যা ('সায়েন্স এণ্ড আর্ট অব সোশ্যাল ডেভেলাপমেণ্ট')। এই হল নতুন বাস্তববাদ। বাঙলা ভাষায় এর সামাজিক ও দার্শনিক বিচার যে সব গ্রন্থে পরিবেশিত হয় তার মধ্যে সরোজ আচার্যের 'মার্কসীয় দর্শন' ও 'মার্কসীয় যুক্তি-বিজ্ঞান', অমিত সেনের 'ইতিহাসের ধারা', এবং রেবতী বর্মনের 'সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধ সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাসে অগ্রাহ্য করবার মত গ্রন্থ নয়।

সাহিত্য বিচারের দিক থেকে আমাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য এই জীবন-দর্শনে সাহিত্যের রূপ কী, কিসে তার মূল্য, কোথায় তার স্থান। এ সব বিষয়ে আধুনিক বাস্তববাদের বক্তব্য সংক্ষেপে নিবেদন করা যেতে পারে।

সাহিত্যের মূল খুঁজতে গেলে শুধু ব্যক্তি-হৃদয়ে তাকালেই চলবে না, দেখতে হবে সমাজের রূপটাও, আর সমাজ হচ্ছে শ্রেণী-সংগ্রামে বিবর্তমান সমাজ। কারণ আমরা যাকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বলি জগৎ ও জীবনের এই বাস্তব পরিবেশেই তা উন্মেষ লাভ করে,—আকাশ থেকে তা পড়ে না। অবশ্য স্থূল বা যান্ত্রিক অর্থে শুধু মাত্র জীবন ও জগতের একটা যোগ-বিয়োগের ফলও মানুষ নয়। জীবন ও জগতের সে একটা সক্রিয় অংশীদার। প্রত্যেক মানুষই জন্ম থেকে—এবং জন্মের পূর্বে মাতৃ-জঠর থেকেই,—পরিবেশের সঙ্গে বাস্তব ও সক্রিয় সম্পর্কে সংযুক্ত। বাস্তবকে আপনার চেতনায় গ্রহণ করে করে একদিকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে বাস্তবের স্বরূপ বোঝে ;—জগৎ ও জীবনের উপরে সেই সূত্রে আপনার অধিকার সে বিস্তার করে—যেমন, ঘর বাঁধে, ফসল জন্মায়, প্রাকৃতিক শক্তি-

সমূহকে কাজে লাগায়। অন্য দিকে এই অধিকার অর্জনেরই উদ্দেশ্যে বাস্তব বোধের দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে মানস-শক্তিতে সে রচনা করে বাস্তবকল্প রচনা—তাই রূপ নেয় সাহিত্য, চিত্রকলা, নৃত্য, সংগীত প্রভৃতিতে। ‘তেল-নুন লকড়ির’ মত মানুষের আধিভৌতিক সৃষ্টি (মেটিরিয়াল ক্রিয়েশান্) ও সাহিত্য সংগীত কলা বা দর্শনের মত তার আধিমানসিক সৃষ্টি (স্পীরিচুয়াল ক্রিয়েশান) তাই একই সূত্রে বাঁধা, দুই-ই মূলত একটা সামাজিক সৃষ্টি প্রক্রিয়া। সাহিত্য যে অভিজ্ঞতার প্রকাশ, সে অভিজ্ঞতার মূল ও মূল্য দুই-ই তাই সামাজিক।

সাহিত্য ব্যক্তিত্বের আত্ম-প্রকাশ নয়, বরং সমাজ-সত্যের প্রকাশ—এ তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথও অগ্রাহ্য করেছেন, এমন নয়। “আমাদের ভাবের সৃষ্টি একটা খামখেয়ালি ব্যাপার নহে। ইহা বস্তু সৃষ্টির মতই একটা অমোঘ নিয়মের অধীন। এই অমোঘ নিয়মটি আবিষ্কারই বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য।” কি সেই নিয়ম? রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায়, “সম্মিলিত মানবের বৃহৎ মন, মনের নিগূঢ় এবং অমোঘ নিয়মেই আপনাকে কেবলি প্রকাশ করিয়া অপরূপ মানস-সৃষ্টি সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার করিতেছে।” (‘সাহিত্য-সৃষ্টি’, রবীন্দ্র রচনাবলী ৮ম খণ্ড-পৃ ৪০৫।৪১৪), সম্মিলিত মানবের এই বৃহৎ মন তার সামাজিক প্রয়াস ও জীবন-যাত্রার সঙ্গে জড়িত, আধুনিক বস্তুবাদী তা স্মরণ করিয়ে দেবেন!

এটা ঠিক, সাহিত্য-রচনা তা হলে শুধু ‘অকারণ পুলকে’ হয় না। নিশ্চয়ই আনন্দের জন্যই সাহিত্যের সৃষ্টি। কিন্তু আনন্দ তো মানুষ তাস খেলে, আফিম খেয়েও পায়। ওই প্রতিকল্প-উপলব্ধিতে ও শিল্পের আস্বাদনে মানুষ যে আনন্দ পায় তাতে তার চেতনা আচ্ছন্ন হয় না, সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে (হাইটেন্‌স্ হিজ্ কনশাস্‌নেস্)। চেতনার এই উজ্জীবনকে অন্যভাষায় বলা যায় রসাস্বাদন—যা ‘ব্রহ্মাস্বাদসহোদর’। কিন্তু বাস্তববাদী বলবেন, এ রস অলৌকিক নয়, অন্য কোনো রসও নয়; এ রস হচ্ছে জীবন-রস, মানব-মহারস। রসবাদের এই সার-সত্য বাস্তববাদের নিকট গ্রাহ্য।

এই আনন্দের ও মানস সৃষ্টির লক্ষ্য সামাজিক বিকাশ, সেই আধিভৌতিক সৃষ্টি। এবং এই জীবন-রসের সাধনার প্রারম্ভ—সমাজের সৃষ্টিশীল মানুষকে জানায়। চেনায়, বোঝায়, 'জীবনে জীবন যোগ করে' জীবনাস্বাদনে। এই দৃষ্টিতে তাই শিল্পসৃষ্টি জীবন-শিল্পায়নের ('আর্ট অব্ লাইফে'র) অঙ্গ। শিল্পীকে তাই বলা হয় 'ইঞ্জিনীয়ারস অব হিউম্যান সোল্'—(স্তালিন) 'মানবাত্মার কারুকৃৎ'। এই দিক থেকে দেখলে এই শিল্প-জিজ্ঞাসাকে নীতিবাদী না বলেও উপায় নেই। তবে শিল্পের এই নীতি হচ্ছে জীবন-নীতি, মানবতার নীতি, বিকাশ-ধর্মের নীতি। নীতিবাদের এই সার সত্যও বাস্তববাদের নিকট গ্রাহ্য। বাস্তববাদীর মতে শিল্পে তাই নৈরাশ্যের স্থান নেই; উদ্দেশ্যহীন শিল্প-বাদের মূল্য নেই; অসুস্থ রস-বিলাসেরও অনুমোদন নেই। জীবনের প্রতি মমতায়, মানবতার মহৎ আদর্শে, জনশক্তির প্রতি বিশ্বাসে শিল্প হবে প্রবুদ্ধ।

বাস্তববাদী সাহিত্য-বিচার তাই রহস্যের রাজ্য থেকে সাহিত্য ও শিল্পকে এনে দাঁড় করিয়েছে জীবনের রাজ্যে, সমাজ-সত্যের পাদপীঠে। সাহিত্যের মানদণ্ড-ও আর ব্যক্তিগত নয়; এ মানদণ্ড হল সমাজসত্য। লক্ষ্য করবার মত কথা তবু এই—রস ও নীতি কোনোটাই তা একেবারে অগ্রাহ্য করে নি। রহস্য থেকে মুক্ত করে তা অঙ্গীভূত করে নিয়েছে বাস্তববাদের মধ্যে।

'নেতি' 'নেতি' করেই নাকি সত্যের স্বরূপ বোঝা সহজ হয়। বাস্তববাদের পক্ষেও 'নেতি'-ভাষণের সূত্রেই এখনো আমাদের এই সাহিত্য-জিজ্ঞাসা বুঝতে হচ্ছে। কারণ, সাহিত্য-বিষয়ে বাস্তববাদী আলোচনা এখনো বাদ-প্রতিবাদের সোপান ভাঙছে। তার বক্তব্য ও বিচার এখনো পর্যন্ত 'পরিচয়ের' মত দু-একখানি মাসিক ও সাময়িক পত্রের পাতায় আবদ্ধ। এ প্রয়াসে যাঁরা অগ্রণী তাঁদের মধ্যে নীরেন্দ্রনাথ রায়ের নামই প্রথম উল্লেখযোগ্য। শেক্-সপীয়র, গেটে, রলাঁ থেকে উনিশ শতকের বাঙলার বঙ্কিম, মাইকেল পর্যন্ত দেশীয় ও বিদেশীয় সাহিত্য-স্রষ্টাদের কীর্তি তিনি এই বাস্তববাদী দৃষ্টিতে বিচারে যত্নশীল হয়েছেন; 'কবিতায় বক্তব্য' প্রভৃতি প্রবন্ধে তার মূল-তত্ত্বও

তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র, বারাণসীর মহেন্দ্র রায় ও ঋষি দাসও এদিকে অগ্রসর হয়েছেন, এবং সম্প্রতি অচ্যুত গোস্বামী ও ননী ভৌমিক এদিকে যথেষ্ট স্থির প্রয়াসের প্রমাণ দান করেছেন। এমন কি, এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই শিল্প-বিচারেও পদার্পণ করেছেন কবি বিষ্ণু দে, রবীন্দ্র মজুমদার, প্রভাত দত্ত প্রভৃতি শিল্পসমালোচকেরা।

সম্প্রতি কবি বিষ্ণু দে তাঁর বুদ্ধিতীক্ষ্ণ বিচারের কিছুটা উপহার দিয়েছেন 'সাহিত্যের ভবিষ্যৎ' নামক গ্রন্থের প্রবন্ধমালায়। অবশ্য বিষ্ণু দে দৃঢ়চিত্ত বাস্তববাদী হলেও একালের এলিয়টী ফর্ম্যালিজম-এ মুগ্ধ। আর বাস্তববাদী দৃষ্টিতে শিল্পে ও সাহিত্যে বিষয়বস্তুই (কন্‌টেন্‌ট) প্রাথমিক, রূপকলা (ফরম্‌) বিষয়ানুগ। ফর্ম্যালিজম্‌ বা আঙ্গিক-সর্বস্বতা তাই সাহিত্যে এক জাতীয় ক্ষয়িষ্ণু চেতনারই প্রমাণ। দ্বিতীয় আর এক ধরনের স্থূল বাস্তববাদ দেখা যায় শ্রীযুক্ত অরবিন্দ পোদ্দারের 'বঙ্কিম-মানস' প্রভৃতি আলোচনায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের দ্বারা তা 'মার্কসবাদ' বলেও সম্বর্ধিত। কিন্তু এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে টেইন-এর ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস আর পড়ানো হয় না। না হলে অধ্যাপক মহাশয়েরা বুঝতেন—সে আলোচনা আসলে পরিবেশ-বাদ ('এনভাইরেনমেণ্টালিস্ট')। যে আলোচনায় শ্রেণী-চরিত্র বিচারের নাম-গন্ধও নেই, তা আর যাই হোক মার্কসবাদ নয়। মার্কসবাদ ওরকম পরিবেশ-বাধ্যতাবাদ বা নিয়তিবাদও মানে না। তৃতীয়, এক মতের বাস্তববাদীরা রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিলেন,—যেহেতু তা মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর সৃষ্টি, এবং তাতে কৃষক-বিদ্রোহের ঘোষণা নেই। এ বিচারকে মার্কসবাদীরা বলবেন ইতর-মার্কসবাদ (ভালগার মার্কসিজম্‌), বা যান্ত্রিক বাস্তববাদ। অবশ্য বাস্তববাদী-মহলে সাধারণত যে ভ্রান্তি বেশি দেখা যায় তা হচ্ছে ন্যাচারালিজম্‌ বা বহিঃসাদৃশ্যবাদী বৈজ্ঞানিকতা—'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং'-জাতীয় বহিঃসাদৃশ্যবাদ। অথবা মনে করা যে বিষয় সত্য হলেই হল, রূপায়ণ বুঝি নিতান্তই গৌণ ;

অর্থাৎ বাস্তব সাহিত্যের বুঝি সাহিত্য না হলেও চলে। তা যদি হত, তা হলে লেনিনই হতেন শ্রেষ্ঠ শিল্পী, গোর্কি-টলস্টয়ের নাম না করলেও চলত। এরূপ বিভ্রান্তি বশেই বাস্তববাদী সাহিত্য বিচারেও দেখা যায় প্রকাশ-নৈপুণ্যের অভাব, বক্তব্যের অস্পষ্টতা। কিন্তু প্রবন্ধ-সাহিত্যও সাহিত্য। সাহিত্য-জিজ্ঞাসাই বা তা হলে সরস হবে না কেন? প্রসাদগুণ না থাকলে কোনো লেখাই সাহিত্য বলে গ্রাহ্য হবে না।

প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রধান আশ্রয় বিষয়ের গৌরব ও বুদ্ধির দীপ্তি—তা আমরা দেখেছি। কিন্তু শুধু তা-ও যথেষ্ট নয়—এ কথাও তাই বুঝবার মত। আনাতোল ফ্রাঁসের মতে ফরাসী গদ্যের নাকি তিনটি ছিল প্রধান গুণ:—প্রথমত, স্বচ্ছতা; দ্বিতীয়ত, স্বচ্ছতা; আর সর্বশেষেও, স্বচ্ছতা। এটা 'পঞ্চ-বার্ষিক সংকল্পের' যুগ। আমরা বাঙলা প্রবন্ধ-সাহিত্যে কি আগামী পাচ বৎসরের জন্য কামনা করতে পারি না এমনিতর তিনটি গুণের চর্চা?—বিষয়ের ভার, বুদ্ধির ধার ও বাক্যের স্বচ্ছতা॥

পূর্ব বাংলার সাম্প্রতিক প্রবন্ধ-সাহিত্য

কাজী মোতাহার হোসেন

যে-কোনো সাম্প্রতিক বিষয় আলোচনা করে তার সঠিক পরিচয় দেওয়া স্বভাবতই কঠিন। কারণ, আমরা যার মধ্যে লিপ্ত থাকি তার সমগ্ররূপ দেখতে পাইনে। আমাদের সংস্কার, স্বার্থবোধ প্রভৃতি নানা বিষয় একত্র জড়িত হয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টির ব্যাঘাত জন্মায়। তা ছাড়া অনেক বিষয় এমন আছে যার ইঙ্গিত প্রথমে প্রচ্ছন্ন থাকে, পরে ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পায়। সে স্থলে ভবিষ্যতের পুর্বাভাসে অনেক সন্দেহের অবকাশ থাকে। এসব জেনে শুনেও ঐতিহাসিক সর্বদাই ঘটনার বিশ্লেষণ করে তার ভবিষ্যৎ গতি সম্বন্ধে কিছু আভাস দিয়ে থাকেন।

সাম্প্রতিক প্রবন্ধ-সাহিত্যের উপর প্রবন্ধ লিখতে গেলে ঐতিহাসিকের দায়িত্ব নিয়েই লিখতে হয়। এর জন্য সম্পূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে তার সম্যক আলোচনা করা দরকার। কিন্তু সময় আর অবসরের অভাবে তা করতে পারিনি। প্রবন্ধের বই অল্পই প্রকাশিত হয়। একে তো, অধিকাংশ লেখকই প্রবন্ধ লেখেন কম, তার উপর প্রবন্ধ-পুস্তকের খরিদ্দারের অভাব। তাই তথ্য সংগ্রহ করতে হলে মাসিক, দৈনিক বা অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার উপরই প্রধানত নির্ভর করতে হয়। সব সাময়িক পত্র, এমনকি তার মধ্যে প্রধান প্রধানগুলোও যোগাড় করা বেশ কঠিন।

আমি 'মোহাম্মদী', 'দিলরুবা', 'দ্যুতি', 'ইমরোজ', 'মাহে-নও', 'নওবাহার' 'বেগম', 'সওগাত', 'সৈনিক' এবং 'আজাদ' মিলিয়ে মোট পঞ্চাশ-ষাটখানা পত্রিকা যোগাড় করে প্রবন্ধ লেখক এবং তাঁদের লেখার লিস্ট করেছিলাম। ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, দিনাজপুর, সিলেট, রাজসাহী প্রভৃতি মফঃস্বল শহর থেকেও কয়েকখানা কাগজ বের হয়, সেগুলো ব্যবহার করবার সুযোগ পাইনি। তবু, আশা করি উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিকদের মধ্যে শতকরা নব্বই জনই উল্লিখিত পত্রিকার কোনো না কোনটাতে প্রবন্ধ লিখে থাকেন। এখানে প্রবন্ধকারদের নাম বা তাঁদের লিখিত প্রবন্ধের তালিকা দিতে চাইনে। তার বদলে, কেবল মোটামুটি বিষয়বস্তুর সংখ্যাঘটিত বিবরণ দিয়েই বর্তমানে পূর্ববাংলার প্রবন্ধ-লেখকদের মনের গতি কোন্ দিকে তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করছি।

কিন্তু তাতেও মুশকিল আছে! একে তো, প্রবন্ধ নানান রকমের হয়। সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব, রস-রচনা ও সমালোচনা; ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রবন্ধ; শিক্ষা, ভাষা, হরফ ও পাঠ্য-সমস্যা; চিত্রকলা; নাট্যকলা; শিশু-সাহিত্য, লোক-সাহিত্য, পুঁথি-সাহিত্য প্রভৃতির আলোচনা; ধর্ম, দর্শন, ঐতিহ্য, অনুবাদ, গবেষণা—এ সবই প্রবন্ধ সাহিত্যের মধ্যে পড়ে। অবশ্য তা 'সাহিত্য' হওয়া চাই। কিন্তু বিষয়বস্তুর পার্থক্যে সাহিত্যের মাপকাঠি বদলায়। অথচ কিভাবে কতোটুক বদলায় তার কোনোও ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সর্বগ্রাহ্য মাপকাঠি নাই।

দ্বিতীয়ত, উপরে যে সব রকমারি কথা বলা হল, তা আবার পরস্পর সংশ্লিষ্ট। শ্রেণী বিভাগ করতে হলে যে কোনও রচনা নিঃসন্দেহে কোন বিশেষ শ্রেণীতেই পড়া আবশ্যক। এজন্য অনেক স্থলেই কিছুটা আপোষ করতে হয়। উদাহরণ দিলেই কথাটা আরও পরিষ্কার হবে। ধরুন, একটি প্রবন্ধের নাম "জ্যোতির্বিদ্যায় মুসলিম প্রভাব"—প্রবন্ধটা কি বৈজ্ঞানিক, না ধর্মীয়, না বিশুদ্ধ গবেষণামূলক? আর একটা প্রবন্ধ—যেমন

"ফ্রান্সে মুসলিম প্রভাব"—এটি কি ঐতিহাসিক না দার্শনিক, না ধর্মীয় ? অথবা "নজরুল কাব্যে তৌহিদ"—এখানে কি নজরুল কাব্যের আলোচনাই প্রধান না তৌহিদের ব্যাখ্যা বা তার পরিপোষক উদাহরণই প্রধান ? এইভাবে 'ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র'—এটা কি ইসলামিক শরিয়তের ব্যাখ্যা—না মুসলিম সমাজপতি ও রাষ্ট্রপতিদের বাস্তব কর্মপন্থার পরিচয় ? মোটের উপর লেখকের মনের প্রবণতা কোন্ দিকে এবং কোন দিকে তিনি বেশী জোর দিয়েছেন—তার উপর নির্ভর করছে প্রবন্ধের আসল প্রকৃতি।

আর এক ধরনের উদাহরণ দেওয়া যাক। "আধুনিক ইরাকী সাহিত্য", "অতীত ও বর্তমান তুরস্ক", "আরব রসায়নের উৎস"—এ সবের সঙ্গে বাংলার সাধারণ পাঠকের সম্পর্ক অবশ্যই গৌণ। তবে কি এগুলো নিতান্তই জীবনসম্পর্কচ্যুত পণ্ডিতী আলোচনা ?—তাও নয়। বাংলার মুসলমান সমাজকে (উভয় বাংলার কথাই বলছি) ব্রিটিশ আমলে শিক্ষা, সংস্কৃতি, উচ্চপদ, ব্যবসায়-বাণিজ্য, ধন-দৌলত, মান-সম্ভ্রম সব খুইয়ে অতীতের দিকে চেয়েই সান্ত্বনা খুঁজতে হয়েছিল। তাই তারা বড্ড বেশী অতীতের দোহাই পাড়তে বাধ্য হয়েছে। বঙ্কিমী যুগে বা হিন্দুত্বের নব জাগরণের দিনে গোটা হিন্দু সমাজেও এই অতীতমুখী মনোবৃত্তির প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। আজও হিন্দুসমাজ ইউরোপকে আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা দেবে বলে স্পর্ধা করে থাকে। তবু গরিব যদি ধনী আত্মীয়ের বা পূর্ব পুরুষের গুণকীর্তনে একটু আধিক্যই করে থাকে, তবে তা যতটা উপহাসের বিষয়—তার চেয়ে অনেক বেশী করুণ। তাই ব্রিটিশ-শাসিত বাঙালী মুসলমানের পক্ষে আরব, ইরাক, ইরান, মিশর, স্পেনের দিকে তাকিয়ে ঐ সব দেশের গৌরব আত্মসাৎ করবার প্রয়াসকে অস্বাভাবিক বলা যায় না। কিন্তু অস্বাভাবিক এই যে, তাদের বাড়ির কাছে যে গঙ্গা যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, হিমালয় আপন মহিমায় বিরাজ করছে, কিংবা যে চামেলী, গন্ধরাজ, শিউলী, কুমুদ, পদ্ম নীরব সৌন্দর্যে ফুটে রয়েছে, এ দিকে তাদের দৃষ্টি নেই।

এগুলো যেন হেলায় হিন্দুকে বিলিয়ে দিয়ে এরা তাকিয়ে আছে নীল দরিয়া, ফোরাত, আলবুর্জ, অথবা বাসরাই গুল, রায়হান, হেনার দিকে। এই করুণ অবস্থার জন্য তাদের স্বদেশে পরবাসীর মনোভাব দায়ী, তাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু অতীতে সমৃদ্ধশালী প্রতিবেশী হিন্দুর সহানুভূতিহীন তাচ্ছিল্যও যে কতকটা দায়ী নয়, এ-কথা কে বলবে ?

যা হোক, অতীতে যা হয়ে গেছে তা নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নাই। আজ ব্রিটিশ অধিকার চলে গেছে—ভারত আর পাকিস্তান জন্ম নিয়েছে। কিন্তু সাধারণ লোকের মনোবৃত্তি মোটামুটি একই রয়ে গেছে। এতদিনের অভ্যেস বদলাতে সময় লাগবে। আশা করা যায়, পুর্ব বাংলার মুসলমান অচিরেই নিজেদের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দাঁড়াতে পারবে। তখন হয়ত আরব, ইরান, কাবুল, তুর্কীই পাকিস্তানকে ধনী আত্মীয় বলে লুফে নেবার জন্যে ব্যগ্র হবে।

তার জন্য যে-সাধনার দরকার, পুর্ব-বাংলার এ যুগের সাহিত্যিকেরা তার গতি নির্ধারণ করবার চেষ্টা করছেন। এ চেষ্টায় প্রথম প্রথম ভুলত্রুটি হবে, পরে শোধরাতে শোধরাতে উপযুক্ত পথের সন্ধান নিশ্চয় মিলবে। অতীতের সঙ্গে বা পরিবেশের সঙ্গে সম্বন্ধ অস্বীকার করে কেউ কখনো কোনোদিন বড় হতে পারে না। তাই আজ ইসলামী দৃষ্টির মূল উৎস কোরান হাদিসের দিকে স্বভাবতই দৃষ্টি পড়েছে। আজ সব দেশের মুসলমান রাজা বাদশারা ইসলামের যে ঐতিহ্য রেখে গেছেন, তারও খোঁজ পড়েছে। সেই সঙ্গে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আপন পরিবেশের দিকেও তরুণ সাহিত্যিকেরা তাকাচ্ছেন। তাঁরা বৃহৎ জনগণকে আর উপেক্ষা করে এড়িয়ে যাচ্ছেন না। এ যুগের বাঙালী মুসলমানের পক্ষে এটিকে দ্বিতীয় সাহিত্যিক জাগরণ বলা যায়। প্রথম জাগরণ আরম্ভ হয় মীর মোশার্‌রফ হোসেন, ইসমাইল হুসেন শিরাজী, কায়কোবাদ, পণ্ডিত রিয়াজ উদ্দীন, মোজাম্মেল হক, রওশন চৌধুরী প্রভৃতির চেষ্টায়, উনবিংশ শতাব্দীর শেষাধে। তারই জের চলে নজীবউদ্দৌলাহ,

আকরাম খাঁ, শহীতুল্লাহ, ইয়াকুব চৌধুরী, লুৎফর রহমান প্রভৃতির ভিতর দিয়ে। নজরুল ইসলামের ভিতর দিয়েই সর্বপ্রথম মুসলিম সাহিত্যের আত্মপ্রত্যয় জন্মে। পরে জসীমউদ্দীন, কাজী আব্দুল ওদুদ, হুমায়ুন কবির, ওয়াজেদ আলী প্রভৃতি রথীদের দ্বারা ভাবের সম্প্রসারণ ঘটে। পাকিস্তান গঠনের কিছুদিন আগের থেকে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘের সাহচর্যে বাংলার তরুণেরা গণচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়। তবু, একথা মানতেই হবে যে, যুক্ত বাংলায় বিরাট মুসলমানসমাজ সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য স্বীকৃতি পায়নি। এর জন্য হিন্দুর চেয়ে মুসলমান সাহিত্যিকেরাই বেশী দায়ী তা-ও অস্বীকার করার যো নেই। আশা হয় বাংলা সাহিত্যের এই ত্রুটি বিশেষ করে পুর্ব-বাংলার তরুণ সাহিত্যিকদের চেষ্টাতেই সংশোধিত হয়ে হিন্দু মুসলিম উভয় সংস্কৃতির ধারায় এক বীর্যবান নতুন বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠবে।

ভাল কথা, প্রবন্ধের শ্রেণী বিভাগের কথা হচ্ছিল। অনেক কাট-ছাঁটের পর পুর্ব-বাংলার সাম্প্রতিক প্রবন্ধ-সাহিত্যকে পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করে মোট দেড়শ' প্রবন্ধের মধ্যে কয়টি কোন শ্রেণীতে পড়ে তার একটা ফিরিস্তি তৈরী করেছিলাম। যথা: ১ম শ্রেণী—ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্রনীতি (প্রবন্ধসংখ্যা ২০); ২য় শ্রেণী—মুসলিম ঐতিহ্য (প্রবন্ধসংখ্যা ৩০); ৩য় শ্রেণী—ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিক্ষা (প্রবন্ধসংখ্যা ২৫); ৪র্থ শ্রেণী—সাহিত্য, সমাজ, সমালোচনা, গবেষণা, অনুবাদ (প্রবন্ধসংখ্যা ৪৫); ৫ম শ্রেণী—শিশু সাহিত্য, লোক সাহিত্য, রস-রচনা, আর্টঘটিত প্রবন্ধ (প্রবন্ধসংখ্যা ৩০)।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, শ্রেণীগুলো এ রকম মিশ্র করবার কারণ কি? জওয়াব এই যে, যেগুলোর মধ্যে নিকট সম্পর্ক আছে সেগুলোকে এক পর্যায়ে ফেলা হয়েছে, যাতে কোন বিশেষ প্রবন্ধের স্থান নির্ণয়ে অনিশ্চয়তা কম হয়। প্রথম শ্রেণীতে ধর্ম ও দর্শনের সঙ্গে "রাষ্ট্রনীতি" অনেকের কানে বেখাপ্পা লাগতে পারে। কিন্তু এর কারণ এই যে, ইসলাম ধর্মে ব্যাপকভাবে জীবনধারণের সমস্ত প্রধান প্রধান দিকেই—শুধু নীতির ক্ষেত্রে নয়, ব্যবহারিক

ক্ষেত্রেও,—জোর দেওয়া হয়েছে। তাই রাষ্ট্রনীতি ইসলামিক স্টেটে ধর্ম নিরপেক্ষ নয়। এখানে কিন্তু ধর্মের অর্থ—অধর্মের উল্টো। অর্থাৎ রাষ্ট্রও ন্যায় বিচার এবং সমদর্শিতার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। আমার বিশ্বাস, যদি নামের নেশা না থাকত, তা হলে একে সমদর্শী বা সম-অধিকার মূলক রাষ্ট্র বলা চলত। তাহলে কতকগুলো অনাবশ্যক কৈফিয়তের দায় এড়ানো যেত, অথচ কার্যত অবস্থার কোনো ব্যতিক্রম হত না। একথা বলবার কারণ এই যে, ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশের বাসিন্দারই মনোজীবনে অর্থাৎ ভাবজীবনে ধর্মই বোধহয় সবচেয়ে গুরুতর প্রভাব। অবশ্য ধর্ম বলতে এঁরা ধর্মের মূল মর্মের চেয়ে অন্ধ অনুবর্তিতাই বেশি করে বুঝেছেন। ফলত এখানে Secular stateও ধর্মীয় রাষ্ট্র, আবার শরীয়তী স্টেটও ধর্মনিরপেক্ষ (নীতিমূলক) রাষ্ট্র।

মুসলিম ঐতিহ্য বলে একটা আলাদা শ্রেণী স্বীকার করা হয়েছে। এর কারণ আগেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। "তুরস্কের রাজনৈতিক বিবর্তন", "সিসিলিতে মুসলিম প্রভাব", "ইসলামের সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রতিভা"—এই ধরনের প্রবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য, ইসলামের ঐতিহ্য কোথায় কি রূপ নিয়েছে তাই দেখানো। এই শ্রেণীর প্রবন্ধের সংখ্যাও তিরিশ। সুতরাং এগুলোকে একটা স্বতন্ত্র শ্রেণীভুক্ত করা বোধ হয় অন্যায় নয়।

ইতিহাস, বিজ্ঞান, শিক্ষা—এ সব নিয়ে মনোজ্ঞ সাহিত্য রচনা করা কঠিন। তবু জাতীয় প্রয়োজনে যে সব আলোচনার উদ্ভব হয়েছে, এবং অনেক লোকে যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে তাকে অ-সাহিত্য বলে ঠেকিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না। প্রবন্ধের অন্যতম গুণ—প্রসাদগুণ—অর্থাৎ অব্যর্থ শব্দ চয়ন করে নিজের মনের কথা পরিষ্কার ভাবে অন্যের মনের দরজায় পৌঁছিয়ে দেওয়া। অধিকাংশ রচনাই এই বিচারে উৎরে গেছে। ভাষা সমস্যা, হরফ সমস্যা, ব্যাকরণ সমস্যা, শিক্ষকদের বেতন সমস্যা, ছাত্রদের নকল সমস্যা, শিক্ষানীতি প্রভৃতি বিষয়ও অবশ্য এই পর্যায়ে পড়েছে। সাহিত্য,

সমাজ, সমালোচনা, গবেষণা, অনুবাদ—এই পাঁচমিশালি জিনিসকে একটি শ্রেণীতে ফেলা হয়েছে। 'সাহিত্য' বলতে 'রবীন্দ্রকাব্যে জীবন-দেবতা', 'বার্ণাড শ', 'ইবসেন', 'অসূয়া',কে ঐ রকম কতকটা বিশুদ্ধ (?) সাহিত্য ধরা হয়েছে। সমাজ, সমালোচনা, গবেষণা, অনুবাদ প্রভৃতির অর্থ সুস্পষ্ট। তবে কোরাণ হাদিসের অনুবাদ বা ঐ সব বিষয়ের প্রবন্ধ ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই শ্রেণীর প্রবন্ধের সংখ্যা পয়তাল্লিশ। হয়তো সমাজমূলক বিষয় আলাদা করা যেত। কিন্তু সমাজ নিয়েই ত সাহিত্য। কাজে কাজেই কোনটা 'সাহিত্য' আর কোনটা 'সমাজ' তা নিয়ে গোল বাঁধবার প্রবল সম্ভাবনা থাকত।

শিশু সাহিত্য, লোক সাহিত্য, রসরচনা আটঘটিত প্রবন্ধ একসাথে রাখা গিয়েছে। হাস্যকৌতুক, ব্যঙ্গরচনা, সরস আলোচনা, পুঁথি সাহিত্য এবং সিনেমা, নাট্যমঞ্চ ইত্যাদি বিষয়ে লিখিত প্রবন্ধ এই পর্যায়ে স্থান পেয়েছে। মোটের উপর এই তালিকা থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে পুর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যিকেরা চোখ মেলে চেয়েছেন। অবশ্য, পর্যাপ্ত সৃষ্টি এখনও হয়নি। এবং দৃষ্টির স্বচ্ছতার অভাবে হয়তো নিখুঁত সৃষ্টিও কমই হয়েছে, কিন্তু মনের আকুলি-বিকুলির সৃষ্টি-আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

এখানে পুর্ববাংলার সাহিত্যের গতি বা বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে দুয়েকটা কথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এ সম্বন্ধে কয়েক জন চিন্তানায়ক আগেও মতামত প্রকাশ করেছেন। তবু হয়তো পুনরুক্তি চলতে পারে। তাই আমি সাধারণ দুই একটা কথা নিবেদন করব। প্রথম কথা বিশেষ ভাবে বাধাগ্রস্ত না হলে সাহিত্যিক তাঁর রচনায় নিজের মনের ছাপই প্রকাশ করে থাকেন। সেই অসংকোচ প্রকাশই স্বাভাবিক, আর স্বাভাবিকতা সুন্দর সৃষ্টির একটা লক্ষণ। বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, মীর মোশার্‌রফ, নজরুল প্রত্যেকের লেখায় বিশেষত্ব রয়েছে। সে বিশেষত্ব ভাবে, ভাষায়, মানসিক গঠনে, জীবনের মূল্যবোধে। সকলের লেখাতেই পারিপার্শ্বিকের ছাপ সুস্পষ্ট,

কিন্তু এর চেয়েও আরও গভীর ছাপ রয়েছে ঐতিহ্যের। ঐতিহ্যকে বলা যেতে পারে এমন এক পারিপার্শ্বিক যা বহুযুগের অভ্যাসের ফলে একেবারে আত্মস্থ বা হজম হয়ে গেছে। হয়ত রক্তকণিকা বা জীব-কোষের গঠনেও তার প্রভাব পড়েছে। এই ঐতিহ্যকে চাপা দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি চলে না। হিন্দু মুসলিম এই দুই বৃহৎ সমাজের ঐতিহ্য যে কেবল ধুতি চাদর নামাবলী-টিকি বা লুঙ্গি-আচকান-টুপি-দাড়ির মধ্যেই আছে তা নয়। তাদের মানসিক কাঠামোর পার্থক্যেও রয়েছে। অবশ্য, মিলও রয়েছে প্রচুর। মানুষে মানুষে মিল তো থাকবেই। হৃদয়বৃত্তিতেও বোধ হয় পনেরো আনা মিল আছে। এই মিল ভাষা, রীতি-নীতি, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, অর্থনৈতিক অসাম্য প্রভৃতির ভিতরও স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। তাইতেই তো সার্বজনীন সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়। নইলে এক দেশের সাহিত্যের আদর অন্য দেশে কখনোই হতে পারত না।

কিন্তু অমিলও যে রয়েছে তা অস্বীকার করে লাভ নেই। সাহিত্য সার্বজনীন হবে, কিন্তু বিশিষ্ট পরিবেশকে আশ্রয় করেই হবে তার প্রকাশ। এই পরিবেশটুকুর জন্যই সাহিত্য রূপ পায় আর রূপের বাস্তবতার উপরেই ভাবের রঙ উজ্জ্বল হয়ে ফোটে।

এই সাধারণ কথা মনে রেখে যদি আমরা বিভাগ-পূর্ব বাংলার সাহিত্যের দিকে তাকাই, তা হলে দেখতে পাব, মোটের উপর এ সাহিত্যের বেশির ভাগই একটা বিশেষ শ্রেণীর মানসিক বিলাসের ক্ষেত্র। এর অবশ্য কারণ আছে। যাঁরা সাহিত্য সৃষ্টি করেন, বা সাহিত্য বিচারের তুলাদণ্ড যাঁদের হাতে থাকে, তাঁদের মনোমত সাহিত্যই সৃষ্ট হয় ও স্বীকৃতি পায়। বিগত ২০।৩০ বছর যাবৎ এর একটা প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়েছে। সমাজের নিম্নস্তরের দিকেও অনেক দুঃসাহসিক তরুণের দৃষ্টি পড়েছে। মনে রাখবেন, এই তরুণদের অনেকেই এখন প্রৌঢ়। এখানে বয়সের তারুণ্যের চেয়ে মানসিক তারুণ্যের কথা ভেবেই 'তরুণ' শব্দটা প্রয়োগ করেছি। তবুও এদের

অধিকাংশই হিন্দুশ্রেণীভুক্ত হওয়ায় এবং দুর্ভাগ্যক্রমে বৃহৎ মুসলিম সমাজের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতা আশানুরূপ দৃঢ় না হওয়ায় বাংলা সাহিত্য মোটামুটি হিন্দু ঐতিহ্যেরই বাহন হয়ে রয়েছে। মুসলিম লেখকের আত্মপ্রত্যয়ের অভাব বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁদের অবহেলা এবং শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠায় তাঁদের পশ্চাদ্বর্তিতা যে এর জন্যে বিশেষ ভাবে দায়ী তাতেও বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বিশেষ করে এই কারণেই হিন্দুদের মতো দূরে থেকে, অনেক শিক্ষিত মুসলমানও মুসলিম ঐতিহ্যের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত নন। এঁরা এ ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন উর্দু ওয়ালা ভাইদের উপর। তাঁরা মাল সরবরাহ করবেন—আর এঁরা গলাধঃকরণ করবেন, এই ছিল প্রথা। কিন্তু এঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে একমাত্র মাতৃভাষার সাহায্যেই স্বাভাবিক ভাবে (এবং সম্মানজনকভাবে) জাতীয় সংস্কৃতি-বোধ জন্মাতে পারে।

সুখের বিষয় পূর্ববাংলার তরুণগণ আজ সে ত্রুটির বিষয় অবহিত হয়েছেন। তাই আজ বাংলা ভাষার মাধ্যমে কোরান হাদিসের তর্জমা হচ্ছে, আউলিয়া দরবেশের কাহিনী লিখিত হচ্ছে, মুসলিম ঐতিহ্যের খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। এই কারণেই আগে দেখেছেন সমুদয় প্রবন্ধের এক তৃতীয়াংশই ধর্ম এবং ঐতিহ্যমূলক। জোর করেই বলা যায়, বাংলা ভাষা সম্বন্ধে পূর্ববাংলার তরুণদের আত্মীয়তাবোধ পশ্চিম বঙ্গীয় ভ্রাতাদের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। এর প্রমাণ এঁরা জীবনদান করেও দেখিয়েছেন। এঁরা যখন ধর্মীয় বিষয়গুলো বাংলা ভাষায় প্রকাশ করবেন, তখনই দেশের সর্বসাধারণের সত্যিকার ঐতিহ্যবোধ জন্মাবে। তখন বলিষ্ঠ আত্মচেতনায় পূর্ববঙ্গীয় মুসলিম সমাজের এক নবযুগ সূচিত হবে।

ভাবার আঙ্গিকের দিক দিয়ে প্রথম প্রথম কিছু আতিশয্য হতে পারে বৈকি। কিন্তু তা নিশ্চয়ই সহনীয়। ক্রমে ক্রমে, অবশ্য, ব্রেককসা গাড়ির মতো যথাস্থানে এসেই এর গতি নিঃশেষিত হবে। তখন বাড়াবাড়িটা মসৃণ হয়ে যাবে। আবার কোনো কোনোটা হয়তো বাড়াবাড়ি বলে মনেই হবে

না। এখানে বিশেষ করে শব্দচয়নের কথাই ইঙ্গিত করছি। বাংলা ও
শতকরা কয়টা আরবী, ফার্সি, উর্দু, হিন্দী, ইংরেজী শব্দ আজ থাকবে
হিসাব করে কখনও সাহিত্য রচনা করা যেতে পারে না। শিল্পীর
স্বাভাবিকভাবে যা আসে আসুক, তাই টিকবে। অস্বাভাবিকভা
আসবে তা আবর্জনার মতো অনায়াসে ধুয়ে মুছে যাবে। এজন্য
ঘাবড়াবার কারণ নেই। অন্য ভাষার থেকে প্রয়োজনমত শব্দ গ্রহণ করে
জীবন্ত ভাষার ঐশ্বর্য বাড়ে। রামমোহনের ভাষা থেকে বিদ্যাসাগরের
বঙ্কিমের ভাষা, রবীন্দ্রনাথের ভাষা, নজরুলের ভাষা—ক্রমশ সহজের
গতি নিয়েছে। বর্তমান ডেমোক্রেসির যুগে এই-ই স্বাভাবিক। উদক
জল বললে, কিংবা জল না বলে পানি বললে সাহিত্যের বিকৃতি হয় না
স্বাভাবিক ভাবে যেখানে যেটা খাটে সেইটে ব্যবহার করাই সু-সা
লক্ষণ। পানি-গামছা না জল-গামছা, পানি-খরচ না জল-খরচ—এ তে
করা বোধ হয় বাজে তর্ক। কিন্তু জল-যোগকে পানি-যোগ, পা
জল-কৌড়ী, জল-চৌকিকে পানি-চৌকি, পানি-ফলকে জল-ফল, জ ত্য
জল-জল, পানি-পানি বা পানি-জল করতে গেলে হয়ত কেবল জোর শ।
পায়, যদিও এতে বাঙালীর শৌর্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। পূর্ব ই
এখন বা যথাসময়ে কলকাতার দিকে তাকিয়ে না থেকে বিভি
ভাষার দিকে একটু ঝোঁক দেয় তবে তাতে যে কেবল হাস্যরসে ত্যর
একথা মানা যায় না। মোট কথা পূর্ববঙ্গের সাহিত্যিকেরা এখন এক র
সাহিত্যচর্চা করবার এবং তার উপযুক্ত বিশিষ্ট আঙ্গিক সৃষ্টি কর ণ
নিশ্চয়ই করবেন। একে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরের উপর আল্লা-রসুলে র
বলে মনে করলে চলবে না। পরস্পরের সহনশীলতার ভিত্তিতে ত
বাংলা-ভাষার হিন্দু-মুসলিম দুইটি ধারাও পাশাপাশি থেকে উভ
ভাষাকেই সমৃদ্ধ করবে। আর, এই সাহিত্যিক সহনশীলতার ভিত্তি
মুসলিমের ব্যক্তিগত সম্পর্কের অবনতি না হয়ে উন্নতিই হবে। বাস্তবি

অধি ত্য' যদি হয়, তবে তা ইংরেজী, রাশিয়ান, ফরাসী, জার্মান বা চীনা
সঙ্গে র হলেও বাঙালী তার রস ভোগ থেকে বঞ্চিত হবে না। সুতরাং
মোটা ক, ঐতিহ্যমূলক ও রাষ্ট্রগত পার্থক্যের ফলে অনিবার্যরূপে পূর্ব আর
আত্মঃ বাংলার ভাষার প্রকাশভঙ্গীর সামান্য কিছু বেশ-কম হবেই। তা
শিক্ষা না। গোপাল হালদারের '১৩৫০'-এর ভাষায় বলতে হয়, "তাতে ভরডা
দায়ী মোটের উপর পূর্ব-বঙ্গের ক্ষয়িষ্ণু মুসলিম সমাজে একটা নতুন অধ্যায়
মতো। য়েছে। এরা কতকটা আত্মসম্বিৎ ফিরে পেয়েছে। এদের স্বাধীন
পরিচি ব-সম্মত ধারায় এখন এরা এগিয়ে যাবেই। তাদের বিকাশের পক্ষে
তাঁরা ম য়োজন আছে এবং তাতে বাংলা সাহিত্যের পরিপুষ্টিই হবে। এদিক
কিন্তু এ শ্চম বঙ্গের সাহিত্যিকদের আশীর্বাদ ও বন্ধুত্বপূর্ণ সদুপদেশও যথেষ্ট
ভাবে (এ করতে পারে—বন্ধুভাবে সহানুভূতির সঙ্গেই তা করতে হবে। আমার
স্ব ছি পশ্চিম বঙ্গের সাহিত্যিক মুরুব্বী ও জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতারা পূর্ববঙ্গের
তাই অ রূপায়ণে খুসী হয়েই তাদের যথাযোগ্য সাহায্য করবেন॥

মনন ও আত্মবিশ্লেষণ

প্রবোধচন্দ্র সেন

মনন-সাহিত্যের বিকাশ না ঘটলে সাহিত্যের যথার্থ পুষ্টি হয় না। এই মনন যার বড়, সে জাতির সাহিত্যও বড়। প্রবন্ধের প্রধান উপজীব্যই হল মনন। সুতরাং প্রবন্ধ-সাহিত্যের উন্নতির দিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

ইতিহাসের দিক্ থেকে বিচার করলে দেখা যায়, বাংলা গদ্য [illegible] মোট চারটি যুগ। প্রথম যুগ বিস্তৃত ১৮০০ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত। দ্বিতীয় ১৮৫৭ থেকে ১৯০৫; তৃতীয় ১৯০৫ থেকে ১৯৪৭; এবং চতুর্থ হল ১৯৪৭ থেকে আজ পর্যন্ত বিস্তৃত। এর মধ্যে, মনে হয় নানাদিক্ থেকে সর্বাধুনিক যুগটাই সব চাইতে দুর্যোগপূর্ণ। অন্ধকারে পথ হাতড়ে হাতড়ে আমাদের অতিকষ্টে এগোতে হচ্ছে। এ অসহনীয় অবস্থা থেকে উদ্ধার পেতে গেলে ব্যাপকভাবে আত্মবিশ্লেষণ দরকার। প্রবন্ধসাহিত্য সে বিষয়ে একটা ভালো নির্দেশ দিতে পারে।

গত পাঁচ বছরে বাঙালি খুবই আত্মবিচারপরায়ণ হয়েছে। ইতিহাস এবং জীবনী নিয়ে আলোচনা চলেছে। সমালোচনার বই লেখবার সযত্ন-প্রয়াস দেখতে পাচ্ছি। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক আন্দোলনকে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু করা হয়েছে। স্মৃতিকথা ও আত্মজীবনীও লেখা হচ্ছে। এসব রচনার প্রধান গুণ আত্মবিশ্লেষণের চেষ্টা, এবং প্রধান দোষ সামগ্রিক দৃষ্টির অর্থাৎ

উদার মননের অভাব। আবার অনেক সময় 'তে হি নো দিবসা গতা' এ ধরনের একটা নৈরাশ্যের মনোভাবও দেখা যায়। এটা দুর্বলতারই লক্ষণ। বাংলা সাহিত্যের এ সব দৈন্য সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। তা দূর করবার জন্য সমবেতভাবে চেষ্টা করতে হবে। হতাশ হয়ে হাল ছাড়লে চলবে না।

সাংস্কৃতিক ঐক্য ও অনুবাদ সাহিত্য

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সাহিত্যের আসরে সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা আমার পক্ষে সম্ভব ন
কারণ আমি নিজে সাহিত্যস্রষ্টা নই। প্রবন্ধ ক্ষেত্রে যেটুকু কাজ করে
তা ঐতিহাসিক গবেষণায় সীমাবদ্ধ। আমি সামান্য লেখক এবং সে
জন্যেই আমার বক্তব্য বিষয়টিও বলা হচ্ছে সামান্য লেখকবৃন্দের উদ্দেশে। ·
কথা বার বার অনুভব করেছি, পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিলনে
শুভ প্রচেষ্টা যেমন হচ্ছে, তেমনি সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐক্যের জন্য আন্তঃ
প্রাদেশিক একটি প্রচেষ্টা হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। যে অঞ্চলগুলি বাংল
প্রতিবেশী তাদের সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি অল্প। শ্রী
কুঞ্জবিহারী দাস লোকসাহিত্যের বৈঠকে তাঁর তথ্যপূর্ণ ভাষণটিতে বাংলা
ওড়িয়া লোকসাহিত্যের মধ্যে পারস্পরিক যোগ সম্পর্কে বিশদভাবে আলো
করেছেন। অসমীয়া ও মৈথিলীর সঙ্গেও বাংলা সাহিত্যের অনু
নিবিড় যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়। আমাদের দেশে এবিষয়ে আ
ব্যাপকভাবে গবেষণা হওয়া দরকার। বর্তমানে 'India is one' এ-উ
আদৌ খাটে না, কারণ সমগ্র ভারতের মধ্যে আমরা সংস্কৃতিগত ঐ
সৃষ্টি করতে পারিনি। ভাষাগত পার্থক্যের জন্যে আমরা পরস্পর-বিচ্ছিন্ন
রয়েছি। ইউরোপকে আমরা সমালোচনা করি নানা ভাবে, কিন্তু ব
কালচার-এর দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে দেখা যায় পাশ্চাত্য সভ্

এক অখণ্ড সূত্রে গ্রথিত। সাহিত্যক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে চিন্তাধারার আদানপ্রদান সেখানে রয়েছে, ইউরোপের প্রায় সব ভাষাতেই বিশিষ্ট গ্রন্থগুলির অনুবাদের সাহায্যে। অথচ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্য সম্বন্ধে আমরা কতটুকুই বা জানি। তা-ও যেটুকু সামান্য জ্ঞান হয় তা ইংরেজির মাধ্যমে। এ টুকু মুখ চেনা মাত্র; এতেই আমাদের তৃপ্ত থাকা উচিত নয়। প্রাচীন কালে সংস্কৃত ছিল শিক্ষিত সমাজের একমাত্র সাহিত্যিক ভাষা এবং সেই ভাষা অবলম্বনে অজয়ের তীরে রচিত গীতগোবিন্দ ভারতবর্ষের দূরদূরান্তর অঞ্চলে প্রচারিত হতে পেরেছিল। কিন্তু এ যুগে আমাদের বিভিন্ন চিন্তাধারার মধ্যে পরোপারের নির্দিষ্ট সেতু কই? বিদেশি ভাষার খেয়া নৌকো অন্যান্য অঞ্চল থেকে যতটুকু তথ্য বয়ে আনে আমাদের ঘাটে, তাতেই আমরা সন্তুষ্ট থাকি; যথার্থ সেতুবন্ধনের চেষ্টা আমরা এতদিন করিনি। ধরুন, দাক্ষিণাত্যের লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক মালায়লী লেখক ভল্লোতোলের রচনা সম্বন্ধে বাংলাদেশের অথবা ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ক'জন লোক জানে? তাঁর গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ পড়েই তাঁর বিষয়ে আমাদের জানতে হয়। এটা গৌরবের কথা নয়। ভারতের বিচ্ছিন্ন ভাবধারাগুলিকে অখণ্ড রূপ দিতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সাহিত্যিক সম্প্রদায়ের সমবেত প্রচেষ্টা। এই প্রস্তাবের একটা বাস্তব দিকও রয়েছে। আমাদের সাহিত্যিকরা স্বদেশ ও বিদেশের সাহিত্য-অনুবাদের কাজে হাত দিলে সমাজের অর্থনৈতিক কল্যাণও এক অংশে সাধিত হতে পারে। সামান্য লেখকশ্রেণী জীবিকা-নির্বাহের অন্যতম পন্থা হিসাবে এ কাজ গ্রহণ করতে পারেন।

পরিশেষে আরেকটি বিষয় উল্লেখ করে আমার বক্তব্য শেষ করব। [বাং]লার সাহিত্যজগতে সাহিত্যিকদের জীবনী নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা [য]তোস্তই সামান্য হয়েছে। সাহিত্যসংক্রান্ত গবেষণা করতে হলে চাই [ঐ]তিহাসিক উপাদান এবং তার জন্যেই প্রাচীন এবং বর্তমান যুগের

সাহিত্যিকদের জীবনচরিত সুষ্ঠুভাবে রচিত হওয়া প্রয়োজন। সাধারণ লেখকদের কাছে অনুরোধ তাঁরা যেন এ বিষয়ে কিছু চিন্তা দেখেন।

প্রবন্ধে যুক্তিধর্মিতা

অম্লান দত্ত

হিত্যক্ষেত্রে দৃষ্টিপাত করলে একটি জিনিস সহজেই নজরে পড়ে। লা সাহিত্যের সবচাইতে শক্তিশালী অঙ্গ যেমন কাব্য ও ছোট গল্প, পক্ষা দুর্বল অঙ্গ তেমনি নাটক ও প্রবন্ধ সাহিত্য। ইংরেজিতে দর্শনতত্ত্ব যে সাহিত্য রচিত হয়েছে, তার সঙ্গে কোনোপ্রকারে তুলনাযোগ্য াও বাংলায় নেই। শেক্স্পিয়রকে অবলম্বন করে ইংরেজিতে যে সমালোচনাসাহিত্য গড়ে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভাকে করে আমরা সে রকম কিছুই করতে পারিনি। এ দুর্বলতার কারণ তা ভেবে দেখতে হবে।

বাংলাদেশের সাহিত্যে বাঙালীর যে-মন প্রকাশিত তা সাধারণত কেন্দ্রিক ও আবেগধর্মী। এর একটি কারণ ঐতিহ্যগত। কীর্তন-বৈষ্ণবকাব্য আশ্রিত বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যে যে ধারাটি প্রধান এই মনটিই প্রকট। বাঙালী মন যখন যুক্তি বা ন্যায়ের দিকে ঝুঁকেছে সে ন্যায় প্রায়শই তথ্যবিমুখ নব্যন্যায়। এমনিভাবে যুক্তি চর্চার ঙালীর অন্তর্মুখী মন ধরা পড়েছে। আশ্চর্য হবার কিছু নেই যে সাহিত্যচর্চায় লিরিক্ যতটা হয়েছে, প্রবন্ধ ততটা হয়নি। আবার র ক্ষেত্রে রম্যরচনা যতখানি উৎকর্ষলাভ করেছে, অন্য রচনা ততটা নি।

আলোচনাপ্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেছেন যে সাহিত্য উদ্দেশ্যমূলক হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সেক্ষেত্রে উদ্দেশ্যের ব্যাপকতা কি আবশ্যক নয়? রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই তো জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। জীবন অনেক ব্যাপক। তাতে রসের, আনন্দের যে কামনা, তাও একটা মহৎ উদ্দেশ্য! উদ্দেশ্যের দিক থেকে সাহিত্যকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা চলে। এক ধরনের সাহিত্যের উদ্দেশ্য, আত্মপ্রকাশের আনন্দেই শুধু একমনের আবেগ ও অনুভূতি অন্য মনে সঞ্চারিত করা: বাহ্যজগতের উপর এর কী প্রতিক্রিয়া সে-প্রশ্ন এখানে গৌণ। দ্বিতীয় ধরনের সাহিত্য প্রচারধর্মী: সাহিত্যিকের লক্ষ্য বা আদর্শ অনুযায়ী বহির্জগৎকে পরিবর্তিত করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। যুক্তিধর্মী প্রবন্ধ-সাহিত্য অনেক ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। উনিশ শতকে বাংলায় প্রবন্ধ-সাহিত্যের যে ধারাটির উল্লেখযোগ্য উন্নতি ঘটে, সমাজ-সংস্কারের অনুপ্রেরণা তাতে প্রত্যক্ষ। সমাজকে নূতনভাবে গড়বার প্রয়োজনে আজও প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। যে সাহিত্যের মূল্য অন্য-ফল-নিরপেক্ষ, যে সাহিত্য আপনি সংসার বিষবৃক্ষের অমৃত ফলস্বরূপ, সেই পরম মূল্যবান সম্পদের যোগ্য সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টির কাজে সহায়তার জন্যই সংস্কারপন্থী, প্রচারধর্মী প্রবন্ধসাহিত্যের প্রয়োজন। এই প্রচারধর্মী সাহিত্যে যদি যুক্তির স্থান অপ্রধান হয় তবে সমাজ-প্রগতির নির্ভরযোগ্য নির্দেশ এতে পাওয়া যাবে না। যুক্তিনির্ভরতা তাই প্রবন্ধসাহিত্যিকের অন্যতম সামাজিক দায়িত্ব॥

ভাষণ : প্রবন্ধ সাহিত্য

কাজী আব্দুল ওদুদ

কদিন ধরে অনেক আলোচনাই এখানে হয়েছে। লেখকরা নানাভাবে সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের ওকীবহাল করবার চেষ্টা করেছেন। অনেকেই জোর দিয়ে বলেছেন যে সাহিত্যে অগ্রগতি অব্যাহতভাবে চলছে। কেউ কেউ তা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশও করেছেন। আমার কিন্তু মনে হয় সমগ্রভাবে জাতির অন্তরে সাহিত্য প্রেরণা আশানুরূপভাবে জাগছে না। পূর্বে কলকাতার পত্রপত্রিকা জুড়ে যেরকম সাহিত্যিক সমাজ গড়ে উঠেছিল, তাদের মধ্যে যেরকম healthy rivalry লক্ষ্য করা যেত, আজ আর তার চিহ্ন তেমন দেখি না। দেশবিভাগ সম্ভবতঃ তার একটা বড়ো কারণ। এমনকি স্বাধীনতাও তার অবসাদ কাটাতে পারছে না। জাতির মৃত্যু ঘটলেও তার সাহিত্য বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু জীবন্ত জাতির পক্ষে সেটা তো কোনো সান্ত্বনাই নয়। বরং প্রাণ আপন বৈচিত্র্যের ঐশ্বর্যে বেঁচে উঠুক, এই আমাদের কাম্য। জাতির জন্যে সাহিত্যের যে আয়োজন, তা পূর্ণাঙ্গ এবং নিখুঁত হওয়া চাই। এবিষয়ে আমাদের সচেতন হওয়া আবশ্যক। বক্তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, সাহিত্য যুক্তিপ্রধান হওয়া উচিত। কিন্তু আমার মনে হয় শুধু বিশ্লেষণ দিয়ে সাহিত্য হয় না। সেজন্য চর্চার প্রয়োজন হয়, সর্বোপরি প্রেরণার। উনিশ শতকে জীবনকে নতুন করে দেখবার অদম্য প্রেরণা জাতির মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ সেই নবচেতনার ঘনীভূত ফল। উদ্দীপনা

যদি জাতির মধ্যে না আসে, তবে শুধু যুক্তি দিয়ে তাকে জাগানোর চেষ্টা নিরর্থক। এই উদ্দীপনা স্বাধীনতার পর জোয়ারের মতো আমাদের জীবনে আসা উচিত ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সে আশা পূর্ণ হয়নি। তাই আজ বৃহৎ দায়িত্ব আমাদের সাহিত্যিকদের সামনে। নতুন করে বাঁচতে শেখাবেন তাঁরা। দেশের ভাঙা মনকে নতুন করে তৈরি করতে হবে, তার দায়িত্ব প্রধানতঃ তাঁদেরই। একদিন ব্যর্থভাবে ফিরিয়ে দিয়েছি রামমোহন—বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ—রবীন্দ্রনাথের—সমৃদ্ধ চিন্তার আদর্শকে। এ ভুলের পুনরাবৃত্তি যাতে না ঘটে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে শিক্ষিত সমাজকে। সে আদর্শকে যদি সফলভাবে গ্রহণ করতে পারি, আবার চিন্তার নবজাগরণ ঘটবে, রচিত হবে জীবনবোধদীপ্ত সাহিত্য। এ কথাটাই আমাদের বিশেষ ভাবে মনে রাখতে হবে। উপদেশ বর্ষণ করে কোনো উপকার করা যাবে না। কারণ সাহিত্যে, আর যাই চলুক, গুরুগিরি চলে না। ল্যাবরেটারিতে সাহিত্য সৃষ্টি হয় না; সাহিত্যিকই সাহিত্য সৃষ্টি করেন।